গ্রিম ভাইদের সমগ্র রচনাবলী

২য় খন্ড

গ্রিমভাইদের সমগ্র রচনাবলী

২

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ ১১, ১৩৬৫
মে ২৫, ১৯৫৮

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বাধাই :
মহামায়া বাইণ্ডার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

বনের মধ্যে সেণ্ট জোসেফ	৯
যিশুর বারোজন শিষ্য	১৪
গোলাপ ফুল	১৬
গরিব আর নম্র মানুষরাই স্বর্গে প্রবেশ করে	১৮
নিষ্ঠুর বোন	২১
তিনটে সবুজ ডাল	২৩
সাধুমার গেলাস	২৭
একটি বুড়ির কাহিনী	২৮
স্বর্গের ভোজ	৩০
বুড়ি ভিখিরি	৩২
হেজেল-ঝোপ	৩৪
ধাঁধা	৩৬
ঘুমন্ত রাজকন্যা	৪০
বাসনমাজা ঝি	৪৪
চালাক এল্‌সি	৫১
ভাগ্যবান তিন ছেলে	৫৬
স্বর্গে দর্জি	৫৯
জুয়াড়ি হান্‌স্‌	৬২
থ্রাশ্‌-চঞ্চু রাজা	৬৬
ছটি রাজহাঁস	৭২
কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি	৭৮
সাদা-গোলাপ আর লাল-গোলাপ	৮১
লোহার হান্‌স্‌	৯০
চড়ুই আর তার চার ছানা	১০১
নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখি	১০৫
পৃথিবীর বামন	১১২
দাঁড়কাক	১১৮
নীল বাতি	১২৪
তিন পাখি	১৩০
জীবন-জল	১৩৬
সাদা আর কালো পাখি	১৪৬

ছোট্টো গাধা	১৪৯
ছয় ভৃত্য	১৫৫
শালগম	১৬৫
বারোজন কুঁড়ে	১৬৯
শজারু হান্‌স্‌	১৭৩
ডাকাত বর	১৭৯
কুঁড়ে হেইন্‌জ্‌	১৮৪
ভালুক চামড়া-পরা লোক	১৮৭
দুই ভবঘুরে	১৯৩
কাঁটা-ঝোপের সুদখোর	২০৫
বেড়াল-ছানা আর জাঁতাওয়ালার চাকর	২১২
কাঁচের কফিন	২১৭
ঝোপ-রাজা	২২৪
মাস্টার স্ক্রিয়েম	২২৮
স্যাল্যাড-গাধা	২৩৩
সাহসী রাজপুত্র	২৪১
স্বর্গে চাষী	২৪৭
ভাগ্যবান জ্যাক	২৪৯
বনের বাড়ি	২৫৫
কুয়োপাড়ের হাঁস চরানো মেয়ে	২৬৩
জোয়ান হান্‌স্‌	২৭৬
গ্রেইফ পাখি	২৮৪
দক্ষ শিকারী	২৯২
পুকুরের পেতনী	৩০০
আসল কনে	৩০৭
সীল-মাছ	৩১৫
সর্দার-চোর	৩২০

ভূমিকা

গ্রিম ভাইদের রূপকথার গল্প সারা বিশ্বে খুবই সুপরিচিত জার্মান বই। ১৮১২—১৪ সালে এর প্রথম প্রকাশনার পর থেকেই এগুলি ইউ (তোগো), সিকেকালো (ঘানা), আলবেনীয়, মঙ্গোলীয় এবং মালাগাসি সহ প্রায় ৭০টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বইটির এই ব্যাপক অনুবাদ, বিগত দুটি শতাব্দীতে নানান দেশে রূপকথার সংগ্রহের যে ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে সেই সঙ্গে এই সত্যকেই দৃঢ় নিশ্চিত করে যে, সমগ্র মানবগোষ্ঠী ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিচারে রূপকথা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ পোষণ করে। মানুষের এই সাধারণ অনুভূতিকে স্পর্শ করার কুশলতাই সম্ভবতঃ গ্রিম ভাইদের খ্যাতির কারণ। কিন্তু জেকব গ্রিম (১৭৮৫—১৮৬৩) এবং তাঁর ভাই উইল্‌হেল্‌ম্ গ্রিম (১৭৮৬—১৮৫৯)-এর রূপকথার সংগ্রহ তাঁদের উন্নতমানের বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষাতত্ত্বের পাণ্ডিত্যের দিকচিহ্নই শুধু নয়; তাদের এই পাণ্ডিত্য শুধু জার্মানীরই নয়, অন্যান্য বহু দেশের বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসের উপর ধারাবাহিক প্রভাব ফেলেছে।

তদানীন্তন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গ্রিমভাইদের "রূপকথা-সাহিত্য" সংগ্রহের উপর যদিও মহৎ অবদান ছিল, কিন্তু বিষয়টির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল আরও অনেক বেশী। এঁরা এদের বিখ্যাত রূপকথার সংগ্রহ, একটি গাথার সংগ্রহ (১৮২৮), প্রাচীন আইন ও দলিল দস্তাবেজ (১৮২৮), প্রার্থনা মন্ত্র, যাদু এবং বিভিন্ন বাণী (১৮১২) সহ অতি প্রাচীন কালের সাহিত্যও প্রকাশ করেন। এ সমস্তই জার্মানীর প্রাথমিক পর্যায়ের খৃষ্ট হওয়ার সময়কালেরও আগের ঘটনা। এঁরা মধ্যযুগীয় মহাকাব্যগুলির সাহিত্য রস যাতে সাধারণ লোকও পেতে পারেন সে ব্যাপারেও অবদান রেখেছেন। এগুলি এতাবৎকাল কেবল পাণ্ডুলিপি আকারেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরাই কেবল এগুলির সাহিত্য মূল্য সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করতেন। উইল্‌হেল্‌ম্ গ্রিম শুধু যে ঐতিহ্যশালী সাহিত্যের বড় বড় কাজগুলির সংস্করণ প্রকাশনার কষ্টসাধ্য কাজ করতেই ভালবাসতেন তা নয়, তিনি সেগুলির অনুবাদও করেছিলেন।

প্রাচীন ডেনমার্কের বীরত্ব গীতি (ওল্‌ড ড্যানিশ হিরোইক সঙ্‌স্) গাঁথা এবং রূপকথা (ব্যালাডস এ্যাণ্ড ফেয়ারী টেলস—১৮১১) তাঁর অনুবাদ কীর্তির নিদর্শন। তাঁর 'এডা'র অনুবাদটি ১৮১৫ সালে তিনি এবং জেকব যৌথভাবে প্রকাশ করেন—এটি 'দি সঙ্‌স্ অফ রোলাণ্ড' (১৮৩৮) নামেও পরিচিত। বিভিন্ন রূপকথার ভাষার উপর তাঁর যে অবিশ্বাস্য রকম সংবেদনশীল ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করা যায়, যার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা একান্তভাবেই তারই উপর আরোপণীয়, তাকে আর কেউই অতিক্রম করতে পারেনি।

ভাষা সম্পর্কে এই গভীর জ্ঞান গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়কে বিশেষতঃ জেকবকে তাদের সমসাময়িক কেউই যা পারেনি সেই ভাষায় প্রাঞ্জলতা আনার সমস্যার উর্ধ্বে উন্নীত করেছিল। সমস্যাটি হল সমগ্র মানবগোষ্ঠীর, এক্ষেত্রে জার্মান জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবী মহলের ইতিহাসের প্রতিফলন হিসাবে ভাষার উন্নতি এবং ভাষার ইতিহাস নির্ণয়ের সমস্যা। জেকব গ্রিম ভাষার উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি অন্ততঃ প্রায় ১৫০০ বছরের আগের প্রাচীনতম রূপ থেকে প্রথন-এর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রগতির ধারা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব অতীতে অনুসন্ধানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

গ্রিমভাইয়েরা ছিলেন হেসের অধিবাসী। 'এরা প্রাচীন রাইখে ছোট্ট জগতে, তাদের পিতামহের ধর্ম যাজকের গৃহে বাবার অধীনে বড় হয়ে ওঠেন। এঁদের বাবা হেসে—হানাউ-এর নির্বাচনের অধীনে নিম্ন গ্রামীণ দফতরের কার্যকর্তা ছিলেন। সৎ লোকেদের সঙ্গে-মেলামেশা এঁদের মধ্যে অস্তিত্বের নিরাপত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতির সঞ্চার করেছিল'—লিখেছেন সেই সময়ের অন্যতম বোদ্ধা ফ্রান্স শানাবেল।

অবশ্য এঁদের পরবর্তী জীবন প্রারম্ভকালের মত অ-সুখীজনক থাকেনি। গোটিন-জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে থাকার সময় এঁরা হ্যানোভার রাজত্বের সংবিধানের স্বেচ্ছাচারমূলক কাটছাঁটের বিরুদ্ধে ১৮৩৭ সালে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পরিণতি-স্বরূপ এঁরা এবং এঁদের সমমনোভাবাপন্ন আরও পাঁচজন হ্যানোভার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এই ঘটনা সারা জার্মানীতে অস্থিরতার কারণ ঘটিয়েছিল। সে সময় আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট এদের বারলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রুশিয়া এই দুই ভাইকে তাদের বাকি জীবন কাটানোর এবং সাহিত্য কার্য চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিল।

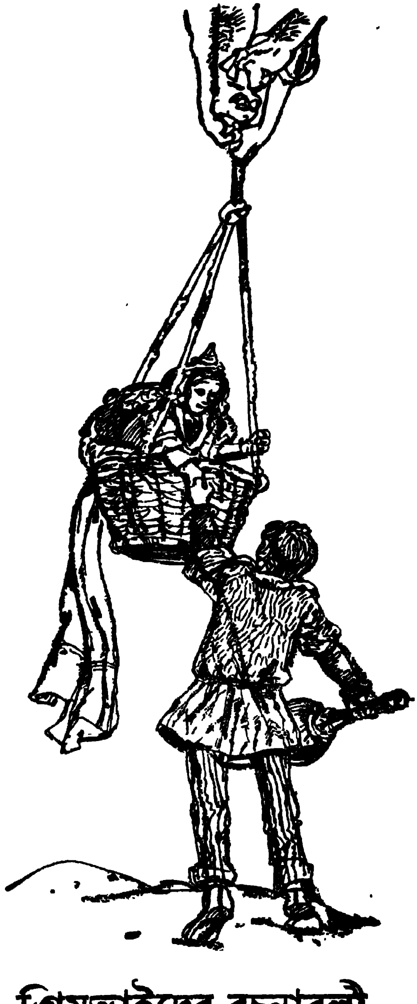

গ্রিমভাইদের রচনাবলী

দুই

হানাউ-এ জাকব গ্রিম এবং ভিলহেল্ম গ্রিম
ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণমূর্তি

কচি কচি ছেলেমেয়েদের জন্য উপকথা

বনের মধ্যে সেন্ট জোসেফ

এক সময় এক মা থাকত তার তিন মেয়েকে নিয়ে। বড়ো মেয়েটি দুষ্টু আর খিট্‌খিটে। মেজো মেয়েটির কিছু দোষ থাকলেও বড়োর চেয়ে ভালো। ছোটো মেয়েটি সত্যিকারের ভালো আর মিষ্টি স্বভাবের।

কিন্তু আশ্চর্য কথা—বড়ো মেয়েটিকেই তার মা ভালোবাসত, ছোটো মেয়েকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। তাই গহন বনে ছোট্টো মেয়েটিকেই বরাবর সে পাঠাত আর ভাবত সেখানে একদিন-না-একদিন নিশ্চয়ই সে পথ হারিয়ে মরবে। কিন্তু শুভসাধক দেবদূত সর্বদাই ধর্মভীরু শিশুদের যত্ন নেন, তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

একদিন শুভসাধক দেবদূত ভান করলেন—শিশুকে ছেড়ে তিনি চলে গেছেন। ছোটো মেয়ে তাই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। হাঁটতে-হাঁটতে শেষটায় সে দেখে ছোট্টো একটি কুঁড়েঘরে বাতি জ্বলছে। সদর দরজায় সে টোকা দিতে সেটা খুলে গেল। মেয়েটি পৌঁছল দ্বিতীয় এক দরজায়। তাতেও আবার সে টোকা দিল।

এক অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় চেহারার বুড়ো মানুষ দরজাটা খুললেন। তুষার-ধবল তাঁর দাড়ি। আসলে তিনি সাধু সেন্ট জোসেফ। মিষ্টি গলায় তিনি বললেন, "ভেতরে এসো, বাছা। আগুনের পাশে আমার ছোট্টো চেয়ারে বসে হাত-পা সেঁকে নাও। তোমার তেষ্টা মেটাবার জন্যে পরিষ্কার

জল আনছি। কিন্তু গাছ-গাছড়ার শেকড়-বাকড় ছাড়া তোমাকে খেতে দেবার মতো আমার কাছে আর কিছু নেই। সেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করতে হবে।"

বুড়ো মানুষটি তার পর তাকে গাছের কয়েকটা শেকড় দিলেন। মেয়েটি সযত্নে সেগুলোর খোসা ছাড়াল। তার পর মা তাকে সামান্য যে পিঠের আর রুটির টুকরো দিয়েছিল সেগুলোও সস্‌প্যানে ভরে স্টু বানাবার জন্যে সেটা উনুনে চড়াল।

রান্না হয়ে গেলে সেণ্ট জোসেফ বললেন, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। তোমার খাবার থেকে কিছুটা খেতে দাও।"

উনুন থেকে স্টু নামিয়ে সেটার বেশির ভাগই মেয়েটি দিল সেণ্ট জোসেফকে।

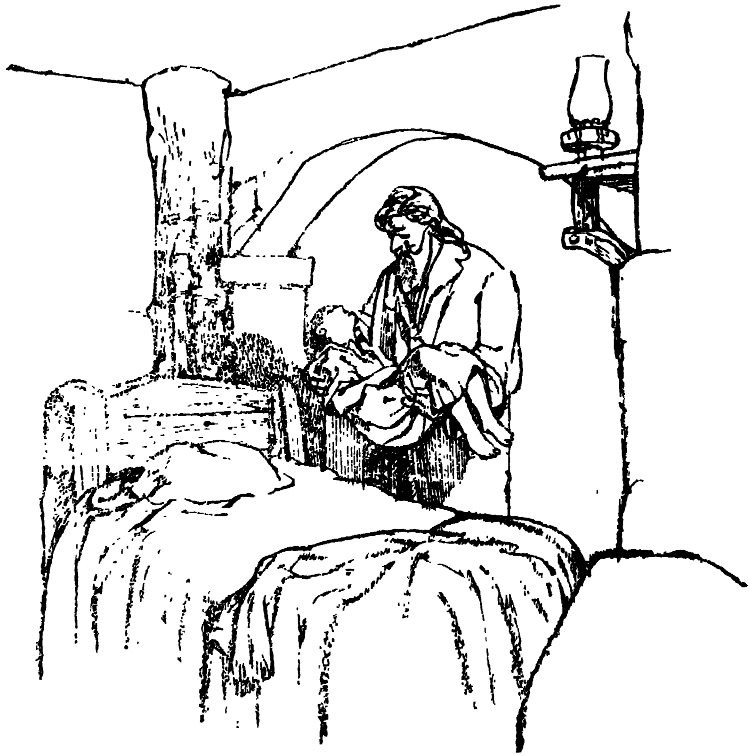

খাওয়া-দাওয়ার পর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হলে সেন্ট জোসেফ বললেন, "এবার বিছানায় শুয়ে পড়া যাক। আমার একটাই বিছানা। তাতে তুমি শোও। মেঝেয় খড় বিছিয়ে আমার শোবার ব্যবস্থা করে নেব।"

মেয়েটি বলল, "না। আপনার বিছানায় আপনি গিয়ে শোন। খড়ের বিছানাতেই আমার চলে যাবে।" কিন্তু সেন্ট জোসেফ শিশুকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে ছোট্টো বিছানাটিতে শুইয়ে দিলেন। ঘুমোবার আগে মেয়েটি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবার পর তিনি তার কাছ থেকে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সেন্ট জোসেফকে সুপ্রভাত জানাতে মেয়েটি গেল। কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পেল না। কুঁড়ে-ঘরের সর্বত্র খুঁজতে-খুঁজতে শেষটায় সে দেখতে পেল মোহরের একটা বস্তা। সেটা এমন ভারী যে, পিঠে তুলতে তার কষ্ট হল। থলির উপর লেখা ছিল কুঁড়েঘরে যে-মেয়েটি রাত কাটিয়েছে বস্তা ভরা মোহর তার। ভারি খুশি হয়ে থলিটা নিয়ে বাড়িতে সে তার মায়ের কাছে গেল। তার মা সেটা নিয়ে মুখে বলল, উপহারটা পেয়ে খুশি হয়েছে।

পরদিন মেজো মেয়ের ইচ্ছে হল বনে যাবার। তার মা তাকে দিল অনেক বড়ো পিঠের আর রুটির টুকরো। ছোটো বোনের মতো তার বেলাতেও সব-কিছু ঘটল। সেন্ট জোসেফের কুঁড়েঘরে পৌঁছতে স্টু বানাবার জন্য তিনি তাকে দিলেন গাছ-গাছড়ার শেকড়-বাকড়।

রান্না হয়ে গেলে আগের মতোই তিনি বললেন, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। তোমার খাবার থেকে কিছুটা খেতে দাও।" তার সঙ্গে মেজো মেয়ে খাবার ভাগাভাগি করে নিল।

তার পর সেন্ট জোসেফ নিজের বিছানায় তাকে শুতে বলে জানালেন খড়ের বিছানায় তিনি শোবেন। মেজো মেয়ে বললে, "আপনিও বিছানায় শোন। দুজনের কুলিয়ে যাবে।" কিন্তু মেয়েটিকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে সেন্ট জোসেফ শুলেন খড়ের বিছানায়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মেজো মেয়ে দেখে—সেন্ট জোসেফ অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু দরজার পিছনে রয়েছে মোহর ভরা ছোট্টো একটা থলি। তাতে লেখা—যে-মেয়েটি সেখানে রাত কাটিয়েছে থলি-ভরা মোহর তার। থলিটা সে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু নিজের

জন্য রেখে দিল গোটা দুই মোহর।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে বড়ো মেয়ে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তাই পরদিন সকালে সে গেল বনে। তার মা তাকে দিল খুব বড়ো পিঠে আর রুটির টুকরো আর তার সঙ্গে পনীরও। আর সন্ধেয় তার দুই বোনের মতোই কুঁড়েঘরে তার সঙ্গে দেখা হল সেন্ট জোসেফের।

সে স্টু বানাবার পর সেন্ট জোসেফ বললেন, "আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। তোমার খাবার থেকে কিছুটা খেতে দাও।" বড়ো মেয়ে বলল, "সবুর কর। আমার খাওয়া শেষ হোক। বাকি থাকলে পাবে।" মেয়েটি স্টুর প্রায় সবটাই শেষ করল। সেন্ট জোসেফের জুটল পাত-কুড়নো সামান্য খাবার। সেন্ট জোসেফ নিজের বিছানায় তাকে যখন শুতে বললেন এমনভাবে গট্‌গটিয়ে গিয়ে বড়ো মেয়ে তাঁর বিছানায় শুল— বিছানাটা যেন তারই। বুড়ো মানুষটিকে যে খড়ের শক্ত বিছানায় শুতে হবে একবারও সে কথা বড়ো মেয়ে ভাবল না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সেন্ট জোসেফের দেখা বড়ো মেয়ে কোথাও পেল না। তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে মোটেই মাথা না ঘামিয়ে দরজার পিছনে বড়ো মেয়ে খুঁজতে গেল মোহরের থলি। তার মনে হল মেঝেয় যেন কী একটা রয়েছে। জিনিসটা যে কী ভালো করে দেখতে না পেয়ে সেটা পরীক্ষা করার জন্য মাটির উপর ঝুঁকতেই জিনিসটা তার নাকে আটকে গেল। দাঁড়িয়ে আঁতকে উঠে সে টের পেল তার নাকের সঙ্গে আর-একটা নাক ঝুলছে। হাউমাউ করে সে চেঁচাতে শুরু করল। কিন্তু তাতে কোনোই ফল হল না। তার পর করুণ স্বরে কাঁদতে-কাঁদতে কুঁড়েঘর থেকে ছুটে বেরুবার পর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সেন্ট জোসেফের। তাঁর পায়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করে দ্বিতীয় নাকটা তাঁকে ছাড়িয়ে দিতে বললে তিনি সেটা ছাড়িয়ে দিলেন আর তার-পর বড়ো মেয়েকে দিলেন দুটো আধলা।

বড়ো মেয়ে বাড়ি পৌঁছলে তার মা জিগ্‌গেস করল, কত মোহর সে পেয়েছে। মিথ্যে করে সে বলল, "মস্ত একটা বস্তা-ভরা মোহর। বাড়ি আসার পথে সেটা হারিয়ে ফেলেছি।"

ভীষণ অবাক হয়ে তার মা চেঁচিয়ে উঠল, "বলিস কী—হারিয়ে ফেলেছিস। এক্ষুনি আমার সঙ্গে চল। সেটা খুঁজে বার করতেই হবে।"

বড়ো মেয়ে প্রথমে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। কিছুতেই যেতে চাইল

না। শেষটায় মায়ের সঙ্গে সে বাড়ি থেকে বেরুল। পথে তাদের কামড়াল নানা বিষধর সাপ। সাপের কামড়ে মন্দ মেয়েটা মরল। আর মেয়েকে মন্দভাবে মানুষ করার দরুণ তাদের মা সাপের ছোবল খেল তার পায়ের গোছে।

যিশুর বারোজন শিষ্য

যিশুখ্রীস্ট জন্মাবার তিনশো বছর আগে একটি মেয়ের ছিল বারোটি ছেলে। তাদের মা ছিল ভারি অভাবী আর গরিব। সে ভেবে পেল না কী করে খাইয়ে পরিয়ে ছেলেদের বাঁচিয়ে রাখবে। রোজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সে বলত তার ছেলেরা যেন মানবত্রাতা যিশুখ্রীস্টের সঙ্গে পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দ পায়। মেয়েটির দৈন্যদশা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাই রুজিরোজগারের জন্য একে-একে বারোটি ছেলেকেই সে পাঠায় পৃথিবীর চার দিকে।

তার বড়ো ছেলের নাম পিটার। সারাদিন হাঁটার পর সে পৌঁছল এক গহন বনে। যতই সেখান থেকে সে বেরুবার চেষ্টা করে ততই চলে যায় বনের গভীর থেকে গভীরে। ক্ষিদের জ্বালায় ক্রমশ সে এমনই দুর্বল

হয়ে পড়ল যে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোও তার পক্ষে হয়ে উঠল কষ্টকর। শেষটায় সে আর পারল না। মাটিতে শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগল মৃত্যুর আর দেরি নেই।

হঠাৎ সে দেখে তার পাশে ছোট্টো একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গ দিয়ে তার জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। দেবদূতের মতো সুন্দর চেহারা। ঠোঁটে বন্ধুর মতো মিষ্টি হাসি। তাকে জাগাবার জন্য ছেলেটি হাততালি দিয়ে উঠল আর পিটার তার দিকে তাকাতে বলল, "তোমার মুখ অমন শুকনো কেন?"

দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে পিটার বলল, "রুটি ভিক্ষে করে পৃথিবীতে আমি ঘুরে বেড়াই। আমার একমাত্র কামনা মানবত্রাতা যিশুখ্রীষ্টকে দেখা পর্যন্ত যেন বেঁচে থাকি।"

ছেলেটি বলল, "আমার সঙ্গে এসো। তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।" পিটারের হাত ধরে তাকে সে নিয়ে গেল নানা পাহাড়ের পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড এক গুহায়। গুহার ভিতরকার দেয়ালে-দেয়ালে সোনা, রুপো আর জহরত ঝল্‌মল্ করছে আর মাঝখানে সারি-সারি রয়েছে বারোটি মোমবাতি। ছোট্টো দেবদূত তাকে বলল, "শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। তোমাকে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব।"

তার কথামতো পিটার শুয়ে পড়লে গান গেয়ে আর দোলা দিয়ে দেবদূত তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। পিটার যখন ঘুমচ্ছে তখন তার দ্বিতীয় ভাইকে দেবদূত সেখানে নিয়ে এল আর তাকেও গান গেয়ে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াল। এইভাবে একের-পর এক বারো ভাই সেখানে এসে সোনার দোলনায় শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে। তিনশো বছর ধরে তারা ঘুমিয়ে চলল। তার পর এক রাতে ভূমিষ্ঠ হলেন মানবত্রাতা যিশু। তিনি ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁদের ঘুম ভাঙল আর তার পর পৃথিবীময় তাঁরা চললেন যিশুর অনুসরণ করে। তাঁরাই হলেন যিশুর বারোজন শিষ্য।

গোলাপ ফুল

এক সময় এক গরিব মেয়ের দুটি ছেলে ছিল। প্রতিদিন কাঠ-কুটো কুড়োবার জন্য ছোটো ছেলেটি যেত বনে। একদিন কাঠকুটো খুঁজতে-খুঁজতে সে যখন বনের মধ্যে অনেকটা চলে গেছে একটি সুস্থ সবল শিশু সেখানে এসে কাঠের বোঝা তাদের কুঁড়েঘর পর্যন্ত বয়ে আনতে সাহায্য করল। তার পর মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল অদৃশ্য। ছেলেটি তার মাকে সেই অচেনা শিশুর কথা বলল। তার মা কিন্তু ছেলের কথা বিশ্বাস করলেন না। একদিন ছেলেটি বাড়িতে নিয়ে এল একটি গোলাপফুলের কুঁড়ি। মাকে বলল সেই সুন্দর অচেনা শিশু

তাকে সেটা উপহার দিয়ে বলেছে কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফুটে উঠলে সে আসবে। গোলাপ-কুঁড়িটিকে তাঁর মা রাখল জলে। এক সকালে ছেলেটি বিছানা ছেড়ে উঠল না। তার মা গিয়ে দেখে, সে মরে গেছে, কিন্তু ঠোঁটে তার আনন্দের স্নিগ্ধ হাসি আর গোলাপ-কুঁড়িটি উঠেছে ফুল হয়ে ফুটে।

গরিব আর নম্র মানুষরাই স্বর্গে প্রবেশ করে

এক সময় এক রাজপুত্র মাঠে হাঁটছিল খুব বিষণ্ণ আর চিন্তিত মুখে। নির্মল, নীল সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে সে বলে উঠল, "ওখানে যারা থাকে না-জানি কতই তারা সুখী!"

তার পর এক গরিব বুড়োকে তার দিকে আসতে দেখে সে প্রশ্ন করল, "স্বর্গে কী করে যেতে পারি বলতে পারো?"

বুড়ো বলল, "দারিদ্র্য আর নম্রতার মধ্যে দিয়ে। আমার ছেঁড়া পোশাক পরে সাত বছর পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়ে শেখো দুঃখ-দৈন্য কাকে বলে। কারুর কাছ থেকে পয়সাকড়ি নেবে না। ক্ষিদে পেলে দয়ালু

লোকদের কাছে গিয়ে বোলো এক টুকরো রুটি দিতে। এইভাবে প্রতিদিন ক্রমশ স্বর্গের কাছে পৌঁছবে।"

রাজপুত্র তার দামী পোশাক ভিখিরির ছেঁড়া পোশাকের সঙ্গে বদলা-বদলি করে পৃথিবীময় ঘুরতে-ঘুরতে অনেক দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটন সইল। সে খেত খুব কম, কখনো বাজে গুজব রটাত না আর ক্রমাগত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত—একদিন তাকে তিনি যেন স্বর্গে স্থান দেন।

সাত বছর এইভাবে কাটাবার পর আবার একদিন সে ফিরে এল তার বাবার রাজপ্রাসাদে। কেউই তাকে চিনতে পারল না। ভৃত্যদের সে বলল, "বাবা-মাকে জানাও, আমি ফিরেছি।"

ভৃত্যরা হেসে উঠে ভাবল লোকটা পাগল।

তখন তাদের সে বলল, "ভাইদের বল আমার কাছে আসতে। তাদের দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।"

ভৃত্যরা আরো হাসাহাসি করতে লাগল। শেষটায় তাদের একজন গিয়ে রাজ-পরিবারকে খবরটা দিল কিন্তু কেউই তার কথা কানে তুলল না।

তার পর তার মাকে এক চিঠিতে সে লিখল নিজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা। কিন্তু জানাল না, সে তার ছেলে।

চিঠি পড়ে রানীর করুণা হল। সিঁড়ির নীচে তাকে তিনি থাকতে দিলেন। প্রতিদিন দুজন ভৃত্যকে দিয়ে তাকে তিনি পাঠাতে লাগলেন খাবার-দাবার। কিন্তু ভৃত্যদের একজন ছিল পাজি। সে ভাবল, 'ভিখিরিটাকে এত-সব ভালো-ভালো খাবার খাওয়াবার কোনো মানেই হয় না।' তাই খাবার-দাবার হয় সে নিজেই খেয়ে ফেলত, নয়তো কুকুরদের খাওয়াত। দুর্বল ভিখিরির জন্য সে নিয়ে যেত শুধু এক গেলাস জল। অন্য ভৃত্যটি ছিল সৎ। প্রতিদিন ভিখিরির খাবার-দাবার সে পৌঁছে দিত।

অনেকদিন সেইটুকু খাবার খেয়ে রাজপুত্র কোনোরকমে বেঁচে রইল। কোনো অভিযোগ-অনুযোগ সে জানাত না। কিন্তু দিনকে দিন সে হয়ে উঠতে লাগল রোগা আর দুর্বল। অসুখটা বাঁকা দিকে মোড় নিতে তার খুব ইচ্ছে করতে লাগল যাজকের মারফত ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করার। সারা শহরে তখন শোনা যাচ্ছিল গির্জেতে ভজনের জন্য ঘণ্টাধ্বনি!

একদিন ভজন সেরে যাজক গেলেন সিঁড়ির তলাকার সেই গরিব ছন্নছাড়া লোকটার কাছে। তিনি এসে দেখেন লোকটা মরে গেছে। কিন্তু তার এক হাতে রয়েছে একটা গোলাপ, অন্য হাতে একটা পদ্মফুল আর পাশে পড়ে রয়েছে একটা কাগজ। তার জীবনের ইতিহাস নিজের হাতে কাগজটায় সে লিখে গিয়েছিল।

তাকে কবর দেবার পর কবরের এক পাশে ফুটে উঠল গোলাপ, অন্য পাশে পদ্মফুল।

নিষ্ঠুর বোন

এক সময় ছিল দুই বোন। একজন ধনী আর নিঃসন্তান। অন্যটি বিধবা, পাঁচটি তার সন্তান। মেয়েটি এতই গরিব যে, তার আর তার সন্তানদের রুটিও জুটত না।

অভাবের তাড়নায় বোনের কাছে গিয়ে সে বলল, "আমার ছেলে-মেয়েরা উপোস করে আছে। তুমি ধনী। আমাকে এক টুকরো রুটি দাও।"

কিন্তু ধনী বোনের হৃদয় ছিল পাষাণের মতো কঠিন। সে বলল "বাড়িতে কিচ্ছু নেই। এখান থেকে দূর হ।"

ঘণ্টা কয়েক পরে ধনী বোনের স্বামী বাড়ি ফিরল। খাবার সময় রুটি কাটতে গিয়ে অবাক হয়ে সে দেখে ছুরি চালাতেই রুটি দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত ঝরছে। তাই দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বউ তাকে জানাল সব ঘটনার কথা। আর গরিব বিধবাকে সাহায্য করার জন্য নিজের খাবার-দাবার নিয়ে তার স্বামী ছুটে গেল তার কাছে। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে শুনতে পেল প্রচণ্ড একটা শব্দ আর দেখল আকাশে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি আর লক্‌লকে আগুনের শিখা। তার বাড়িটাই তখন পুড়ছিল। তার সব ধনদৌলত পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর তার পাজি বউ বুক-ফাটা কান্না কেঁদে বলতে লাগল, উপোস করে আমাদের মরতে হবে।

সৎ বোন তার কাছে ছুটে এসে বলল, "অভাগাদের ঈশ্বর সাহায্য করেন।"

তার পর থেকে ধনী বোন বাধ্য হল দোরে-দোরে ভিক্ষে করে বেড়াতে। কিন্তু তার প্রতি কারুরই মায়া-মমতা ছিল না। গরিব বোন কিন্তু তার নিষ্ঠুরতার কথা ভুলে ভিক্ষে করে যা পেত ধনী বোনের সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিত।

তিনটে সবুজ ডাল

পাহাড়ের নীচে এক বনের মধ্যে এক সময় থাকত এক সাধু। সময় কাটাত সে ঈশ্বরের আরাধনা আর পুণ্য কাজ করে। প্রতি সন্ধেয় নীচ থেকে পশুপাখি আর গাছপালার জন্য দু বালতি জল সে নিয়ে যেত পাহাড়ের চুড়োয়। কারণ সেখানকার ঝোড়ো বাতাসে সব-কিছু শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে উঠত। বনের যে-সব পাখি মানুষের ভয়ে মরুভূমির মতো সেই পাহাড়-চুড়োয় এসে পৌঁছত তৃষ্ণার জল তারা পেত না। তার এই পুণ্য কাজের পুরস্কার হিসেবে এক দেবদূত সাধুর জন্য নিয়ে আসত খাবার দাবার।

এইভাবে পুণ্য কাজ করতে-করতে সাধু খুব বুড়ো হয়ে উঠল। একদিন সে দেখে কিছু দূর দিয়ে গরিব এক জেলেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসি কাঠে লটকাবার জন্য। সে তখন বলে উঠল, "আপনার কাজের ফল ভোগ করার জন্য লোকটা চলেছে।" কিন্তু সেই সন্ধেয় জল নিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় সাধু পৌঁছবার পর খাবার নিয়ে দেবদূত এল না। তাই দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে সে ভাবতে লাগল কী পাপ সে করেছে। ভেবে-ভেবে কুল-কিনারা সে পেল না। তখন মাটিতে নতজানু হয়ে বসে উপোস করে দিনরাত সে ঈশ্বরের আরাধনা করে চলল।

একদিন বনের মধ্যে বসে অঝোরে সে কাঁদছে এমন সময় শুনতে পেল ছোট্টো একটা পাখি ভারি মিষ্টি সুরে গান গেয়ে চলেছে। পাখির গান শুনে সে বলে উঠল, "ছোট্টো পাখি! তোমার গান শুনে বুঝতে পারছি মনের আনন্দে তুমি গেয়ে চলেছ। বুঝতে পারছি ঈশ্বরের করুণা থেকে তুমি বঞ্চিত হও নি। তুমি যদি আমায় বলতে পারতে ঈশ্বরের কাছে কী পাপ করেছি তা হলে নিজের পাপের জন্যে অনুশোচনা করতাম। আনন্দে আবার ভরে উঠত আমার বুক।"

পাখি তাকে বলল, "এক পাপীকে লোকে ধরে টানতে-টানতে যখন ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন মনে-মনে ক্ষমা না করে তার প্রতি

তুমি দোষারোপ করেছিলে। এটাই তোমার পাপ। তাই ঈশ্বর তোমার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন। কারণ ঈশ্বরই একমাত্র বিচার-কর্তা। কিন্তু নিজের পাপের জন্যে যদি তুমি অনুশোচনা কর তা হলে ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করবেন।"

সাধু তখন দেখল হাতে একটা শুকনো ডাল নিয়ে দেবদূত তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দেবদূত তাকে বলল, "যত দিন না এই শুকনো কাঠে সবুজ

ছোটো-ছোটো তিনটে ডাল গজায় ততদিন এটাকে তোমায় বয়ে বেড়াতে হবে। রাতে ঘুমবার সময় এটাকে রাখতে হবে তোমার মাথার নীচে। দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। কোনো বাড়িতে একটার বেশি রাত কাটাতে পারবে না।—এটাই তোমার সাজা।"

যে পৃথিবীকে বহুকাল সে ভুলে ছিল গাছের শুকনো ডালটা নিয়ে সেই পৃথিবীতে বেরিয়ে এল সাধু। লোকের দোরে-দোরে ভিক্ষে করে

যে-খাবার পেত শুধু সেটা খেয়েই সে রইল বেঁচে। কিন্তু প্রায়ই তার ভিক্ষের ডাকে লোকের সাড়া মিলত না। তাকে দেখলে অধিকাংশ দরজাই হয়ে যেত বন্ধ। ফলে প্রায়ই গোটা দিন রুটির ছোট্টো টুকরোও তার জুটত না।

একদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দোরে-দোরে সে ঘুরল। কিন্তু কেউই তাকে না দিল একদানা খাবার, না দিল আশ্রয়। রাতে বনে গিয়ে সে দেখল পাথরের একটা বাড়ি আর তার মধ্যে বসে এক বুড়ি।

বুড়িকে সে বলল, "আমাকে এখানে রাত কাটাতে দাও।"

বুড়ি বলল, "না। ইচ্ছে হলেও তোমাকে থাকতে দিতে পারব না। আমার তিন ছেলে ডাকাত। ডাকাতি সেরে ফিরে তোমাকে এখানে দেখলে তারা মেরে ফেলবে, আমাকেও মেরে ফেলবে।"

সাধু বলল, "আমাকে থাকতে দাও। তারা আমাদের মারবে না।"

তার প্রতি বুড়ির করুণা হল। তাই শেষপর্যন্ত রাজি হল তাকে আশ্রয় দিতে। গাছের ডালটা মাথার নীচে রেখে সিঁড়ির একটা ধাপে সাধু শুয়ে পড়ল। বুড়ি প্রশ্ন করল ডালটা মাথার তলায় কেন সে রেখেছে। সাধু জানাল—এটাই তার পাপের সাজা, এই ডালটাই তার মাথার একমাত্র বালিশ। আরো জানাল—ঈশ্বর তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন, কারণ এক হতভাগ্য পাপীকে ফাঁসিতে লটকাবার জন্য লোকে যখন নিয়ে যাচ্ছিল সে বলেছিল: আপন কাজের ফল ভোগ করার জন্য লোকটা চলেছে।

তার কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি বলে চলল, "হায় হায়! মুখের একটা কথার জন্যে যদি এই সাজা হয়, তা হলে শেষ বিচারের দিন আমার ছেলেদের কী হবে?"

মাঝরাতে দারুণ হৈ-হল্লা করতে-করতে ডাকাতরা ফিরল। তাদের প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের আলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল আর সেই আলোয় তারা দেখতে পেল সিঁড়িতে সাধুকে ঘুমতে। তাকে দেখে ভীষণ রেগে চীৎকার করে তাদের মাকে তারা প্রশ্ন করল, "এ লোকটা কে? তোমাকে হাজারবার বলি নি—কাউকে এখানে থাকতে দেবে না?"

বুড়ি বলল, "লোকটাকে ঘুমতে দাও। বেচারা নিজের পাপের সাজা ভোগ করছে।"

ডাকাতরা চেঁচিয়ে উঠল, "ওহে বুড়ো! তোমার পাপের কথাটা

আমাদের শোনাও।"

সাধু জেগে উঠে বলল, তার একটা মুখের কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে এই শাস্তি দিয়েছেন। সাধুর মুখে সব কথা শুনে নিজেদের অতীত জীবনের কীর্তিকলাপের কথা স্মরণ করে ডাকাতরা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তার পর আন্তরিক অনুশোচনায় মনে-মনে দগ্ধ হতে লাগল।

এই তিন পাপীকে অসৎ পথ থেকে সৎ পথে এনে সাধু ঘুমতে গেল সিঁড়ির নীচে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল সাধু মরে পড়ে আছে আর তার মাথার নীচেকার শুকনো ডালে গজিয়ে উঠেছে কচি কচি তিনটে সবুজ ডাল।

সাধুমার গেলাস

একদিন এক গাড়োয়ানের মদের পিপে বোঝাই-করা গাড়ির চাকা পথের একটা খোঁদলে পড়ে এমনভাবে আটকে গেল যে, বহু ঠেলাঠেলি করেও সেটাকে তোলা গেল না। ঈশ্বরের মা তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। গাড়োয়ানের বিপদ দেখে তাকে তিনি বলেন, "আমি খুব ক্লান্ত। ভারি তেষ্টা পেয়েছে। আমাকে এক গেলাস মদ দিলে তোমার গাড়ির চাকা গর্ত থেকে তুলে দেব।

গাড়োয়ান বলল, "এতে আর কথা কী! কিন্তু মদ ঢালবার গেলাস আমার কাছে নেই।"

ঈশ্বরের মা তখন একটা গোলাপী ফুটকি দেওয়া সাদা ফুল বার করলেন যেটাকে দেখতে গেলাসের মতো। গাড়োয়ানকে সেটা তিনি দিতে গাড়োয়ান সেটায় মদ ঢেলে ভরে দিল। ঈশ্বরের মা সেটা পান করার সঙ্গে সঙ্গে গর্ত থেকে গাড়ির চাকাগুলো এল উঠে। গাড়োয়ান তখন অনায়াসে চালিয়ে নিয়ে গেল তার গাড়িটা। এই ঘটনার পর থেকে জার্মানিতে সেই ফুলটার নাম দেওয়া হয়েছে 'সাধুমার গেলাস'।

একটি বুড়ির কাহিনী

বড়ো একটা শহরে এক সময় থাকত এক বুড়ি। এক রাতে একলা সে তার উনুনের সামনে বসে বসে ভাবছিল : প্রথমে কী ভাবে সে হারায় তার স্বামীকে, তার পর দুই সন্তানকে, আর তার পর একে-একে তার সব আত্মীয়-স্বজনকে। ফলে এখন সে একেবারে একা। তার খোঁজ-খবর নেবার কেউই এখন আর নেই। ভাবতে-ভাবতে শোকে-দুঃখে তার বুক টন্‌টন্ করে উঠল—বিশেষ করে যখন তার মনে পড়ল তার আদরের দুই ছেলের কথা। নিস্পন্দ হয়ে এই-সব চিন্তায় সে যখন ডুবে রয়েছে এমন সময় সে হঠাৎ শুনতে পেল ভোরবেলার উপাসনার ঘণ্টা গির্জেতে বাজছে। ঘণ্টার শব্দ শুনে চার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে সে দেখল নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে বসে-বসে সারা রাত সে কাটিয়েছে। উঠে পড়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে সে গেল গির্জেয়। সেখানে পৌঁছে সে দেখে আলোয় ভরে উঠেছে গির্জেটি। সে-আলো মোমবাতির আলো নয়, উষার কোমল আলো। ইতিমধ্যেই সেখানে

লোকের ভীড় জমে উঠেছে। বসবার একটা আসনও খালি নেই। নড়্‌বড়্‌ করতে-করতে বুড়ি গিয়ে দেখে তার বসার জায়গা আর পুরো বেঞ্চিটাতেই অন্য লোক বসে পড়েছে। লোকদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সে দেখল তারা সবাই তার আত্মীয়-স্বজন, বহুকাল আগে যাদের সে হারিয়েছিল। পরনে তাদের পুরনো আমলের পোশাক, মুখ-গুলো ফ্যাকাশে! কেউই তারা কথা কইছিল না, গান গাইছিল না। কিন্তু গির্জের মধ্যেটা ভরে উঠেছিল একটা চাপা গুঞ্জনে।

একটা ভূত দাঁড়িয়ে উঠে বুড়ির কাছে গিয়ে বলল, "পূজাবেদীর দিকে তাকালে তোমার দুই ছেলেকে দেখতে পাবে।"

সেদিকে তাকিয়ে বুড়ি তার দুই ছেলেকে দেখতে পেল। একজন ফাঁসিকাঠে লটকাচ্ছিল। অন্যজনের দেহ শাস্তি দেবার যন্ত্রের মধ্যে টান-টান করে রাখা।

ভূত বলল, "দেখলে তো বেঁচে থাকলে তাদের কী দশা হত। যখন নিষ্পাপ শিশু ছিল তখন তাদের নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও।"

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে নতজানু হয়ে বসে ঈশ্বরের কাছে সে স্বীকার করল তাঁর কাছে নালিশ জানিয়ে সে খুব ভুল করে-ছিল। বুড়ি বুঝল ভালোর জন্যই সব-কিছু তিনি করেছিলেন।

তার তিনদিন পরে বুড়ির মৃত্যু হল।

স্বর্গের ভোজ

একদিন এক চাষীর ছোট্টো ছেলে গির্জেয় যাজককে বলতে শুনছিল সিধে পথে চললে স্বর্গে পৌঁছনো যায়। তাই সে সিধে পথ ধরে বেরিয়ে পড়ল। চলতে লাগল নানা পাহাড়ের উপর দিয়ে, নানা উপত্যকার ভিতর দিয়ে। সোজা সে চলল—কখনো ডাইনেও বেঁকে না, কখনো বাঁয়েও বেঁকে না। যেতে-যেতে অবশেষে সে পৌঁছল প্রকাণ্ড এক শহরে। সেখানকার এক সুন্দর গির্জেয় তখন উপাসনা হচ্ছিল। চারদিকের জাঁকজমক দেখে সে ভাবল—নিশ্চয়ই স্বর্গে পৌঁছে গেছে। খুব খুশি হয়ে সেখানে সে থেকে গেল।

উপাসনা শেষ হবার পর গির্জের এক কর্মচারি তাকে বলল বাইরে যেতে। সে বলল, "না, এখান থেকে নড়ছি না। অনেক কষ্টে স্বর্গে পৌঁচেছি। এখানেই থাকব।"

গির্জের কর্মচারি তখন যাজককে গিয়ে বলল—একটি বাচ্চা ছেলে

গির্জেতে রয়েছে, কিছুতেই বেরুতে চাইছে না, তার ধারণা সে স্বর্গে পৌঁছে গেছে।

যাজক বললেন, "তাই ভেবে থাকলে তাকে গির্জেতেই থাকতে দিতে হবে।"

তার পর ছেলেটির কাছে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন কাজ করতে সে রাজি আছে কি না। ছেলেটি জানাল, রাজি আছে, কাজ করতে সে অভ্যস্তও—কিন্তু স্বর্গের বাইরে কিছুতেই সে যাবে না।

তাই গির্জেতেই সে রইল। সেখানে থাকতে-থাকতে তার মনে হল কে যেন বলছে, 'ক্ষুধার্তকে তোমার খাদ্য দাও।' তাই গির্জের দরজায় যখনই সে দেখত কোনো গরিব শিশুকে কিম্বা কাঁপা-কাঁপা হাত মেলে কোনো বুড়ি ভিখিরিকে ভিক্ষে চাইতে, তখনই নিজের রুটির অর্ধেক তাদের সে দিয়ে দিত। আর দিয়ে খুব আনন্দ পেত।

কিছুকাল পর সে অসুখে পড়ল আর তার পর তার মনে হল সেই কণ্ঠস্বর যেন বলছে, 'আমি তোমাকে ভালো ভালো কাজ করতে দেখেছি। আগামী রবিবার আমার টেবিলেতে তুমি ভোজ খেতে আসবে।'

পরের রবিবার ছেলেটি মারা গেল। কারণ ভোজ খাবার জন্য স্বর্গ থেকে তার নিমন্ত্রণ এসেছিল।

বুড়ি ভিখিরি

এক সময় ছিল এক বুড়ি ভিখিরি। অন্য বুড়ি ভিখিরিদের মতোই সে ভিক্ষে করত, আর কেউ তাকে ভিক্ষে দিলে বলত, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!" এই বুড়ি ভিখিরি একদিন এক দোরগোড়া থেকে দেখে ছোট্টো একটি ছেলে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা সেঁকছে। বুড়িকে বাইরে দাঁড়িয়ে শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে দেখে ছেলেটি বলল, "ভিতরে এসে আগুন পুইয়ে নাও।" তাই সে ঘরের মধ্যে গেল। কিন্তু আগুনের খুব কাছে যাওয়াতে কোনো কিছু টের পাবার আগেই তার ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো পোশাক থেকে প্রথমে ধোঁয়া উঠতে লাগল আর তার

সেই তাতে ধরে গেল আগুন। এখন বল, ছেলেটির কি সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা উচিত ছিল না?—নিশ্চয়ই উচিত ছিল। কিন্তু তার কাছে জল না থাকলে?—জল না থাকলে সমবেদনায় তার কাঁদা উচিত ছিল, তা হলেই আগুন নেভাবার জল সে পেয়ে যেত। কারণ সমবেদনায় অসাধ্য সাধন করা যায়।

হেজেল-ঝোপ

একেক দিনে শিশু-যিশু তাঁর খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মা সেখানে গিয়ে তাকাতে আনন্দে আর গর্বে ভরে গেল তাঁর বুক।

তিনি বলে উঠলেন, "বাছা, শান্তিতে ঘুমোও। ইতিমধ্যে বনে গিয়ে তোমার জন্যে একমুঠো স্ট্রবেরি ফল তুলে আনি গে। জানি ঘুম থেকে উঠে সেগুলো খেতে তোমার খুব ভালো লাগবে।"

বনে গিয়ে তিনি দেখলেন গাছে ফলে রয়েছে চমৎকার এক থোকা স্ট্রবেরি ফল। কিন্তু ঝুঁকে পড়ে যেই তিনি সেটা তুলতে যাবেন অমনি

ঘাসের মধ্যে থেকে ফোঁস্‌ফোঁস্‌ করতে করতে একটা কেউটে সাপ লাফিয়ে বেরিয়ে এল। ভীষণ ভয় পেয়ে স্ট্রবেরি ফল সেখানে ফেলেই তিনি ছুটতে শুরু করলেন। কেউটেও ছুটল তাঁর পিছন-পিছন। মেরি-মাতা বুদ্ধি করে একটা হেজেল-ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়লেন আর কেউটেটাও সেখান থেকে বুকে হেঁটে ফিরে গেল। তার পর সেই স্ট্রবেরি ফলগুলো তুলে বাড়ি ফেরার পথে তিনি বলে উঠলেন, "হেজেল-ঝোপটা আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। এইভাবে চিরকাল মানুষকে সেটা বিপদ থেকে বাঁচাবে।"

সে কারণেই হেজেলগাছের সবুজ পাতা এত দিন ধরে সবরকম বিষাক্ত সাপের কামড় মন্ত্রের মতো সারিয়ে চলেছে।

ধাঁধা

এক রাজপুত্তুর একদিন বেরুল তার একমাত্র বিশ্বস্ত চাকরকে নিয়ে পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে। যেতে যেতে একদিন সে পৌঁছল গহন এক বনে। রাত হল। কিন্তু কোথাও তারা রাত কাটাবার আশ্রয় খুঁজে পেল না। হঠাৎ দেখে একটি মেয়ে চলেছে ছোট্টো একটা বাড়ির দিকে। মেয়েটির বয়েস কম, চেহারাও খুব সুন্দর। রাজপুত্তুর তাকে বলল, "ঐ ছোট্টো বাড়িতে আমি আর আমার চাকর কি রাত কাটাতে পারি?"

করুণ গলায় মেয়েটি বলল, "তা পার। কিন্তু ওখানে না যাওয়াই ভালো।"

রাজপুত্তুর প্রশ্ন করল, "কেন?"

মেয়েটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার সৎমা তুকতাক করে। অচেনা লোকদের দেখতে পারে না।"

রাজপুত্তুর বুঝল বাড়িটা এক ডাইনির। কিন্তু চার দিকে তখন এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যে এগুনো যায় না। রাজপুত্তুর তাই সাহসে ভর দিয়ে বাড়িটায় ঢুকল। বুড়ি ডাইনি আগুনের পাশে একটা আরাম কেদারায় বসেছিল। লালচে চোখ মেলে তাদের দিকে সে তাকাল।

তারপর মিষ্টি গলায় বলল, "শুভসন্ধ্যা! এসো—এসো। বিশ্রাম করো।"

ছোট্টো একটা সস্‌প্যানে কী যেন সে রাঁধছিল। বাতাস করে আগুনটা সে উস্‌কে দিল।

মেয়েটি চুপি চুপি বলল তারা যেন কোনো-কিছু না খায়। কারণ বুড়ি ডাইনি বানাচ্ছিল বিষাক্ত ঝোল।

রাজপুত্তুর আর তার চাকর ভালোয়-ভালোয় রাত কাটাল। বুড়ি ডাইনি বলল, "একটু সবুর করো। যাবার আগে একটু সরবত খেয়ে যাও। এক্ষুনি আনছি।"

বুড়ি ডাইনি সরবত বানাতে গেল। সেই ফাঁকে রাজপুত্তুর পালাল তার ঘোড়ায় চেপে। তার চাকর নিজের ঘোড়ায় জিন লাগাচ্ছিল। এমন সময় ফিরে এল সেই শয়তান ডাইনি।

ডাইনি বলল, "এই সরবতটা রাজপুত্তুরকে দিয়ো।" কিন্তু কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই গেলাসটা গেল ভেঙে। আর সেই বিষাক্ত বিষ ছিট্‌কে পড়ল চাকরের ঘোড়ার গায়ে। বিষটা এমন তেজালো যে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল ঘোড়াটা।

ছুটে গিয়ে রাজপুত্তুরকে তার চাকর জানাল সব কথা। তার পর ফিরল তার ঘোড়ার জিনটা নিতে। ফিরে দেখে তার মরা ঘোড়ায় বসে একটা দাঁড়কাক ঠোকরাচ্ছে। আপন মনে চাকর বলল, 'আজ হয়তো এর চেয়ে ভালো খাবার জুটবে না।' তাই দাঁড়কাকটাকে মেরে সে নিয়ে গেল।

সারাদিন ধরে রাজপুত্তুর আর তার চাকর ঘুরে বেড়ালো সেই বনের মধ্যে। কিন্তু বাইরে যাবার পথ খুঁজে পেল না। সন্ধেয় একটা সরাইখানা দেখে সেটার মধ্যে তারা ঢুকল। সেই দাঁড়কাকটা সরাইখানার মালিককে দিয়ে চাকর বলল রান্না করে দিতে। আসলে কিন্তু তারা গিয়ে পড়েছিল খুনে-ডাকাতদের মধ্যে। অন্ধকার ঘন হলে বারোজন খুনে-ডাকাত চুপি চুপি এল তাদের জিনিসপত্র লুঠ করে খুন করতে। কিন্তু নিজেদের কাজ শুরু করার আগে টেবিলের সামনে তারা বসল রাতের খাওয়া শেষ করতে। তাদের সঙ্গে খেতে বসল সরাইখানার মালিক আর সেই ডাইনিটাও। সেই দাঁড়কাকের স্যুপ প্রত্যেকে তারা এক বাটি করে নিল। আর যেই-না এক ঢোক করে গেলা, সবাই

তারা মারা পড়ল। কারণ ঘোড়াটার মাংস খেয়ে বিষিয়ে গিয়েছিল দাঁড়কাকের শরীর।

সরাইখানার মালিকের একমাত্র মেয়ে ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। মেয়েটি ছিল সৎ। ডাকাতদের ষড়যন্ত্রে সে যোগ দেয় নি। সরাইখানার সব ঘরের দরজা খুলে রাজপুত্তুর আর তার চাকরকে সে দেখাল রাশি রাশি ধনরত্ন। মেয়েটিকে রাজপুত্তুর বলল সেগুলো সব নিতে। বলল সে-সব ধনরত্নে তার দরকার নেই। আর তার পর ঘোড়ায় চড়ে চাকরকে নিয়ে সে গেল চলে।

যেতে-যেতে যেতে-যেতে তারা পৌঁছল এক শহরে। সেখানে ছিল ভারি সুন্দরী এক রাজকন্যে। সে জানিয়ে দিয়েছিল—এমন ধাঁধা যে তাকে বলতে পারবে যার উত্তর রাজকন্যে জানে না, তাকেই সে বিয়ে করবে। কিন্তু উত্তর দিতে পারলে লোকটির মাথা যাবে কাটা। তিনদিনের মধ্যে নজন লোক আসে তাকে বিয়ে করতে। নটা ধাঁধা রাজকন্যেকে তারা বলে। আর রাজকন্যে এমনই চালাক—সেই নটা ধাঁধারই উত্তর সে দেয়। ফলে নটা লোকেরই মাথা পড়ে কাটা। এমন সময় পৌঁছল সেই রাজপুত্তুর। রাজকন্যের রূপে মোহিত হয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে সে বিয়ে করতে চাইল। এই ধাঁধাটা রাজপুত্তুর তাকে বলল, "এমন জিনিস কী যেটা একজনকেও না মেরে বারোজনকে মেরে ফেলেছিল?" রাজকন্যে অনেক মাথা ঘামাল। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেল না জিনিসটা কী? ধাঁধার নানা পুঁথিপত্র সে বার করল। কিন্তু কোনোটাতেই উত্তর লেখা ছিল না। কিছুতেই উত্তরটা ভেবে না পেয়ে চুপি চুপি রাজপুত্তুরের ঘরে সে পাঠাল তার এক দাসীকে। তাকে বলে দিল সজাগ থেকে শুনতে, কারণ ঘুমের ঘোরে ধাঁধার উত্তরটা রাজপুত্তুর বলে ফেলতে পারে। কিন্তু প্রভুর বিছানায় শুয়ে ছিল সেই চালাক বিশ্বস্ত চাকর। চুপি চুপি দাসী আসতেই সে তার ছদ্মবেশের কোটটা খুলে নিয়ে তাকে দিল তাড়িয়ে। পরের রাতে রাজকন্যে পাঠাল তার খাস দাসীকে। কিন্তু তার ছদ্মবেশের কোটটাও খুলে নিয়ে সেই চালাক চাকর তাকে দিল তাড়িয়ে। তৃতীয় রাতে রাজপুত্তুর ভাবল, ভয়ের কারণ কেটে গেছে। তাই সে গিয়ে শুলো তার নিজের বিছানায়। কিন্তু সে রাতে এল রাজকন্যে নিজেই গায়ে একটা ছাই-রঙা কোট জড়িয়ে। রাজপুত্তুরের পাশে বসে সে ভাবল

রাজপুত্তুর ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সে ধাঁধাটার উত্তর তাকে জিগ্‌গেস করল আর ভাবল—ঘুমের ঘোরে রাজপুত্তুর হয়তো উত্তরটা বলে দেবে। রাজপুত্তুর কিন্তু জেগেই ছিল, বুঝেছিল সব-কিছুই।

রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "এমন জিনিস কী যেটা একজনকেও মারে নি?"

রাজপুত্তুর উত্তর দিল, "সেটা একটা দাঁড়কাক—ঘোড়ার বিষাক্ত মাংস খেয়ে মরেছিল।"

রাজকন্যে আবার প্রশ্ন করল, "তবু যেটা বারোজনকে মেরেছিল—এর মানে কী?"

"সেই দাঁড়কাককে খেয়ে বারোজন খুনে-ডাকাত মরেছিল।"

ধাঁধার উত্তর জানতে পেরে রাজকন্যে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্য। রাজপুত্তুর কিন্তু চেপে ধরল তার কোট। তাই সেটা নিয়ে রাজকন্যে পালাতে পারল না।

পরদিন সকালে রাজকন্যে জানাল ধাঁধার উত্তর সে বার করেছে। বিচারকরা এল উত্তরটা শুনতে। বিচার সভায় হাজির ছিল রাজপুত্তুর। সে বলল, "রাতে রাজকন্যে আমার কাছে এসে উত্তরটা জানতে চেয়েছিল। তাই তাকে আমি সেটা বলি। না বললে কিছুতেই সে বার করতে পারত না।

বিচারকরা বললেন, "তার প্রমাণ কী?" তাই-না শুনে রাজপুত্তুরের বিশ্বস্ত চাকর নিয়ে এল সেই কোট তিনটে। ছাই-রঙা কোটটা দেখেই বিচারকরা চিনতে পারলেন সেটা রাজকন্যের কোট বলে। তাই তাঁরা বললেন, "এই কোটে সোনার সুতো আর রুপোর সুতো দিয়ে কাজ করা হোক। কারণ এই কোটটাই হবে রাজকন্যের বিয়ের কোট।"

ঘুমন্ত রাজকন্যা

বহুকাল আগে এক ছিল রাজা আর এক ছিল রানী। রোজ তাঁরা বলতেন, "আমাদের যদি কোনো ছেলেপুলে হত!" কিন্তু তাঁদের ছেলেপুলে আর হয় না। একদিন রানী স্নান করছেন এমন সময় একটা ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে এসে বলল, "রানীমা, তোমার মনের ইচ্ছে পূর্ণ হবে। এক বছরের মধ্যেই তোমার কোলে আসবে একটি মেয়ে।" ব্যাঙের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হল। এক বছরের মধ্যেই রানীর কোলে এল একটি মেয়ে। মেয়েটির রূপ দেখে রাজার আনন্দ আর ধরে না। তিনি আদেশ দিলেন মস্ত এক ভোজসভার আয়োজন করতে। তিনি নেমন্তন্ন করলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবকে। আর সেই সঙ্গে জপতপ-জানা নানা বুড়িকে। তিনি আশা করেছিলেন বুড়িরা মেয়েটিকে নানা বর দেবে। এদিকে তাঁর রাজ্যে ছিল তেরোজন জপতপ-জানা বুড়ি। কিন্তু রাজার ছিল মাত্র বারোটি সোনার থালা। তাই সেই তেরোজনের মধ্যে একজনকে বাদ দিতে হল।

খুব ধুমধাম করে সেই ভোজসভা শেষ হল। তার পর সেই বুড়িরা মেয়েটিকে আশীর্বাদ করে দিল নানা বর। প্রথমজন দিল সদ্‌গুণ; দ্বিতীয়জন রূপ; তৃতীয়জন ধনদৌলত; এইভাবে মেয়েটি পেল মানুষের কামনার সব-কিছু। কিন্তু এগারোজন বর দেবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ হাজির হল সেই ত্রয়োদশতম বুড়ি, নেমন্তন্ন থেকে যে বাদ পড়েছিল। ভোজ-সভা থেকে বাদ পড়ায় সে চেয়েছিল প্রতিশোধ নিতে। কাউকে অভিবাদন না করে, কারুর দিকে না তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "রাজকন্যের

যেদিন পনেরো বছর পূর্ণ হবে সুতোকাটার মাকুর খোঁচা লেগে সেদিন সে মরবে।" তার পর আর একটি কথা না বলে সে গেল হলঘর থেকে বেরিয়ে।

সবাই হায়-হায় করে উঠল। তখন এগিয়ে এল দ্বাদশতম বুড়ি। বর দেওয়া তখনো তার বাকি। ত্রয়োদশতম বুড়ির অভিশাপ খণ্ডাবার পুরোপুরি ক্ষমতা তার ছিল না। তাই সেটা খানিক বদলে দিয়ে সে বলল, "সেই আঘাতে রাজকন্যে মরবে না। কিন্তু একশো বছরের জন্যে ঘুমিয়ে পড়বে।"

আদরের মেয়েকে সেই অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য রাজা আদেশ দিলেন তাঁর রাজত্বের সব চরকা পুড়িয়ে ফেলতে। অন্য বুড়িদের বর অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হল। এমন রূপে, গুণে, ভদ্রতায়, লাবণ্যে, বুদ্ধিতে মেয়েটি বড়ো হতে লাগল যে, যে-কেউ তার কাছে আসে সে-ই হয় মুগ্ধ।

এখন হল কি, রাজকন্যের যেদিন পনেরো বছর পূর্ণ হল রাজ-প্রাসাদে সে ছিল একা। কারণ বিশেষ কাজে রাজা-রানীকে বাইরে যেতে হয়েছিল। রাজপ্রাসাদের নানা বারান্দায়, নানা ঘরে মেয়েটি ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াতে লাগল, যে-সব জায়গায় আগে কখনো যায় নি সে-সব জায়গায় লাগল যেতে। শেষটায় সে পৌঁছল পুরনো ছোট্টো এক মিনারে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তার সামনে পড়ল ছোট্টো একটা দরজা। দরজার তালায় লাগানো ছিল মর্চে-ধরা একটা চাবি। চাবিটাকে সে ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। ছোট্টো ঘরটায় এক বুড়ি বসে বসে চরকা দিয়ে শণ থেকে সুতো কাটছিল।

রাজকন্যে বলল, "শুভদিন দিদিমা। তুমি কি করছ?"

মাথা হেলিয়ে বুড়ি বলল, "সুতো কাটছি।"

রাজকন্যে জিগেস করল, "ওটার নাম কি, অমন মজা করে যেটা ঘুরছে?" তার পর চরকার সামনে বসে দেখতে গেল সেও সুতো কাটতে পারে কি না। আর সেটা ছুঁতে-না-ছুঁতেই চরকার মাকু ফুটে গেল তার আঙুলে আর সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনকার কৌচ-এর উপর গভীর ঘুমে সে পড়ল ঘুমিয়ে। সেই ঘুম ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত প্রাসাদে।

রাজা-রানী সবে বাড়ি ফিরেছিলেন। হলঘরে তাঁরা পড়লেন ঘুমিয়ে। সেইসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল সভাসদ্‌বর্গ। আস্তাবলে ঘুমিয়ে পড়ল সব ঘোড়া; কুকুরের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল সব কুকুর; ছাতে ঘুমিয়ে

গ্রিম—২-৩

পড়ল সব পায়রা ; দেয়ালে ঘুমিয়ে পড়ল সব মাছি ; এমন-কি, ঘরের উনুনে যে আগুনের শিখাগুলো কাঁপছিল সেগুলোও পড়ল ঘুমিয়ে। শিককাবাবের শিকে মাংস পোড়ার শব্দ থেমে গেল। কী একটা জিনিস আনতে। বাসন-মাজা চাকর ভুলে গিয়েছিল বলে রাঁধুনি যাচ্ছিল তার চুল ধরে টানতে। তার হাত আর উঠল না। দুজনেই তারা পড়ল ঘুমিয়ে। প্রাসাদের চার পাশে গাছে গাছে বাতাসও পড়ল ঘুমিয়ে। একটা পাতাও আর কাঁপল না।

সেই প্রাসাদকে ঘিরে ছিল একটা কাঁটাঝোপ। সেটা কিন্তু বেড়েই চলল। বাড়তে বাড়তে এমন ঘন হয়ে উঠল যে, পুরো প্রাসাদটা চলে গেল চোখের আড়ালে। এমন-কি, সব চেয়ে উঁচু গম্বুজের উপরকার পতাকাটাও হল অদৃশ্য। লোকের মুখে-মুখে এই গল্পটা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল—কাঁটাঝোপের ওপাশে ঘুমিয়ে আছে এক রূপসী রাজকন্যে। সে-কাহিনী শুনে মাঝে মাঝে নানা রাজপুত্তুর এসে কাঁটাঝোপ কেটে প্রাসাদে যাবার চেষ্টা করত। কিন্তু কেউই সেখানে যেতে পারে নি। ঝোপের কাঁটাগুলো ছিল আঙুলের মতো। রাজপুত্তুরদের এমন জোর করে সেগুলো আঁকড়ে ধরত যে, তারা পালাতে পারত না। কাঁটাঝোপে ঝুলে খুব কষ্ট পেয়ে তারা মরত।

বহু বছর পরে এক রাজপুত্তুর বেরিয়েছিল দেশ-ভ্রমণে। এক বুড়ো লোকের মুখে সে শোনে সেই কাঁটাঝোপের কাহিনী। শোনে—সেই কাঁটাঝোপের ওপাশে আছে এক প্রাসাদ আর সেই প্রাসাদে একশো বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে রূপসী এক রাজকন্যে, নাম তার কাঁটা-গোলাপ। আর তার সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে রাজা আর রানী আর সভাসদ্‌-বর্গ। সেই বুড়ো লোকটি তার ঠাকুমার কাছে শুনেছিল—বহু রাজপুত্তুর সেই কাঁটাঝোপ ভেদ করে যেতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। কাঁটাঝোপে ঝুলতে ঝুলতে খুব কষ্ট পেয়ে তারা মরেছে।

বিদেশী রাজপুত্তুর বলল, "আমি ভয় পাই না। এক্ষুনি যাত্রা করছি। আমি দেখব সেই ঘুমন্ত রূপসীকে।"

বুড়ো লোকটি অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাকে যেতে বারণ করল। কিন্তু কোনোই ফল হল না। রাজপুত্তুর মনস্থির করে ফেলেছিল। তার কথায় কান দিল না।

আর সেদিনই পূর্ণ হল একশো বছর। সেদিনই কাঁটা-গোলাপ রাজকন্যের আবার জেগে ওঠার কথা। সেই কুখ্যাত কাঁটাঝোপে

পৌঁছে রাজপত্তুর দেখে একটা কাঁটাও নেই। তার বদলে ফুটে আছে সুন্দর সুন্দর ফুল। সে কাছে আসতেই আপনা থেকে ফাঁক হয়ে গেল কাঁটা-ঝোপ। অক্ষত শরীরে রাজপুত্তুরকে দিল সেটা ভিতরে যেতে। আর সে ভিতরে যেতেই আবার সেটা হয়ে গেল বন্ধ।

রাজপুত্তুর দেখে প্রাসাদের আঙিনায় ঘুমিয়ে আছে ঘোড়া আর হরিণ-শিকারী কুকুরের পাল আর ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে পায়রার ঝাঁক। বাড়িতে ঢুকে দেখে, দেয়ালে ঘুমুচ্ছে মাছি আর রান্না-ঘরে রাঁধুনি রয়েছে হাত বাড়িয়ে, যেন বাসনমাজা চাকরের চুলের ঝুঁটি ধরল বলে। দেখে রাঁধুনি ঝি ঘুমুচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার সামনে কালো একটা মুরগি। মুরগিটার পালক সে ছাড়াতে যাচ্ছিল।

বড়ো হলঘরে গিয়ে রাজপুত্তুর দেখে সিংহাসনের সামনে ঘুমিয়ে রয়েছেন রাজা রানী আর চেয়ার আর সোফায় ঘুমুচ্ছে সভাসদ্‌বর্গ। আরো এগুতে স্তব্ধতা এমন গভীর হয়ে উঠল যে, সে স্পষ্ট শুনতে পেল নিজের নিশ্বেসের শব্দ। শেষটায় সে পৌঁছল সেই পুরনো মিনারে আর যে ছোট্টো ঘরে কাঁটা-গোলাপ রাজকন্যে ঘুমুচ্ছিল সে ঘরের দরজা সে খুলল। ঘুমন্ত রাজকন্যের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে সে চোখ ফেরাতে পারল না। ঝুঁকে পড়ে তাকে সে চুমু খেল।

তার ঠোঁটের ছোঁয়া লেগে কাঁটা-গোলাপ রাজকন্যের চোখের পাতা কেঁপে উঠল। তার পর চোখ মেলে তাকিয়ে রাজপুত্তুরকে দেখে বন্ধুর মতো মৃদু হাসল। দুজনে তারা নেমে আসতে জেগে উঠলেন রাজা আর রানী আর সভাসদ্‌বর্গ। অবাক হয়ে তাদের দিকে তারা তাকাল। আস্তাবলে ঘোড়াগুলো জেগে উঠে খুর ঠুকতে লাগল, শিকারী কুকুরগুলো গা ঝাঁকিয়ে নাড়তে লাগল লেজ। পায়রাগুলো ডানা থেকে মাথা বার করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে উড়ে গেল মাঠে। মাছিগুলো উঠে গেল দেয়ালের আরো খানিক উঁচুতে। রান্নাঘরের উনুনে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠে ডিনার রাঁধতে লাগল। শিককাবাবের শিকের মাংস আবার লাগল শব্দ করে ঝলসাতে। বাসনমাজা চাকরের কান রাঁধুনি সজোরে মুলে দিতে সে উঠল তারস্বরে চেঁচিয়ে আর রাঁধুনি ঝি চলল এক মনে মুরগির পালক ছাড়াতে। আর তার কিছুদিন পরে খুব ধুমধাম করে কাঁটা-গোলাপ রাজকন্যের সঙ্গে রাজপুত্তুরের বিয়ে হয়ে গেল আর বাকি জীবন তারা রইল পরম আনন্দে বেঁচে।

বাসনমাজা ঝি

এক সময় ছিলেন এক রাজা। তাঁর বউয়ের ছিল সোনালী চুল। বউটির মতো সুন্দরী আর হয় না। একদিন বউটি অসুখে পড়ল আর তার মনে হল সে আর বাঁচবে না। তাই রাজাকে সে বলল, "আমি মরে যাবার পর আবার যদি তুমি বিয়ে কর তা হলে এমন মেয়েকে বিয়ে করবে যে আমার মতো সুন্দরী আর যার চুল আমার মতো সোনালী। আমাকে এ কথা তোমায় দিতেই হবে।" রাজা কথা দিলে রানী চির-কালের মতো চোখ বুজল।

বহুকাল রানীর জন্য রাজা শোক করলেন। কিছুতেই আর বিয়ে করতে চাইলেন না।

শেষটায় তাঁর মন্ত্রীরা বলল, "আপনাকে বিয়ে করতেই হবে। কারণ রানী না থাকলে রাজত্ব চলে না।"

আগের রানীর মতো সুন্দরী মেয়ের খোঁজে সারা পৃথিবীতে দূত পাঠানো হল। কিন্তু তাঁর মতো সুন্দরী মেয়ের খোঁজ কোথাও পাওয়া গেল না। আর যদি-বা তাঁর মতো সুন্দরী মেয়ের খোঁজ মেলে, তার মাথার চুল আগের মতো সোনালী হয় না। দূতরা তাই হতাশ হয়ে ফিরে এল।

রাজার এক মেয়ে ছিল। রানীর মতোই সুন্দরী হয়ে সে বড়ো হয়ে উঠল। তার চুলও রানীর মতো সোনালী। রাজা একদিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে তার মায়ের চেহারার আদল দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মন্ত্রীদের তিনি বললেন, "আমার মেয়েকেই আমি বিয়ে করব, কারণ তাকে দেখতে হুবহু আমার স্ত্রীর মতো।"

রাজার কথা শুনে মন্ত্রীরা আঁত্‌কে উঠল। রাজাকে তারা বলল, ভগবানের আদেশ—কেউ কখনো নিজের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। সেই পাপ করলে কোনোদিন মঙ্গল হবে না তাঁর রাজত্বের। রাজার কথা শুনে তাঁর মেয়েও খুব ভয় পেয়ে রাজাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। রাজাকে সে বলল, "তোমাকে বিয়ে করার আগে আমার তিনটে পোশাক দরকার। একটা সূর্যের মতো সোনার, একটা চাঁদের মতো রুপোর, একটা তারার মতো জ্বল্‌জ্বলে। তা ছাড়া আমার একটা ক্লোক দরকার। সেটা তৈরি করতে হবে হাজার পশুর চামড়া দিয়ে আর তাতে থাকবে তোমার রাজত্বের সব পশুর লোম।" কথাটা রাজাকে বলে সে ভাবল, 'এ-ধরনের পোশাক বাবার পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। তাই তিনি নিরস্ত হতে বাধ্য হবেন।'

রাজা কিন্তু তাঁর রাজত্বের সব চেয়ে দক্ষ চরকা-বুড়িদের বললেন সুতো কেটে পোশাকগুলো বানাতে—একটা সূর্যের মতো সোনার, একটা চাঁদের মতো রুপোর আর একটা তারার মতো জ্বল্‌জ্বলে। শিকারীদের আদেশ দিলেন, তাঁর রাজত্বের সব পশুদের বধ করে তাদের হাজার চামড়া দিয়ে একটা ক্লোক বানাতে। পোশাকগুলো তৈরি হলে পর ক্লোকটা তাঁর সামনে বিছিয়ে রাজা ঘোষণা করলেন, "কাল বিয়ের দিন।"

রাজকন্যে দেখল রাজাকে নিরস্ত করার আর কোনো আশা নেই। তাই স্থির করল—সে পালাবে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পর উঠে তার গয়নাগাটি আর দামী-দামী জিনিসপত্র থেকে তিনটে জিনিস সে বেছে নিল—একটা সোনার আংটি, একটা সোনার চরকা আর একটা সোনার খরগোশের ছাল। সূর্য, চাঁদ আর তারার মতো পোশাকগুলো ভাঁজ করে সে ভরল একটা বাদামের খোলার মধ্যে। ক্লোকটা পরে মুখে আর হাতে মাখল আখরোটের রস। তার পর ভগবানের নাম নিয়ে পড়ল বেরিয়ে। সারা রাত ধরে হেঁটে সে পৌঁছল প্রকাণ্ড এক বনে। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে একটা গাছের কোটরে বসে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সূর্য উঠল, বেলা অনেক বাড়ল, তবুও তার ঘুম ভাঙল না। এখন হল কি, সেই বনটা যে-রাজার, তিনি সেখানে এসেছিলেন শিকার করতে। তাঁর শিকারী কুকুরগুলো সেই গাছটার কাছে পৌঁছে সেটার চার পাশে লাফাতে-লাফাতে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল।

শিকারীদের রাজা বললেন, ওখানে গিয়ে দেখো কোন বুনো হরিণ লুকিয়ে আছে।"

শিকারীরা সেখানে গিয়ে দেখে এসে রাজাকে বলল, "মহারাজ! গাছের কোটরে একটা আশ্চর্য প্রাণী রয়েছে। সেরকম প্রাণী আগে আমরা কখনো দেখি নি। তার চামড়ায় হাজার ধরনের পশম। সে ঘুমচ্ছে।"

রাজা বললেন, "তাকে জীবন্ত ধরে মালগাড়িতে বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাও।"

শিকারীরা রাজকন্যেকে ধরার পর তার ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ ভয় পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি গরিব মেয়ে। বাবা-মা আমাকে ফেলে পালিয়েছে। আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার কোরো।"

তারা বলল, "বাসনমাজা ঝিয়ের কাজ তোকে দিয়ে চলবে। ছাইপাঁশ কুড়ুবি চল্।" এই-না বলে মালগাড়ির সঙ্গে বেঁধে তাকে তারা নিয়ে এল রাজপ্রাসাদে। সিঁড়ির তলায় ছিল একটা বাসন-কোসন রাখার আলমারি। সেখানে দিনের আলো পৌঁছত না। সেটা তাকে দেখিয়ে তারা বলল, "ছোট্টো বুনো পশু, ঐখানে তুই থাকবি আর ঘুমবি।" তার পর তারা তাকে পাঠাল রান্নাঘরে। সেখানে তাকে নানা নোংরা কাজ আর ফাইফরমাশ খাটতে হত। যেমন—কাঠ চেরা, জল তোলা, উনুনের ঝাঁঝরি সাফ করা, ছাই ফেলা, তরি-তরকারি ধোয়া আর পশুপাখির নাড়িভুঁড়ি বার করা। এইভাবে ক্রীতদাসের মতো বহু কষ্টে তার দিন কাটে। হায়, রাজকন্যের কী কপাল! কতদিন তাকে এভাবে কষ্ট পেতে হবে বলে তোমাদের মনে হয়?

একদিন রাজপ্রাসাদে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন হয়েছে। রাজকন্যে রাঁধুনিকে বলল, "ওপরতলায় গিয়ে আমি একটু দেখতে পারি? দরজার আড়ালে আমি লুকিয়ে থাকব।"

রাঁধুনি বলল, "যেতে পারিস। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে তোকে ছাই ফেলতে হবে।" অনুমতি পেয়ে সে তার ছোট্টো পিদিম নিয়ে গেল তার থাকার আলমারিতে। সেখানে সে তার পশমের ক্লোক ছেড়ে, মুখ আর হাত থেকে ময়লার ছোপ ধুয়ে ফেলল। ফলে আবার সে হয়ে উঠল চোখ ধাঁধানো সুন্দর। তার পর বাদামের খোলা থেকে

সেই পোশাকটা বার করল, যেটা সূর্যের মতো ঝক্‌ঝকে। পোশাকটা পরে উপরতলার ভোজসভায় সে গেল। সবাই সরে গিয়ে করে দিল তার যাবার পথ। কেউই তাকে চিনতে পারল না। সবাই ভাবল, বুঝি কোনো বিদেশী রাজকন্যে এসেছে।

রাজা এগিয়ে এসে তার হাতে চুমু খেয়ে তার সঙ্গে নাচলেন। তাঁর মনে হল অমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে তিনি দেখেন নি।

নাচ শেষ হবার পর রাজকন্যে নতজানু হয়ে অভিবাদন করল। রাজা যখন ফিরে তাকালেন রাজকন্যে তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ জানল না কোথায় গেছে সে। রাজপ্রাসাদের বাইরেকার প্রহরীদের ডেকে প্রশ্ন করা হল। কিন্তু তারা বলল, মেয়েটিকে বেরিয়ে যেতে কেউ দেখে নি। রাজকন্যে ছুটে গিয়েছিল তার থাকার আলমারিতে। সেখানে তাড়াতাড়ি তার পোশাক খুলে, মুখে হাতে কালিঝুলি মেখে, সেই পশমের ক্লোক পরে আবার সে হয়ে উঠল বাসনমাজা ঝি।

রান্নাঘরে নিজের কাজে ফিরে যাবার পর রাঁধুনি তাকে বলল, "ছাইগুলো কাল ফেলিস। আমার হয়ে রাজার স্যুপ্ বানা। আমিও খানিক দেখে আসি গে। স্যুপে যেন একটা চুলও না পড়ে। পড়লে কক্ষনো আর পাত-কুড়নো এঁটোকাঁটা খেতে দেব না।"

রাঁধুনি চলে যেতে রাজকন্যে খুব যত্ন করে বানাল রাজার স্যুপ্। তার পর তার থাকার আলমারিতে গিয়ে সোনার আংটিটা এনে যে-ডিশে রাজার স্যুপ্ পরিবেশন করার কথা সেই ডিশে রেখে দিল।

নাচ শেষ হবার পর রাজা বললেন তাঁর স্যুপ্ নিয়ে আসতে আর সেটা খেয়ে বললেন অমন চমৎকার স্যুপ্ আগে কখনো খান নি। তার পর বাটির তলানিতে সোনার আংটিটা দেখে ভেবে পেলেন না—কী করে সেখানে ওটা এল। তিনি আদেশ দিলেন রাঁধুনিকে তাঁর সামনে হাজির করতে।

রাজার আদেশ শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বাসনমাজা ঝিকে সে বলল, "মনে হচ্ছে স্যুপের মধ্যে একটা চুল ফেলেছিলি। ফেলে থাকলে তোকে বেদম পেটাব।"

রাঁধুনি সামনে এসে দাঁড়াল রাজা প্রশ্ন করলেন, "স্যুপ্‌টা কে বানিয়েছে?"

রাঁধুনি বলল, "আমি মহারাজ!"

রাজা বললেন, "তোমার কথা সত্যি নয়। তুমি বানিয়ে থাকলে অন্য ভাবে বানিয়েছ। যেমন বানাও তার চেয়ে অনেক ভালো।"

রাঁধুনি বলল, "স্বীকার করছি, মহারাজ, স্যুপ্‌টা আমি বানাই নি। বানিয়েছে বাসনমাজা ঝি।"

রাজা আদেশ দিলেন, "তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

বাসনমাজা ঝি এলে পর রাজা প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি?"

সে বলল, "আমি এক গরিব মেয়ে। আমার মা-বাবা নেই।"

আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, "রাজপ্রাসাদে কী করছ?"

সে বলল, "কিছুই না। সবাই আমায় লাথিঝাঁটা মারে।"

"আমার স্যুপের মধ্যে যে-আংটি ছিল সেটা কোথায় পেলে?"

"আংটি? কোন আংটি? আংটির কোনো কথাই জানি না।"

রাজা দেখলেন তার মুখ থেকে কোনো কথা আদায় করা যাবে না। তাই তাকে রান্নাঘরে ফেরত পাঠালেন।

কিছুদিন পর রাজপ্রাসাদে আবার এক ভোজসভার আয়োজন হল। বাসনমাজা ঝি আবার আগের মতো রাঁধুনির অনুমতি চাইল উপর তলায় গিয়ে খানিক দেখে আসার।

রাঁধুনি বলল, "যেতে পারিস। কিন্তু ফিরে এসে সেবারকার মতো স্যুপ্‌ বানাতে হবে। রাজার সেটা খুব পছন্দ হয়েছিল।"

রাজকন্যে তার থাকার আলমারিতে ছুটে গিয়ে, চট্‌পট্‌ মুখহাত ধুয়ে সেই পোশাকটা বার করল, যেটা চাঁদের মতো রুপোলী। তার পর সেটা পরে গেল বল্‌-নাচের ঘরে। রাজা এগিয়ে এসে বললেন, সুন্দরী রাজকন্যের আবার দেখা পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। তার পর নাচলেন তার সঙ্গে। কিন্তু নাচ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন চট্‌পট্‌ সে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, রাজা দেখতেই পেলেন না কোন দিকে সে গেছে। রাজকন্যে তার থাকার আলমারির মধ্যে গিয়ে বাসনমাজা ঝির পোশাক পরে রান্নাঘরে গেল স্যুপ্‌ রাঁধতে। তার পর রাঁধুনি উপরতলায় গেলে সে তার ছোট্ট সোনার চরকাটা এনে যে-ডিশে রাজার স্যুপ্‌ পরিবেশন করার কথা সেই ডিশে রেখে দিল। স্যুপ্‌ খেয়ে রাজা বললেন অমন চমৎকার স্যুপ্‌ আগে কখনো খান নি।

আবার রাঁধুনির ডাক পড়ল আর আগের মতোই সে স্বীকার করতে বাধ্য হল—স্যুপ্‌টা সে রাঁধে নি, রেঁধেছে বাসনমাজা ঝি।

আবার বাসনমাজা ঝির ডাক পড়ল আর সে জানাল সোনার চরকার কথা কিছুই সে জানে না। সেখানে সে আছে লাথিঝাঁটা খেয়ে।

তৃতীয়বার রাজা যখন তাঁর প্রাসাদে ভোজসভার আয়োজন করলেন তখন আগের দুবারের মতোই সব-কিছু ঘটল।

রাঁধুনি বলল, "ঝি, নিশ্চয়ই তুই ডাইনি। না হলে আমার চেয়ে তোর বানানো স্যুপ্ রাজার অত ভালো লাগে কেন ?"

কিন্তু মেয়েটি নাচ দেখতে যাবার জন্য কাকুতি-মিনতি করলে রাঁধুনি তাকে দিল যাবার অনুমতি। এবার সে পরল সেই পোশাকটা তারার মতো যেটা জ্বল্‌জ্বলে। হলঘরে সে যেতে রাজা তার সঙ্গে নাচলেন আর তাঁর মনে হল আগের চেয়েও রাজকন্যেকে সুন্দর দেখাচ্ছে। নাচ যখন চলছে তখন রাজকন্যের অজানতে রাজা তার আঙুলে একটা আংটি পরিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন বেশিক্ষণ ধরে নাচের বাজনা বাজিয়ে যেতে। নাচ শেষ হবার পর তিনি চেষ্টা করলেন রাজকন্যের দু হাত শক্ত করে চেপে থাকতে। কিন্তু হাত ঝাঁকিয়ে চট্‌পট্ ভিড়ের মধ্যে সে মিলিয়ে গেল।

এক ছুটে সিঁড়ির তলার থাকার আলমারির মধ্যে সে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ফিরতে তার আধঘণ্টার বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই তারার মতো জ্বল্‌জ্বলে পোশাকটা বদলাবার সময় সে পেল না। সেটার উপরেই তার পশমের ক্লোকটা সে পরে নিল আর তাড়াহুড়োয় ভুলে গেল হাতেমুখে পুরোপুরি কালিঝুলি মাখতে। তার একটা আঙুল হয়ে রইল ধব্‌ধবে ফরসা।

বাসনমাজা ঝি তখন রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে রাজার জন্য বানাল স্যুপ্ আর রাঁধুনি যখন নাচ দেখতে গেল তখন সে তার সেই সোনার খরগোশের ছালটা রেখে দিল ডিশের মধ্যে।

সেটা দেখে রাজা আদেশ দিলেন বাসনমাজা ঝিকে তাঁর সামনে হাজির করতে। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পেলেন তার ধব্‌ধবে ফরসা আঙুল আর নাচবার সময় যে-আংটিটা পরিয়ে দিয়েছিলেন সেটা। রাজা শক্ত করে তার হাত চেপে ধরলেন। রাজকন্যে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে তার পশমের ক্লোক খানিক ফাঁক হয়ে সেই তারার মতো জ্বল্‌জ্বলে পোশাকের খানিকটা বেরিয়ে পড়ল। তার পর দেখা গেল তার সোনালী চুল। তখন আর লুকিয়ে থাকা রাজকন্যের পক্ষে সম্ভব

হল না। মুখ থেকে কালিঝুলি মুছে ফেলতে তার রূপ যেন ফেটে পড়ল।

রাজা বললেন, "এবার তোমায় বিয়ে করব। জীবনে আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।" তাদের বিয়ে হয়ে গেল আর আজীবন তারা রইল সুখে-স্বচ্ছন্দে।

চালাক এল্‌সি

এক সময়ে একটি লোকের একটি মেয়ে ছিল। লোকে তাকে ডাকত 'চালাক এল্‌সি' বলে। সে বড়ো হয়ে উঠতে তার বাবা বলল, "এবার মেয়ের বিয়ে দেব।"

তার মা বলল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু কেউ এসে ওকে বিয়ে করতে চাইলে তবেই তো বিয়ে হতে পারে।"

অবশেষে জ্যাক নামে একটি লোক দূর দেশ থেকে এসে তাকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু তার ছিল একমাত্র শর্ত—চালাক এল্‌সির বাস্তবিকই চালাক হওয়া দরকার।

বাবা বলল, "মেয়েটার মাথায় বুদ্ধি গজ্‌গজ্‌ করছে।"

মা বলল, "মেয়ের আমার কী যে বুদ্ধি কী বলব!" পথে-পথে সে দেখতে পায় বাতাসকে ছুটে যেতে আর শুনতে পায় মাছিদের কাশির শব্দ।"

জ্যাক বলল, "কিন্তু মনে রাখবেন—খুব চালাক না হলে ওকে বিয়ে করব না।"

টেবিলের সামনে বসে ডিনার শুরু করার আগে মা বলল, "এল্‌সি, মাটির তলার ঘর থেকে খানিকটা বিয়ার[১] নিয়ে আয়।"

দেয়ালে-টাঙানো টিনের পাত্রটা নিয়ে চালাক এল্‌সি চলল মাটির তলার ঘরে। যেতে-যেতে মনের আনন্দে ঢাকনি দিয়ে টিনের পাত্রটা ঠুকে ঠং-ঠং শব্দ সে করতে লাগল। ঘরটায় পৌঁছে একটা টুল এনে বিয়ার-এর পিপের সামনে সে বসল, যাতে ঝুঁকে থেকে কোমর না ধরে যায়। তার পর পা দিয়ে টিনের পাত্রটা ঠেলে পিপের কল সে খুলে দিল। পাত্রে যখন বিয়ার পড়ছে তখন কুঁড়ের মতো পাত্রটার দিকে তাকিয়ে না থেকে সে তাকাতে লাগল দেওয়ালগুলোর দিকে। তাকাতে-তাকাতে নজরে পড়ল, তার মাথার উপর ছাত থেকে ঝুলছে ছোট্টো একটা কুড়ুল। যারা বাড়ি বানিয়েছিল ভুলে তারা সেটা সেখানে আটকে রেখে গিয়েছিল। চালাক এল্‌সি কাঁদতে শুরু করে বলে উঠল, "যখন জ্যাক আমার বর হবে, তার পর যখন আমার ছেলে হবে, তার পর সে ছেলে যখন বড়ো হবে আর যখন তাকে এই মাটির নীচেকার ঘরে আমরা বিয়ার আনতে পাঠাব—তখন এই কুড়ুলটা তার মাথায় পড়বে আর সে মরবে।"

ভবিষ্যতের এই দুর্ঘটনার কথা ভেবে হাপুস্‌ নয়নে সে কেঁদে চলল। উপরতলায় তার বাবা-মা বসেছিল বিয়ার-এর অপেক্ষায়। চালাক এল্‌সিকে ফিরতে না দেখে দাসীকে গিন্নি বললেন, "মাটির তলার ঘরে গিয়ে দ্যাখ এল্‌সির কেন এত দেরি হচ্ছে।"

দাসী গিয়ে দেখে পিপের সামনে বসে সে গলা ছেড়ে কাঁদছে। সে প্রশ্ন করল, "এল্‌সি কাঁদছ কেন?"

এল্‌সি বলল, "কাঁদবার কী যথেষ্ট কারণ নেই? যখন জ্যাক আমার বর হবে, তার পর যখন আমার ছেলে হবে, তার পর সে-ছেলে যখন বড়ো হবে আর যখন তাকে এই মাটির নীচেকার ঘরে আমরা বিয়ার আনতে পাঠাব—তখন এই কুড়ুলটা তার মাথায় পড়বে আর সে মরবে।"

তাই শুনে দাসী চেঁচিয়ে উঠল, "আমাদের এল্‌সি কী চালাক!" এই-না বলে তার পাশে বসে সেই দুর্ঘটনার কথা ভেবে সেও কাঁদতে শুরু করে দিল। খানিক পরে দাসীকে ফিরতে না দেখে এল্‌সির বাবা তার ক্ষেতমজুরকে বলল, "মাটির তলার ঘরে গিয়ে দ্যাখ্‌, এল্‌সি আর দাসী কেন ওখানে এতক্ষণ রয়েছে।"

---

১ হালকা ধরনের সুরা।

ক্ষেতমজুর গিয়ে দেখে চালাক এল্‌সি আর দাসী দুজনেই কাঁদছে। সে প্রশ্ন করল, "তোমরা কাঁদছ কেন?"

এল্‌সি বলল, "কাঁদবার কি যথেষ্ট কারণ নেই? যখন জ্যাক আমার বর হবে, তার পর যখন আমার ছেলে হবে, তার পর সে ছেলে যখন বড়ো হবে আর যখন তাকে এই মাটির নীচেকার ঘরে আমরা বিয়ার আনতে পাঠাব—তখন এই কুড়ুলটা তার মাথায় পড়বে আর সে মরবে!"

তাই শুনে ক্ষেতমজুর চেঁচিয়ে উঠল, "আমাদের এল্‌সি কী চালাক!" এই-না বলে তাদের পাশে বসে সেই দুর্ঘটনার কথা ভেবে সেও কাঁদতে শুরু করে দিল। উপরতলায় সেই ক্ষেতমজুরের জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। তাকে ফিরতে না দেখে এল্‌সির বাবা তার বউকে বলল, "মাটির তলার ঘরে গিয়ে দ্যাখো এল্‌সি কী করছে!"

তার বউ নীচে গিয়ে তাদের তিনজনকে পরিত্রাহি কাঁদতে দেখে কারণটা জানতে চাইল।

এল্‌সি বলল, "কাঁদবার কি যথেষ্ট কারণ নেই। যখন জ্যাক আমার বর হবে, তার পর যখন আমার ছেলে হবে, তার পর সে-ছেলে যখন বড়ো হবে আর যখন তাকে মাটির নীচেকার ঘরে আমরা বিয়ার আনতে পাঠাব—তখন এই কুড়ুলটা তার মাথায় পড়বে আর সে মরবে।"

তাই শুনে তার মা চেঁচিয়ে উঠল, "আমাদের এল্‌সি কী চালাক!" এই-না বলে তাদের পাশে বসে সেও কাঁদতে শুরু করে দিল।

উপরতলায় এল্‌সির বাবা আরো খানিক অপেক্ষা করল। বউকে ফিরতে না দেখে তার বিয়ার-এর তেষ্টা ক্রমশ উঠল বেড়ে। শেষটায় সে বলল, "মাটির তলার ঘরে গিয়ে আমাকেই দেখতে হয় এল্‌সি কেন আসছে না।" মাটির তলার ঘরে গিয়ে সে দেখে, সবাই তারা বসে বসে একসঙ্গে পরিত্রাহি কেঁদে চলেছে। সে প্রশ্ন করল, "তোমরা সবাই কাঁদছ কেন?"

এল্‌সি বলল, "কাঁদবার কি যথেষ্ট কারণ নেই? যখন জ্যাক আমার বর হবে, তার পর যখন আমার ছেলে হবে, তার পর সে-ছেলে যখন বড়ো হবে আর যখন তাকে এই মাটির নীচেকার ঘরে আমরা বিয়ার আনতে পাঠাব—তখন এই কুড়ুলটা তার মাথায় পড়বে আর সে মরবে।"

তাই শুনে তার বাবা চেঁচিয়ে উঠল, "আমাদের এল্‌সি কী চালাক।" এই-না বলে তাদের পাশে বসে সেও কাঁদতে শুরু করে দিল।

উপরতলায় খানিকক্ষণ জ্যাক একলা বসে অপেক্ষা করল। কিন্তু কাউকে ফিরতে না দেখে আপন মনে সে বলে উঠল, 'আমার জন্য নীচের তলায় সবাই নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। আমাকে গিয়ে দেখতে হয় কী তারা করছে।'

নীচের তলায় সে গিয়ে দেখে তারা পাঁচজনেই গলা ছেড়ে কাঁদছে। সে প্রশ্ন করল, "তোমরা সবাই কাঁদছ কেন?"

এল্‌সি বলল, "জ্যাক, আমাদের যখন বিয়ে হবে, তার পর যখন আমাদের ছেলে হবে, আর সে-ছেলে যখন বড়ো হবে আর যখন তাকে এই মাটির নীচেকার ঘরে আমরা বিয়ার আনতে পাঠাব—তখন ছাতে-আটকানো এই কুড়ুলটা তার উপর পড়ে তার মাথা গুঁড়িয়ে মেরে ফেলতে পারে। আমাদের কাঁদবার এটা কি যথেষ্ট কারণ নয়?"

জ্যাক বলল, "আমার সংসারে তোমার চেয়ে বেশি চালাক আর কারুর দরকার নেই। এত চালাক বলে, এল্‌সি—তুমিই আমার বউ হবে।" এই-না বলে এল্‌সির হাত ধরে তাকে সে নিয়ে এল উপর-তলায় আর তার পর তাদের হয়ে গেল বিয়ে।

বিয়ের কিছুদিন পরে জ্যাক তাকে বলল, "বউ, বাইরে খেটে রুজি-রোজগার করতে চললাম। ক্ষেতে গিয়ে তুমি ফসল কাটো যাতে আমাদের রুটি জোটে।"

এল্‌সি বলল, "তাই যাব, জ্যাক।"

জ্যাক চলে গেলে খানিকটা পরিজ্ বানিয়ে সে সঙ্গে নিয়ে গেল। ক্ষেতে পৌঁছে সে আপন মনে বলে উঠল, 'কী করি? আগে ফসল কাটি, নাকি আগে খেয়ে নি? আগে খেয়েই নেওয়া যাক।'

তাই প্রথম সে পরিজের পুরো বাটি শেষ করল। পেট ভরতে আবার আপন মনে সে বলে উঠল, 'কী করি? আগে ফসল কাটি, নাকি আগে ঘুমিয়ে নি? আগে ঘুমনোই যাক।' এই-না বলে ফসলের ক্ষেতে শুয়ে সে পড়ল ঘুমিয়ে।

জ্যাক অনেকক্ষণ বাড়ি ফিরেছিল। তবু এল্‌সিকে ফিরতে না দেখে সে মনে মনে ভাবল, 'আমার এল্‌সি কী চালাক! এমন পরিশ্রমী, যে, খাবার জন্যেও বাড়ি ফিরছে না।' কিন্তু সন্ধেতেও তাকে ফিরতে না

দেখে জ্যাক বেরুল কতটা ফসল কাটা হয়েছে দেখতে। গিয়ে দেখে ফসল একেবারেই কাটা হয় নি আর ফসল ক্ষেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে এল্‌সি।

তাই-না দেখে জ্যাক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ছোটো-ছোটো ঘণ্টা লাগানো পাখি ধরার একটা জাল এনে তার চার পাশে সেটা টাঙিয়ে দিল। এল্‌সির কিন্তু ঘুম ভাঙল না। জ্যাক তখন আবার দৌড়ে বাড়ি ফিরে, সদর দরজায় কুলুপ দিয়ে গিয়ে বসল তার কাজের টুলে।

অন্ধকার জমাট বাঁধার পর চালাক এল্‌সির ঘুম ভাঙল। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটার সময় যতবারই সে পা ফেলে ততবারই ঝম্‌ঝম্‌ করে বেজে ওঠে ঘণ্টাগুলো। তখন তার খুব ভয় হল আর সন্দেহ করতে শুরু করল সত্যি সত্যি সে 'চালাক এল্‌সি' কি না। সে বলে উঠল, 'আমি কি আমি, নাকি আমি আমি নই?'

এই প্রশ্নের উত্তর সে জানত না। তাই দাঁড়িয়ে পড়ে খানিক ইতস্তত করল। শেষটায় ভাবল, 'বাড়ি ফিরে জিগেস করি গিয়ে—আমি কি আমি, নাকি আমি আমি নই। ওরা নিশ্চয়ই উত্তরটা জানবে।'

দৌড়ে সদর দরজার কাছে গিয়ে সে দেখে সেটায় কুলুপ আঁটা। তার পর দরজায় টোকা দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "জ্যাক, এল্‌সি কি বাড়িতে আছে?"

জ্যাক উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এল্‌সি বাড়িতে আছে।"

জ্যাকের কথা শুনে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল, "হায়-হায়, আমি তা হলে আমি নই। আরেকটা বাড়ির কাছে সে গেল। কিন্তু ঘণ্টাগুলোর ঝন্‌ঝন্‌ শুনে কেউই দরজা খুলল না। এইভাবে কোথাও আশ্রয় পেল না সে। তাই দৌড়ে সে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল। তার পর থেকে কেউই তাকে আর দেখে নি।

ভাগ্যবান তিন ছেলে

তিন ছেলেকে ডেকে তাদের বাবা বড়ো ছেলেকে দিল একটা মোরগ, মেজোকে একটা কাস্তে আর ছোটোকে একটা বেড়াল।

তার পর বলল, "আমি বুড়ো হয়েছি। বেশিদিন আর বাঁচব না। মরবার আগে তোমাদের ভবিষ্যতের সংস্থান করে যাব। তোমাদের দেবার মতো টাকাকড়ি আমার নেই। যে জিনিসগুলো আজ দিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে হবে সেগুলো নেহাতই তুচ্ছ। কিন্তু এগুলো যেভাবে কাজে লাগাবে তার ওপরেই সব-কিছু নির্ভর করছে। তোমরা প্রত্যেকে এমন সব দেশে যাও যেখানে এ-জিনিসগুলো নেই। তা হলেই তোমরা পাবে অনেক ধনদৌলত।"

বাবার মৃত্যুর পর বড়ো ছেলে বেরুল তার মোরগ নিয়ে। কিন্তু যেখানেই যায় সেখানেই দেখে মোরগ আছে। শহরে সে দেখে মোরগ আছে গির্জের চুড়োয়, বাতাস যেদিকে বয় সেদিকে সেগুলো ঘোরে। গ্রামে সর্বদাই সে শোনে মোরগের ডাক। তার মোরগটাকে দেখে কেউই তারিফ করে না। তাই মনে হল না সে খুব ধনদৌলত পেতে চলেছে।

শেষটায় এমন একটা দ্বীপে সে পৌঁছল যেখানে কেউই কখনো মোরগ দেখে নি। কখন যে কোন প্রহর, সে কথা সেখানকার কেউই ঠাওরাতে পারত না। সময়টা সকাল না সন্ধে সে কথা অনায়াসে তারা বলে দিতে পারত বটে। কিন্তু রাতে যারা জেগে থাকত তারা বলতে পারত না কখন কোন প্রহর। বড়ো ছেলে তাদের বলল, "এই আশ্চর্য প্রাণীটাকে দেখ। এটার মাথায় পদ্মরাগমণির মুকুট, পায়ে নাল লাগানো। রাতে

তিনবার নির্দিষ্ট সময়ে এটা গান গায়। শেষবার গান গায় সূর্য ওঠার আগে। দিনের বেলায় গান গাইলে বুঝবে আবহাওয়া বদলাতে যাচ্ছে।"

তার বক্তৃতা শুনে দ্বীপবাসীরা খুবই অবাক হল। পরের রাতে কেউই ঘুমল না। রাত দুটো ভোর চারটে আর ভোর ছটায় মোরগের ডাক সবাই তারা শুনল। তার পর তাকে তারা জিগেস করল সেই আশ্চর্য পাখিটাকে সে বিক্রি করবে কি না। করলে কত দাম সে চায়।

সে বলল, "একটা গাধা যত সোনা বইতে পারে তত সোনা আমার চাই।"

এরকম আশ্চর্য পাখির পক্ষে দামটা যে নেহাতই তুচ্ছ সে বিষয়ে সবাই একমত হয় চট্‌পট্ তারা দাম চুকিয়ে দিল।

বড়ো ভাইকে ধনী হয়ে ফিরতে দেখে ছোটো দু ভাই খুব অবাক হল। মেজোভাই স্থির করল সেও বেরিয়ে পড়ে দেখবে তার কাস্তের বদলে ধনদৌলত পায় কি না। কিন্তু যেখানেই যায় দেখে ওর মতো কাস্তে সব চাষীরই আছে। শেষটায় বরাতগুণে এমন একটা দ্বীপে সে পৌঁছল যেখানকার লোকরা জানত না কাস্তে কী জিনিস। ফসল পাকলে ক্ষেতের উপর তারা কামান দাগত। ফলে সংগ্রহের কাজ মোটেই ভালোভাবে হত না। কারণ প্রায়ই কামানের গোলা চলে যেত ক্ষেতের অনেক উপর দিয়ে। খড়ের বদলে অনেক গোলা পড়ত ফসল-দানার উপর। ফলে অনেক ফসল নষ্ট হত। তা ছাড়া ফসল সংগ্রহের সময়কার গোলার শব্দে লোকেদের কান ঝালাপালা হয়ে যেত। মেজো ছেলে তাদের সামনে দক্ষ নিপুণ হাতে ফসল কাটতে শুরু করলে সবাইকার চোখ গোল-গোল আর মুখ হাঁ হয়ে গেল। কাস্তের দাম সে চেয়েছিল—একটা ঘোড়া যত সোনা বইতে পারে তত সোনা। তাইই সে পেল।

ছোটো ভাই তখন চাইল তার বেড়াল দিয়ে বরাত ফেরাতে। অন্য দু ভাইয়ের মতো যতদিন সে দেশের মূল অংশে রইল ততদিন কোনো সুবিধেই সে করতে পারল না। সর্বত্রই অসংখ্য বেড়াল। তাই অনেক সময় জন্মাবার পরেই তাদের জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়। শেষটায় এমন একটা দ্বীপে সে পৌঁছল যেখানে তার বরাতগুণে কোনো বেড়াল কেউ কখনো দেখে নি। বেড়ালের অভাব সেখানে পুষিয়ে দিয়েছিল অসংখ্য ইঁদুর। বাড়ির কর্তাদের সামনেই ইঁদুরগুলো নেচে বেড়াত বেঞ্চি

আর টেবিলের উপর। তাদের জ্বালায় সবাই উঠেছিল অতিষ্ঠ হয়ে। প্রাসাদের মধ্যে ইঁদুরের হাত থেকে রাজাও রেহাই পেতেন না। প্রাসাদের প্রতি কোণে ইঁদুরের কিঁচ্‌কিঁচ্‌। তাদের জ্বালায় খাবার রাখার জো নেই। বেড়াল গিয়ে চক্ষের নিমেষে এমন চতুরভাবে দুটো হলঘর সাফ করে ফেলল যে, জনগণ রাজার কাছে আবেদন জানাল—রাষ্ট্রের স্বার্থে এই মূল্যবান প্রাণীকে যেন সংগ্রহ করা হয়। ছোটো ভাই দাম হেঁকেছিল—এক অশ্বতর যত সোনা বইতে পারে তত সোনা। কোনোরকম দর কষাকষি না করে রাজা দামটা চুকিয়ে দেন। ফলে ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে ধনী হয়ে সে বাড়ি ফেরে।

স্বর্গে দর্জি

এক সুন্দর দিনে ভগবান গেছেন তাঁর স্বর্গের বাগানে বেড়াতে। সেন্ট পিটার ছাড়া আর সব শিষ্য আর সাধুদের তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান সেন্ট পিটারকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে কাউকে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। সিংহদ্বারে তাই সেন্ট পিটার দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন।

কয়েক মিনিট বাদে ফটকে একজন টোকা দিল। পিটার প্রশ্ন করলেন—কে সে আর কী তার দরকার।

চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর এল, "আমি এক গরিব সৎ দর্জি। দয়া করে আমায় ঢুকতে দিন।"

পিটার বলল, "সৎ বৈকি! চোরের মতোই তুমি সৎ। মাপে তুমি ঠকিয়েছ, অন্য লোকের কাপড়ের টুকরো পকেটে ভরেছ। এখানে তুমি আসতে পাবে না। ভগবান আদেশ দিয়েছেন, তাঁর অবর্তমানে কাউকে যেন ঢুকতে না দিই।"

কাকুতি-মিনতি করে দর্জি বলে চলল, "দয়া করুন। কাপড় কাটার সময় যে-সব টুকরো-টাকরা আপনা থেকে মাটিতে পড়ে যেত সেগুলো নেওয়াকে চুরি করা বলে না। দেখুন আমি কী রকম খোঁড়াচ্ছি। এতটা পথ হাঁটায় দু পায়ে আমার ফোস্কা পড়েছে। আমার পক্ষে এখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে আসতে দিন। সবরকম নোংরা কাজ করব। বাচ্চাদের দেখাশোনা করব, তাদের মুখ ধোয়াব, তাদের বিছানার চাদর কাচব, তাদের পোশাক সেলাই করে দেব।"

তার কথা শুনে ধার্মিক সেন্ট পিটারের দয়া হল। দরজা তিনি সামান্য ফাঁক করলেন। খোঁড়া দর্জি তার শুকনো রোগা শরীর নিয়ে অনায়াসে ভিতরে চলে এল। তাকে তিনি বললেন দরজার এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতে, যাতে ভগবান ফেরার সময় সে তাঁর চোখে না পড়ে।

দর্জি তাঁর কথামতো এক কোণে গিয়ে বসল। কিন্তু পিটার চোখের আড়াল হতেই অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠে পড়ে সে শুরু করল স্বর্গের অলিগলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। অবশেষে সে পৌঁছল উঁচু একটা বেদীর কাছে। সেখানে একটা খাঁটি সোনার প্রকাণ্ড আরাম-কেদারার চার দিকে অনেক দামী-দামী চেয়ার সাজানো। আরাম-কেদারায় নানা জহরত ঝল্‌মল্‌ করছে। অন্য চেয়ারগুলোর চেয়ে অনেক উঁচুতে সেটা বসানো। সামনে পা রাখবার সোনার চৌকি। বাড়িতে থাকার সময় ভগবান সেই আরাম-কেদারায় বসেন আর সেখান থেকে দেখেন নীচের পৃথিবীর সব-কিছু। সেখানে উঠে সেই চেয়ারে বসার লোভ দর্জি সামলাতে পারল না। সেখানে বসার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল পৃথিবীর সব ঘটনা। দেখল একটা কুচ্ছিত বুড়িকে ঝরনায় কাপড়-চোপড় কাচতে-কাচতে লেসের দুটো ওড়না লুকিয়ে ফেলতে। বুড়িকে এটা করতে দেখে ভীষণ রেগে পা রাখবার সোনার চৌকিটা বুড়ির মাথা লক্ষ্য করে সে ছুঁড়ল পৃথিবীর দিকে। তার পর চৌকিটা তুলে আনার কোনো উপায় না দেখে আরাম-কেদারা থেকে নেমে চুপি চুপি আবার গিয়ে সে বসল দরজার পিছনে আগেকার জায়গায়। ভাবখানা—যেন কিছু হয় নি।

স্বর্গের শিষ্য আর সাধুদের নিয়ে ফেরার পর দরজার পিছনে দর্জিকে ভগবান দেখতে পেলেন না—এ কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর আরাম-কেদারায় বসে টের পেলেন তাঁর পা রাখার চৌকিটা নেই। ধার্মিক সেন্ট পিটারকে তিনি প্রশ্ন করলেন—সেটার কী হল। সেটা উধাও হবার সন্তোষজনক কোনো উত্তর তিনি দিতে পারলেন না। তখন ভগবান প্রশ্ন করলেন কাউকে পিটার ঢুকতে দিয়েছিলেন কি না।

পিটার বললেন, "এক খোঁড়া দর্জি ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দিই নি, সে তো বসেছিল দরজার পেছনে।"

ভগবান দর্জিকে ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করলেন—চৌকিটা সে নিয়েছে কি না আর নিয়ে থাকলে সেটার কী সে করেছে।

খুব খুশি হয়ে দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "প্রভু! দারুণ রেগে পৃথিবীর এক বুড়ির মাথা লক্ষ্য করে সেটা আমি ছুঁড়েছিলাম। কাচবার সময় সে তখন দুটো ওড়না চুরি করেছিল।"

ভগবান বললেন, "ওরে হতভাগা! তোর মতো আমি কাজ করলে অনেক আগে তোর কী দশা হত একবার ভেবে দেখেছিস? প্রতিবার কাউকে পাপ করতে দেখলে আমি যদি জিনিসপত্র ছুঁড়তাম তা হলে স্বর্গে কোনো চেয়ার, টুল, বেঞ্চি বা কোদাল আর থাকত না। এর পর এখানে তোর আর থাকা হবে না। কারণ এখানে আমি ছাড়া আর কারুর শাস্তি দেবার অধিকার নেই। সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এক্ষুনি দূর হ!"

অতএব স্বর্গের বাইরে দর্জিকে বার করে দিতে পিটার বাধ্য হলেন। তার বুটে ফুটো আর পায়ে ফোস্কা বলে 'খানিক-বিশ্রাম-কর' নামে একটা জায়গা পর্যন্ত হেঁটে যাবার জন্য তাকে দেওয়া হল একটা লাঠি। সে-জায়গায় সৈনিকরা বসে স্তবগান গেয়ে থাকে।

জুয়াড়ি হান্‌স্‌

এক সময় একটা লোক খুব জুয়া খেলত। তাই পাড়া-পড়শি তার নাম দিয়েছিল জুয়াড়ি হান্‌স্‌। জুয়া খেলে সে তার বাড়ি আর সম্পত্তি খুইয়েছিল। তবু জুয়া খেলার নেশা তার ঘোচে নি। যাদের কাছে তার দেনা তাদের যেদিন তার বাড়ি আর আসবাবপত্র দখল করতে আসার কথা তার আগের দিন যীশুখৃস্ট আর সেন্ট পিটার তার কাছে গিয়ে রাতের জন্য আশ্রয় চাইলেন।

জুয়াড়ি হান্‌স্‌ বলল, "আসুন, আসুন। কিন্তু আমার কাছে বিছানা-পত্তর বা খাবার-দাবার—কিছুই নেই।"

যীশুখৃস্ট বললেন, তাঁদের থাকতে দিলে নিজেরাই তাঁরা নিজেদের খাওয়া-দাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা করে নেবেন। তাই জুয়াড়ি হান্‌স্‌ তাদের আশ্রয় দিতে রাজি হল।

সেন্ট পিটার তাকে তখন তিনটে পয়সা দিয়ে বললেন, রুটিওয়ালার কাছ থেকে রুটি কিনে আনতে।

রুটি কিনতে সে বেরুল। কিন্তু যে-বাড়িতে তার জুয়াড়ি-বন্ধুরা তার যথাসর্বস্ব জিতে নিয়েছিল সে-বাড়ির কাছে পৌঁছতে তারা হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল, "এসো হান্‌স্‌, এসো। এসো দোস্ত, এসো।"

সে বলল, "মনে হচ্ছে এই তিনটে পয়সা জেতার মতলবে তোমরা আছ।"

কিন্তু লোকগুলো তাকে ছাড়ল না। শেষটায় সেই বাড়ির মধ্যে সে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে খোয়াল সেই তিনটে পয়সা। যীশুখৃস্ট আর

সেণ্ট পিটার তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সে না ফেরায় তার খোঁজে তাঁরা বেরুলেন।

তাঁদের আসতে দেখে হান্‌স্‌ এমন ভাব দেখাল যেন তার হাত ফস্‌কে পয়সাগুলো পুকুরে পড়ে গেছে আর সেগুলো সে খুঁজছে। যীশু-খৃস্ট কিন্তু জানতেন জুয়া খেলে পয়সাগুলো সে হেরেছে। তাই আবার তাকে তিনি দিলেন তিনটে পয়সা। এবার সে তার বন্ধুদের ডাকাডাকিতে কান না দিয়ে রুটি কিনে আনল।

যীশুখৃস্ট জানতে চাইলেন তার কাছে আঙুর-রস আছে কি না। সে জানাল তার সব পিপেই খালি। তাই শুনে যীশুখৃস্ট বললেন, মাটির তলার ঘরটায় গেলে সে দেখবে পিপেগুলো আঙুর-রসে ভরা আছে।

তাঁর কথা হান্‌স্‌-এর বিশ্বাস হল না। শেষটায় সে বলল, "আমি যাচ্ছি বটে। কিন্তু নিশ্চিত জানি সেখানে আঙুর-রস নেই।" সেখানে গিয়ে সে পিপের কল কিন্তু খুলতেই খুব ভালো আঙুর-রস পড়তে লাগল। সেই আঙুর-রস সে নিয়ে গেল তার অতিথিদের কাছে।

পরদিন খুব সকালে হান্‌স্‌কে যীশুখৃস্ট বললেন, "আমার কাছে তুমি তিনটে বর চাইতে পার।" তিনি ভেবেছিলেন সে চাইবে স্বর্গরাজ্য। কিন্তু জুয়াড়ি হান্‌স্‌ চাইল, এমন তাস যেগুলো সব সময় সৌভাগ্য আনবে ; এমন পাশার ঘুঁটি যেগুলো সব সময় জিতবে ; আর এমন একটা গাছ যাতে সব সময় ফল ধরবে আর যেটায় কেউ চড়লে হান্‌স্‌ না বলা পর্যন্ত সে নামতে পারবে না।

সেই তিনটে বর তাকে দিয়ে যীশুখৃস্ট আর সেণ্ট পিটার চলে গেলেন। আর তার পর থেকে হান্‌স্‌-এর বরাত গেল খুলে। জুয়া খেলতে খেলতে সে জিতে নিল পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা।

সেণ্ট পিটার তখন যীশুখৃস্টকে বললেন, "প্রভু, এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না। গোটা পৃথিবীটাই সে জিতে নেবে। মৃত্যুকে তার কাছে পাঠাবার এখন সময় হয়েছে।"

তাই মৃত্যুকে পাঠানো হল তার কাছে। মৃত্যু যখন পৌঁছল হান্‌স্‌ তখন তাসের টেবিলের সামনে বসে জুয়া খেলছে। মৃত্যু তাকে বলল, "এক মিনিটের জন্য বাইরে এসো।"

কিন্তু জুয়াড়ি হান্‌স্‌ বলল, "একটু সবুর কর, এ-হাতটা খেলে নি। ততক্ষণ তুমি বরং এই গাছটায় চড়ে কিছু ফল পাড় গে। বাড়ি যাবার

পথে সেগুলো আমরা খাব।"

তার কথা শুনে মৃত্যু গিয়ে উঠল সেই গাছটায়। কিন্তু নামতে গিয়ে দেখে সে আর নড়তে চড়তে পারছে না। জুয়াড়ি হান্‌স্ তাকে সেখানে রাখল পুরো সাত বছর আর সেই সাত বছরে কারুরই মৃত্যু হল না।

সেন্ট পিটার তখন যীশুখৃস্টকে বললেন, "প্রভু, এভাবে আর চলে না। কেউই এখন আর মরছে না। আবার লোকটার কাছে আমাদের যাওয়া দরকার।" তাই তাঁরা গেলেন।

জুয়াড়ি হান্‌স্‌কে যীশুখৃস্ট বললেন, মৃত্যুকে মুক্তি দিতে। তাঁর কথা শুনে মৃত্যুকে জুয়াড়ি হান্‌স্ বলল, "নেমে এসো। নেমে এসে সঙ্গে সঙ্গে তাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলল আর তার পর তারা অদৃশ্য হল এক অন্য জগতে।

জুয়াড়ি হান্‌স্ স্বর্গের দরজায় গিয়ে টোকা দিল।

দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করল, "কে?"

"আমি জুয়াড়ি হান্‌স্।"

উত্তর এল, "ঐ হতভাগাকে আমরা চাই না। দূর হও।"

তাই জুয়াড়ি হান্‌স্ গেল পার্‌গেটোরিতে। সেখানকার দরজায় সে টোকা দিতে প্রশ্ন হল, "কে?"

"আমি জুয়াড়ি হান্‌স্।"

"আমাদের এখানে এমনিতেই অনেক দুঃখ কষ্ট। তার ওপর জুয়ার আর দরকার নেই। দয়া করে বিদেয় হও।"

তার পর নরকের দরজায় গিয়ে হান্‌স্ টোকা দিতে দরজা খুলে গেল। সেখানে পাপীদের অধিপতি লুসিফার আর একটা কুঁজো শয়তান ছাড়া আর কেউ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে হান্‌স্ সেখানে জুয়া খেলতে বসে গেল। এই কুঁজো শয়তান ছাড়া লুসিফারের আর কিছুই ছিল না। তাসের গুণে জুয়াড়ি হান্‌স্ লুসিফারের কাছ থেকে সেই কুঁজো শয়তানকে জিতে নিল।

সেই কুঁজো শয়তানকে নিয়ে বেরিয়ে জুয়াড়ি হান্‌স্ প্রকাণ্ড একটা লাঠি জোগাড় করে আবার স্বর্গের দরজায় গিয়ে ভিতরে যাবার জন্য শুরু করে দিল দারুণ হল্লা। সেই শব্দে কেঁপে উঠল স্বর্গরাজ্য।

সেন্ট পিটার বললেন, "এরকমটা চলতে দেওয়া যায় না। ওকে

ভেতরে আসতে দিতেই হবে। নইলে স্বর্গরাজ্য ও তছ্‌নছ্‌ করে ফেলবে।"

তাই জুয়াড়ি হান্‌স্‌কে স্বর্গে আসতে দেওয়া হল আর সেখানে গিয়েই জুয়া খেলতে বসে সে এমন হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলল যে কেউ কারুর কথা শুনতে পেল না।

যীশুখৃস্টকে সেন্ট পিটার বললেন, "প্রভু, এভাবে আর চলে না। লোকটাকে দূর করতেই হবে, নইলে স্বর্গরাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেবে।"

তাই তাঁরা তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন। ফলে তার আত্মা ভেঙে হয়ে গেল ছোটো-ছোটো টুকরো আর সেই-সব টুকরোগুলো সব জুয়াড়িদের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল আজও যারা বেঁচে আছে।

থ্রাশ্-চঞ্চু রাজা

এক রাজার অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। কিন্তু স্বভাবটা অত্যন্ত উদ্ধত। তাকে যারা বিয়ে করতে আসত তাদের কাউকে তার পছন্দ হত না। তাদের নিয়ে নানা ঠাট্টা-তামাশা সে করত। রাজা একবার বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করে দেশ-বিদেশের বিয়ের উপযুক্ত সব ছেলেদের নেমন্তন্ন করলেন। পদমর্যাদা অনুসারে পাশা-পাশি তারা দাঁড়াল। প্রথমে রাজা, তার পর রাজপুত্তুর, ডিউক, কাউণ্ট, ব্যারন আর সবশেষে পেজ।[১] তাদের পাশ দিয়ে রাজকন্যে হেঁটে গেল। কিন্তু কাউকেই তার পছন্দ হল না। প্রথমজনকে বলল, পিপের মতো মোটা, দ্বিতীয়কে—তালগাছের মতো ঢ্যাঙা; তৃতীয়কে—বেঁটে-বাঁটকুল; চতুর্থকে—মড়ার খুলির মতো ফ্যাকাশে; পঞ্চমকে—মোরগ-ঝুঁটির মতো লাল; ষষ্ঠকে—পোড়া কাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সব চেয়ে বেশি যাকে দেখে সে হাসাহাসি করল তিনি একজন রাজা। থুত্নিটা তার বাঁকানো। বলল, "কী কাণ্ড! রাজার থুতনি যে থ্রাশ্[২] পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো!" সেই থেকে সেই রাজার নাম হয়ে গেল 'থ্রাশ্-চঞ্চু'। বুড়ো রাজা যখন দেখলেন তাঁর মেয়ের কাউকেই পছন্দ হল না, উপরন্তু সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছে, তখন ভীষণ রেগে তিনি বললেন—

১ ডিউক—ছোটো রাজ্যের রাজা। কাউণ্ট—ইউরোপের অভিজাত লোকের বড়ো খেতাব। ব্যারন—ব্রিটেনের জমিদারের সব চেয়ে ছোটো খেতাব। পেজ—'নাইট' বা বীর-ধর্মীয় পদের জন্য শিক্ষানবীশ যুবক।

২ থ্রাস্‌ল্—থ্রাশ্-পাখি (এক ধরনের গায়ক পাখি)।

প্রথম যে ভিখিরি তাঁর দোরগোড়ায় আসবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন।

দিন কয়েক পরে এক ভবঘুরে গায়ক জানলার তলায় দাঁড়িয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে চাইতে লাগল। গান শুনে রাজা আদেশ দিলেন, লোকটিকে নিয়ে আসতে। গায়কের পরনে নোংরা কুটিকুটি পোশাক। সে এসে রাজা আর রাজকন্যের সামনে গান গেয়ে ভিক্ষা চাইল।

রাজা বললেন, "তোমার গান শুনে ভারি খুশি হয়েছি। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

রাজার কথা শুনে রাজকন্যে আঁত্‌কে উঠল। কিন্তু রাজা বলে চললেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রথম যে-ভিখিরি আসবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব। সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করবই।"

রাজার কথার নড়্‌চড়্‌ হল না। পুরোহিত ডেকে সেই ভবঘুরে গায়কের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর রাজা বললেন, "তুমি এখন ভিখিরির বউ। রাজপ্রাসাদে তোমার থাকা আর মানায় না! এক্ষুনি বরকে নিয়ে তোমায় চলে যেতে হবে।"

রাজকন্যের হাত ধরে ভিখিরি তাকে নিয়ে চলল হাঁটিয়ে। যেতে-যেতে তারা পৌঁছল বিরাট এক বনে। রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "এই বনটা কার?"

"থ্রাশ্‌-চঞ্চু রাজার এটা
জান তো,
বিয়ে করলে তোমারই হত।"

"ভারি অভাগী মেয়ে আমি।
থ্রাশ্‌-চঞ্চু রাজাকে
কেন করি নি স্বামী?"

তার পর তারা পৌঁছল ঘাসে-ঢাকা বিরাট এক মাঠে। রাজকন্যে আবার প্রশ্ন করল, "এই মাঠটা কার?"

"থ্রাশ্‌-চঞ্চু রাজার এটা
জান তো,
বিয়ে করলে তোমারই হত।"

"ভারি অভাগী মেয়ে আমি,
থ্রাশ্-চঞ্চু রাজাকে
কেন করি নি স্বামী ?"

তার পর তারা পৌঁছল মস্ত বড়ো এক শহরে। রাজকন্যে আবার প্রশ্ন করল, "এই সুন্দর শহরটা কার ?"

থ্রাশ্-চঞ্চু রাজার এটা
জান তো,
বিয়ে করলে তোমারই হত।"

"ভারি অভাগী মেয়ে আমি,
থ্রাশ্-চঞ্চু রাজাকে,
কেন করি নি স্বামী ?"

গায়ক বলল, "অন্য একজনকে বিয়ে কর নি বলে বার বার আক্ষেপ করতে শুনে কান আমার ঝালাপালা। ভারি অসন্তুষ্ট হয়েছি। কেন— আমি কি কেউ নই ?"

শেষটায় তারা পৌঁছল খুব ছোট্টো একটা বাড়িতে। রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল, "এমন ছোট্টো বাড়ি জীবনে দেখি নি। এই কুঁড়েঘরটা কার ?"

গায়ক বলল, "এই বাড়িটা তোমার আর আমার। এখানে আমরা একসঙ্গে থাকব।"

ছোট্টো নিচু দরজা দিয়ে ভিতরে যাবার সময় যাতে মাথা না ঠোকে তার জন্য রাজকন্যেকে মাথা নোয়াতে হল।

রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "দাস-দাসী কোথায় ?"

ভিখিরি বলল, "দাসদাসী ?—সব কাজ তোমাকে করতে হবে। চট্‌পট্ হাত চালাও।—উনুন ধরাও, জল ফুটতে চড়াও, তার পর রাতের খাবার রাঁধ। আমি বেজায় ক্লান্ত।"

কিন্তু উনুন ধরাতে বা রান্না করতে রাজকন্যে জানত না। তাই ভিখিরি তাকে সাহায্য করতে বাধ্য হল। তা না হলে রান্নাবান্না কিছুই হত না। সামান্য কিছু খেয়েদেয়ে তারা শুয়ে পড়ল। কিন্তু পরদিন ভোরেই ভিখিরি তাকে দিয়ে করাতে লাগল সংসারের সব কাজ।

এইভাবে দিন কয়েক কাটার পর তাদের খাবারদাবার ফুরিয়ে গেল। ভিখিরি তখন বলল, "শোনো বউ, এভাবে চলবে না। আমরা

খাচ্ছি প্রচুর। কিন্তু কিছু রোজগার করছি না। তোমাকে বুনে-বুনে ঝুড়ি বানাতে হবে।"

বেরিয়ে সে উইলোগাছের ডাল কেটে আনল। সেগুলো বুনে-বুনে রাজকন্যে শুরু করল ঝুড়ি বানাতে। কিন্তু খর্‌খরে উইলো-ডালে কেটে ছড়ে গেল তার নরম হাত।

ভিখিরি বলল, "দেখছি এ-কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না। এর বদলে তুমি চরকা কাট। হয়তো ঝুড়ি-বোনার চেয়ে ভালো করে চরকা কাটতে পারবে।"

বসে-বসে রাজকন্যে চরকা কাটতে চেষ্টা করল। কিন্তু শক্ত সুতোয় তার নরম আঙুল কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

ভিখিরি বলল, "দেখছ তো, কোনো কাজেরই উপযুক্ত তুমি নও। তোমাকে বিয়ে করে আমি ভীষণ ঠকেছি। দেখছি এবার আমাকে মাটির হাঁড়িকুঁড়ির ব্যবসা শুরু করতে হবে। হাটে বসে সেগুলো বিক্রি করবে তুমি।"

রাজকন্যে ভাবল, 'হা ভগবান! আমার বাবার রাজ্যের কেউ হাটে এসে মাটির হাঁড়িকুঁড়ি বিক্রি করতে দেখলে আমাকে নিয়ে কী ঠাট্টা-তামাশাই না করবে।"

কিন্তু সেটা না করলে উপোস করে মরতে হয়। তাই হাটে তাকে বেরুতেই হল। প্রথম দিন সে ভালোই বিক্রি করল। কারণ তার সুন্দর চেহারা দেখে লোক তার কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনল। যে-দাম সে চাইল খুশি হয়েই সেটা দিল তারা। এমন-কি, অনেকে হাঁড়িকুঁড়ি কিনে দাম দিয়ে সেগুলো তাকেই দিল উপহার। রাজকন্যের রোজগারে কিছুদিন সংসার চলল। তার পর সেই ভিখিরি কিনল আর-এক দফা হাঁড়িকুঁড়ি, বাসনপত্র। হাটের এক কোণে জিনিসপত্র সাজিয়ে রাজকন্যে বসল বিক্রি করতে। এমন সময় হঠাৎ এক মাতাল ঘোড়সওয়ার সৈনিক তার স্টলে ঘোড়াসুদ্ধ হুড়্‌মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল। ফলে গুঁড়ো হয়ে গেল মাটির সব জিনিসপত্র। তাই দেখে রাজকন্যে কাঁদতে শুরু করে দিল। ভেবে পেল না সে কী করবে। কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল, "হা ভগবান! আমার কী হবে? বর আমায় কী বলবে?" তার পর দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ভিখিরিকে জানাল সব কথা।

তার বর বলল, "মাটির হাঁড়িকুঁড়ি-ফেরিওয়ালির চোখে জল মানায়

না। কোনো কাজেরই যোগ্য তুমি নও। তাই আমি আমাদের রাজার প্রাসাদে গিয়ে জিগেস করেছি সেখানে তোমাকে রান্নাঘরের দাসীর চাকরিতে তারা নিতে পারে কি না। তারা বলেছে তোমাকে কাজ দিয়ে দেখবে আর খোরাকি দেবে।"

এইভাবে রাজকন্যে হল রান্নাঘরের দাসী। রাঁধুনির ফাইফরমাস তাকে শুনতে হয় আর করতে হয় নোংরা-নোংরা কাজ। তার পোশাকের ভিতরের পকেটে সে রেখেছিল ছিপি আঁটা একটা বোতল। কুড়িয়ে-কুড়িয়ে খাবারের যে-সব টুকরো-টাকরা পেত সেই বোতলে ভরে সে নিয়ে যেত বাড়ি। এই খাবার খেয়েই দিন তার কাটতে থাকে।

এমন সময় হল কি, রাজার বড়োছেলে সাবালক হবার দরুন রাজ-প্রাসাদে একদিন আয়োজন করল মস্ত এক বল্-নাচের আসরের। উৎসবের রাতে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখার জন্য রাজকন্যে গেল উপর তলায়। সে দেখল বাতিগুলো একে-একে জ্বলে উঠতে আর নাম-ধাম ঘোষণার পর চমৎকার-চমৎকার পোশাকে সুন্দর-সুন্দর চেহারার ছেলে-মেয়েদের আসতে। সেই জমকালো নাচের আসর দেখে চোখে তার জল এসে গেল। নিজের দুর্বিসহ জীবনের কথা ভেবে শোকে-দুঃখে ভরে উঠল তার হৃদয়। যে-উদ্ধত অভদ্র আচরণের জন্য তার এই দুর্দশা সে কথা মনে পড়ায় ভীষণ অনুশোচনা হতে লাগল তার। দামী-দামী খাবার-ভরা পাত্র নিয়ে পরিবেশকরা যাতায়াত করছিল। খাবারের সুগন্ধে তার জিভে জল এল। মাঝে মাঝে তারা কয়েক টুকরো খাবার তাকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিচ্ছিল। বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য সেগুলো সে বোতলটায় ভরল। তার পর রাজার বড়ো ছেলে এল সেই বিরাট হলঘরে। পরনে তার নানা জহরত-বসানো সিল্কের পোশাক, গলায় সোনার হার। তাকে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দেখে রাজপুত্তুর মেয়েটির হাত ধরে বলল তার সঙ্গে নাচতে হবে। কিন্তু থর্‌থর্ করে কাঁপতে-কাঁপতে নাচতে সে অস্বীকার করল। কারণ সে চিনতে পেরেছিল থ্রাশ্-চঞ্চু রাজাকে, যে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল আর যাকে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল বিদ্রূপ করে। কিন্তু প্রাণপণে বাধা সত্ত্বেও রাজপুত্তুর জোর করে তাকে টেনে আনল হলঘরে। আর যেই-না আনা, সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে গেল তার পোশাকের ভিতরকার পকেটে-বাঁধা-সুতো। তার বোতলটা গড়িয়ে পড়ল আর মেঝের উপর ছড়িয়ে গেল স্যুপ্ আর টুকরো-টাকরা খাবারগুলো।

সবাই হো-হো করে হেসে তাকে দিয়ে উঠল টিটকিরি। আর লজ্জায় তার ইচ্ছে করল পৃথিবীর হাজার-হাজার মাইল গভীরে সেঁধিয়ে যেতে। পালাবার জন্য সে দৌড়ল দরজার দিকে। কিন্তু সিঁড়িতে একজন লোক তাকে বাধা দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনল আর তার দিকে তাকিয়ে সে দেখল—সে লোকটার মুখও থ্রাশ্-চঞ্চু রাজার। সদয় মিষ্টি স্বরে মেয়েটিকে সে বলল, "ভয় পেয়ো না। যে-বিশ্রী কুঁড়ে ঘরে ভবঘুরে বেহালা-বাজিয়ের সঙ্গে তুমি থাক, সে আর আমি একই লোক। তোমাকে ভালোবাসি বলেই ছদ্মবেশ ধরেছিলাম। আমিই সেই মাতাল ঘোড়সওয়ার সৈনিক যে ঘোড়া নিয়ে তোমার স্টলে ঢুকে মাটির বাসন-কোসন গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তোমার ঔদ্ধত্যকে দূর করার জন্যে তোমার অহংকারের শাস্তি হিসেবে এই-সব ঘটনা ঘটেছে।"

তার কথা শুনে হাপুস্ নয়নে কাঁদতে-কাঁদতে রাজকন্যে বলল, "আমি ভীষণ অন্যায় করেছি। তোমার বউ হবার উপযুক্ত আমি নই।"

রাজকন্যেকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল, "যা হবার তা হয়ে গেছে। এইবার আসল উৎসবে মধ্যে আমাদের বিয়ের ভোজ শুরু হবে।"

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাসীরা এসে রাজকন্যেকে পরাল সব চেয়ে ভালো পোশাক। তার পর সভাসদ্‌বর্গ নিয়ে তার বাবা এসে থ্রাশ্-চঞ্চু রাজার সঙ্গে তার বিয়ের দরুন করলেন আশীর্বাদ। তার পর শুরু হল আসল উৎসব। মনে হচ্ছে নাকি সেই উৎসবে আমরাও থাকতে পারলে খুব মজা হত?

ছটি রাজহাঁস

একবার এক রাজা বিরাট এক বনে শিকার করছিলেন। একটা বুনো হরিণকে তিনি এমন তাড়া করে যান যে, দলের লোকজন পিছিয়ে পড়ে। সন্ধের মুখে থেমে চার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন, পথ একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন। কোনো দিকেই বেরুবার পথ তিনি খুঁজে পেলেন না। তার পর তাঁর নজরে পড়ল খুন্‌খুনে এক বুড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সে ছিল ডাইনি। রাজা তাকে বললেন, "আমাকে তুমি বন থেকে বেরুবার পথটা দেখিয়ে দিতে পার?"

বুড়ি বলল, "খুব পারি, মহারাজ। কিন্তু একটা শর্ত আছে। শর্তটা পূরণ করতে না পারলে চিরকাল এই বনে আপনাকে থাকতে হবে আর শেষটায় না খেয়ে হবে মরতে।"

রাজা প্রশ্ন করলেন, "কী শর্ত?"

বুড়ি বলল, "আমার এক মেয়ে আছে। তার মতো সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে আর নেই। আপনার রানী হবার সে যোগ্য। তাকে বিয়ে করলে বনের বাইরে যাবার পথ আপনাকে দেখিয়ে দেব।"

রাজা ভারি ঘাবড়ে পড়েছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। রাজাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল বুড়ি। সেখানে আগুনের পাশে তার মেয়ে বসেছিল। রাজাকে এমনভাবে সে অভ্যর্থনা করল যেন তাঁর পথ চেয়েই বসেছিল। মেয়েটি যে সুন্দরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে রাজার কেমন যেন ভালো লাগল না। তাকে দেখে মনে-মনে তিনি শিউরে উঠলেন। মেয়েটিকে তিনি নিজের ঘোড়ায় তুলে

নেবার পর বুড়ি তাঁকে বন থেকে বেরুবার পথ দেখিয়ে দিল। নিরাপদে তিনি তাঁর রাজপ্রসাদে পৌঁছলেন। তার পর তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

রাজার আগের এক বউ ছিল। আর ছিল তাঁর ছয় ছেলে আর এক মেয়ে। তাদের তিনি ভারি ভালোবাসতেন। তাঁর ভয় হয়েছিল সৎমা তাদের ক্ষতি করতে পারে। তাই বনের মধ্যে এক নির্জন দুর্গে তাদের তিনি লুকিয়ে রাখলেন। দুর্গটা ছিল এমন এক দুর্গম জায়গায় যে, সেটাকে খুঁজে বার করা কঠিন। সেই দুর্গে যাবার পথ রাজার পক্ষেও খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এক বিচক্ষণ বুড়ি তাঁকে আশ্চর্য এক বাণ্ডিল সুতো দিয়েছিল। সেটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলে আপনা থেকেই খুলতে-খুলতে রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত।

প্রিয় ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য প্রায়ই রাজা যেতেন। রাজাকে ঘন-ঘন বেরুতে দেখে দ্বিতীয় রানী কৌতূহলী হয়ে উঠে ভাবল—কোথায় তিনি যান আর বনের মধ্যে একা-একা কিই-বা তিনি করেন? চাকর-বাকরদের সে অনেক টাকাকড়ি ঘুষ দিল। তারা দ্বিতীয় রানীকে জানাল সুতোর সেই বাণ্ডিলটার কথা, একমাত্র যেটাই শুধু পথ দেখাতে পারে। সুতোর বাণ্ডিলটা সে খুঁজে বার করল। তার পর সে বানাল সিল্কের কতকগুলো ছোট্টো-ছোট্টো শার্ট। মায়ের কাছে সে জাদুবিদ্যা শিখেছিল। তাই শার্টগুলোয় প্রতিটি ফোঁড় দেবার সময় সে দিল জাদুমন্ত্র ভরে। রাজা সেবার যখন শিকারে বেরিয়েছেন, শার্টগুলো নিয়ে দ্বিতীয় রানী গেল সেই বনে। আর সুতোর বাণ্ডিলটা পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেল সেই দুর্গের কাছে। দূরে একজনের পায়ের শব্দ শুনে ছেলেরা ভাবল, রাজা আসছেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। খুব খুশি হয়ে তারা ছুটে বেরুল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দ্বিতীয় রানী তখন তাদের প্রত্যেকের গায়ে ছুঁড়ে দিল একটা করে শার্ট। আর সঙ্গে-সঙ্গে রাজহাঁস হয়ে বন থেকে তারা উড়ে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় রানী মনের আনন্দে বাড়ি ফিরল। ভাবল সৎ-ছেলেমেয়েদের ঝামেলা চুকেছে। কিন্তু সেই ছোট্টো মেয়েটি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে বেরোয় নি। তাই দ্বিতীয় রানী তার কথা জানতে পারল না।

পরদিন রাজা এসে দেখেন একমাত্র তাঁর মেয়েকে। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোর ভাইরা কোথায়?"

মেয়েটি বলল, "বাবা, আমাকে একা ফেলে তারা চলে গেছে।"

তার পর জানলা দিয়ে যা দেখেছিল সব কথা সে জানাল। জানাল, কী ভাবে রাজহাঁস হয়ে তারা উড়ে যায়। উড়ে যাবার সময় আঙিনায় যে-সব পালক তারা ফেলে যায় সেগুলোও রাজাকে সে দেখাল।

ছেলেদের জন্য রাজার খুব শোক হল। কিন্তু দ্বিতীয় রানী যে এই অপরাধের মূলে সে-সন্দেহ তাঁর হল না। তাঁর ভয় হল, মেয়েটিরও কোনো বিপদ ঘটতে পারে। তাই বললেন, তাকে তিনি বাড়ি নিয়ে যাবেন।

মেয়েটি কিন্তু তাঁর সৎমাকে খুব ভয় পেত। তাই অনুনয় করে বলল আরো এক রাত সেই বনের দুর্গে তাকে থাকতে দিতে। মনে-মনে সে ভাবল, 'আমার ভাইরা না থাকলে কারুরই কোনো কাজে আমি লাগব না। আমি বেরিয়ে পড়ব তাদের খোঁজে।' রাত হলে পর চুপি চুপি সে বনের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত আর তার পরদিন ক্রমাগত সে চলল হেঁটে। শেষটায় এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে, আর এক পাও পারল না এগুতে। তার পর তার চোখে পড়ল এক বনকর্মীর কুঁড়ে ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে দেখে একটা ঘর। তার মধ্যে ছোট্টো-ছোট্টো ছটা বিছানা। সেই বিছানাগুলোর কোনোটাতে শোবার সাহস তার হল না। একটা খাটের নীচে ঢুকে সে স্থির করল শক্ত মেঝেতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে হঠাৎ সে শুনতে পেল ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দ। তাকিয়ে দেখে ছটা রাজহাঁসকে জানলা দিয়ে উড়ে আসছে। মেঝেয় বসে তারা পরস্পরের গায়ে ফুঁ দিতে-দিতে উড়িয়ে দিল সব পালক আর তার পর গা থেকে শার্টের মতো তারা খুলে ফেলল রাজহাঁসের চামড়া। মেয়েটি দেখল তারা তার ছয় ভাই। ভারি খুশি হয়ে সে তখন বেরিয়ে এল খাটের তলা থেকে।

ছোট্টো বোনটিকে আবার দেখতে পেয়ে তারাও কম খুশি হল না—কিন্তু সে-আনন্দ মাত্র খানিকক্ষণের জন্য। তারা বলল, "এটা তোর থাকার মতো জায়গা নয়। এটা ডাকাতদের আস্তানা। বাড়ি ফিরে দেখতে পেলে তোকে তারা খুন করে ফেলবে।"

তাদের ছোট্টো বোন প্রশ্ন করল, "আমাকে তোমরা বাঁচাতে পারবে না?"

তারা বলল, "না, কারণ প্রতি সন্ধেয় মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে

আমরা আমাদের রাজহাঁসের পালক খুলে মানুষের বেশ ধরতে পারি। তার পর আবার আমাদের রাজহাঁস হয়ে উড়ে যেতে হয়।"

তাই শুনে তাদের বোন খানিক কাঁদল। তার পর প্রশ্ন করল, "এই জাদুর প্রভাব থেকে তোমাদের কি মুক্ত করা যায় না?"

তারা বলল, "হায়, বোনটি, তা সম্ভব নয়। কারণ এই জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত করার শর্তগুলো ভারি কঠিন। ছ বছর তুই হাসতে কিংবা কথা কইতে পাবি না। আর সেই সময়ের মধ্যে আমাদের জন্যে গোলাপফুল দিয়ে বানিয়ে দিতে হবে ছটা শার্ট। মুখ থেকে তোর একটা কথা খসলেই সব পরিশ্রম পণ্ড হবে।"

ভাইরা এই শর্তগুলোর কথা তাকে বলার সঙ্গে-সঙ্গে সেই পনেরো মিনিট শেষ হল, আর তার ভাইরা আবার রাজহাঁস হয়ে জানলার ভিতর দিয়ে গেল উড়ে।

ছোট্ট বোনটি কিন্তু স্থির করল—প্রাণ যায় যাক, ভাইদের সে জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত করবেই করবে। কুঁড়ে ঘরটা থেকে বেরিয়ে বনে গিয়ে একটা গাছে চড়ে সে রাত কাটাল। পরদিন ভোরে উঠে গোলাপের পাপড়ি কুড়িয়ে সে শুরু করে দিল শার্ট বানাতে। কথা কইবার মতো কোনো লোক সেখানে ছিল না। হাসবার ইচ্ছেও তার হল না। এক মনে চলল সে সেলাই করে।

অনেকদিন ধরে এইভাবে মুখ বুজে সে কাজ করে চলল। তার পর হল কি, যে-গাছটায় সে বসে সেই গাছের কাছে রাজা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এলেন শিকার করতে। তারা হাঁক ছাড়ল, "কে তুমি?" মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। তারা বলল, "তুমি নেমে এসো। আমরা তোমায় মারব না।" মেয়েটি উত্তরে শুধু মাথা নাড়াল। তারা তাকে প্রশ্ন করে-করে ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলল। তাদের শান্ত করার জন্য মেয়েটি তার গলার সোনার হারগাছা দিল ফেলে। তবু তারা গেল না। তাই সে তার ওড়না খুলে নীচে ফেলল, তার পর তার মোজা আটকাবার গার্টার, তার পর একে-একে যতটা সম্ভব তার পোশাক-আশাক। শেষটায় তার গায়ে রইল শুধু তার ছোট্ট শেমিজটা।

শিকারীর দল তার পোশাক-আশাক নিয়ে সন্তুষ্ট হল না। গাছে চড়ে, তাকে নামিয়ে এনে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি? গাছে চড়ে কী করছিলে?"

মেয়েটি কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। নিজের জানা সবরকম ভাষায় রাজা প্রশ্ন করলেন। মেয়েটির মুখ থেকে রা সরল না। কিন্তু মেয়েটির অপরূপ রূপ দেখে রাজা তাকে ভালো না বেসে পারলেন না। নিজের আঙরাখা তার গায়ে জড়িয়ে, নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে, রাজা তাকে নিয়ে এলেন নিজের রাজপ্রাসাদে। সেখানে তাকে পরানো হল সব চেয়ে সুন্দর দামী-দামী পোশাক-আশাক। বসন্তের দিনের মতো ঝল্‌মল্‌ করে উঠল সে। কিন্তু তার ঠোঁট ফস্‌কে একটি কথাও খসল না। খাবার টেবিলে রাজার পাশে সে বসল। তার নম্র হাবভাবে মুগ্ধ হয়ে রাজা বললেন, "এই মেয়ে ছাড়া কাউকেই আমি বিয়ে করব না।" আর কয়েকদিন পর মেয়েটিকে সত্যি-সত্যিই বিয়ে করলেন তিনি।

রাজার মা-টা ছিল কিন্তু খুব কুচুটে। রাজার পছন্দ দেখে মোটেই সে খুশি হয় নি। রানী সম্বন্ধে অনেক খারাপ-খারাপ কথা বলতে সে শুরু করল। বলতে লাগল, "মেয়েটা একেবারে হাবাগোবা। রানী হবার মতো মেয়ে সে নয়।"

বছর খানেক পরে রানীর কোলে এল প্রথম বাচ্চা। রানী যখন ঘুমিয়ে তখন বাচ্চাটিকে নিয়ে গিয়ে রানীর ঠোঁটে বুড়ি লাগিয়ে দিল রক্ত। তার পর রাজার কাছে গিয়ে বলল যে, বউটা রাক্ষুসি। রাজা তার কথা বিশ্বাস করলেন না। বললেন রানীর এক গাছা চুলেও কেউ যেন হাত না দেয়। মেয়েটি চুপচাপ বসে শার্টগুলো সেলাই করে চলল। অন্য কোনো দিকে মন দিল না।

পরের বছর রানীর কোলে এল ফুট্‌ফুটে একটি ছেলে। শয়তান শাশুড়ি সেবারও ছেলে চুরি করে রানীর ঠোঁটে রক্ত মাখিয়ে রাজাকে বলল, বউটা রক্ষুসী। সেবারও রাজা তার কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, "রানীর ধর্মে মতি আছে, সে দয়ালু আর শান্ত প্রকৃতির। এ-ধরনের কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে কথা কইতে পারলে সবাই স্পষ্ট বুঝত সে নির্দোষ।"

কিন্তু তৃতীয়বারও নবজাত শিশুকে চুরি করে শয়তান বুড়ি যখন রাজাকে বলল, বউ রাক্ষুসি আর মেয়েটি যখন কোনো প্রতিবাদ করল না রাজা তখন বাধ্য হয়ে রানীর বিচারের ভার দিলেন বিচারকদের উপর। বিচারকরা বলল তাকে পুড়িয়ে মারতে।

যেদিন রানীকে পুড়িয়ে মারবার কথা সেদিনই শেষ হল সেই ছটা

বছর যার মধ্যে একটি কথা বলবে না বা একবারও হাসবে না বলে মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করেছিল। এইভাবে ভাইদের সে করল জাদুমুক্ত। সেই ছটা শার্ট তৈরিও শেষ হয়েছিল। শুধু একটার ছিল একটা হাতা বাকি।

বধ্যভূমিতে তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হল সেই ছটা শার্ট মেয়েটি নিয়ে গেল হাতে করে। তার চার দিকের কাঠে যখন আগুন ধরাতে যাওয়া হচ্ছে মেয়েটি দেখল আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে ছটি রাজহাঁস। তাই দেখে মেয়েটি বুঝল উদ্ধার পেতে তার আর দেরি নেই। আনন্দে তার বুকের স্পন্দন হল দ্রুততর। রাজহাঁসরা নেমে তার কাছে আসতে মেয়েটি সেই ছটা শার্ট তাদের গায়ে ছুঁড়ে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে রাজহাঁসের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল তার ভাইরা। সুন্দর স্বাস্থ্যে ঝল্‌মল্‌ করছে তাদের চেহারা। শুধু সব চেয়ে ছোটো ভাইয়ের বাঁ হাতের জায়গায় রইল রাজ-হাঁসের ডানা। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তার পর রাজার কাছে গিয়ে রানী বলল, "আমার রাজা! এখন বলতে পারি আমি নিরপরাধ, আমার ওপর মিথ্যে করে দোষ চাপানো হয়েছে।" তার পর বলল বুড়ির ছলনার সব কথা আর জানাল কী ভাবে তার ছেলেদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ছেলেদের নিয়ে আসা হলে রাজা খুব খুশি হলেন। তার পর সেই বধ্যভূমিতে শয়তান বুড়িটাকে পুড়িয়ে মারা হল। আর তার পর সেই রাজা, রানী আর সেই ছয় ভাই লাগল মনের আনন্দে দিন কাটাতে।

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি

এক সময় এক বনকর্মী বনে গিয়েছিল শিকার করতে। সেখানে শিশুর কান্নার মতো একটা শব্দ তার কানে এল। যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল সেদিকে যেতে-যেতে এক গাছতলায় সে পৌঁছল। সেই গাছের মগডালে সে দেখল একটি ছোট্টো ছেলে বসে। এক মা তার শিশুকে নিয়ে সেই গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় এক শিকারী পাখি শিশুটিকে তার কোলে দেখে নেমে এসে ঠোঁটে করে তাকে নিয়ে উড়ে গিয়েছিল গাছটার চুড়োয়। এইভাবে শিশুটি পৌঁছয় সেখানে।

বনকর্মী গাছে চড়ে শিশুটিকে নামিয়ে এনে ভাবল, 'একে আমি বাড়ি নিয়ে যাই। আমার ছোট্টো লেন্‌চেন্‌-এর সঙ্গী হয়ে এ বড়ো হয়ে উঠবে।'

শিশুটিকে সে বাড়ি নিয়ে গেল। তার পর বাচ্চা দুজন একসঙ্গে হয়ে উঠল বড়ো। ছেলেটিকে গাছের উপর পাওয়া গিয়েছিল আর একটা পাখি তাকে চুরি করেছিল বলে তাকে সবাই ডাকত কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বলে। লেন্‌চেন আর কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসত। সেই বনকর্মীর ছিল এক বুড়ি রাঁধুনি। প্রতি সন্ধ্যেয় দুটো বালতি নিয়ে সে যেত কুয়ো থেকে জল আনতে। সেই সন্ধ্যেয় একবার গিয়ে সে ক্ষান্ত হল না। বার বার গেল কুয়োতে। এটা লক্ষ্য করে লেন্‌চেন্‌ বলল, "সুসান্‌না, অত জল তুলিস কেন ?"

"কথাটা কাউকে বলবি না বলে কথা দিলে কারণটা তোকে বলব।"

লেন্‌চেন্‌ কথা দিল, কাউকে বলবে না। বুড়ি তখন বলল, "কাল

ভোরে তোর বাবা যখন পাখি শিকার করতে যাবে আমি এই জল ফোটাব। কেতলির মধ্যে জলটা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠলে কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে তার মধ্যে ফেলে সেদ্ধ করব।"

পরের দিন ভোরে বনকর্মী যখন বেরিয়ে গেল বাচ্চা দুজন তখনো বিছানায় শুয়ে। কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে লেন্‌চেন্‌ তখন বলল, "আমাকে কখনো ছেড়ে যাস না, আমিও কখনো তোকে ছেড়ে যাব না।"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বলল—কক্ষনো তাকে সে ছেড়ে যাবে না।

লেন্‌চেন্‌ তখন তাকে বলল গত সন্ধেয় সুসান্‌নার বালতি-বালতি জল তোলার কথা। বলল, "তাকে জিগেস করি, অত জল তুলছিস কেন। সে বলল, কাউকে না বললে কারণটা বলবে। কাউকে বলব না বলে কথা দিলে সে বলল, 'কাল ভোরে ফুটন্ত জল দিয়ে কেতলিটা ভরব, আর তোর বাপ বেরিয়ে গেলেই কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে তার মধ্যে ফেলে সেদ্ধ করব।' তাই আয়, চট্‌পট্‌ উঠে পড়ে একসঙ্গে আমরা পালাই।"

ছেলেমেয়েরা বিছানা থেকে উঠে চট্‌পট্‌ পোশাক পরে পালিয়ে গেল। কেতলিতে জল ফোটার পর কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে ধরার জন্য বুড়ি রাঁধুনি গেল ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে। গিয়ে দেখে ছোট্টো দুটো বিছানাই খালি। তাই-না দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে সে ভাবল, 'কত্তা বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েদের দেখতে না পেলে আস্ত রাখবে না। এক্ষুনি বেরিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনা দরকার।'

তিনজন চাকরকে রাঁধুনি পাঠাল ছেলেমেয়েদের খোঁজে। ছেলে-মেয়েরা বসেছিল বনে। দূরে চাকরদের আসতে দেখে কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে লেন্‌চেন বলল, "আমাকে কখনো ছেড়ে যাস না, আমিও কখনো তোকে ছেড়ে যাব না।"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বলল, "কক্ষনো তোকে ছেড়ে যাব না।"

লেন্‌চেন্‌ বলল, "তুই একটা গোলাপ-ঝাড় হয়ে যা। আমি হয়ে যাব ছোট্টো একটা গোলাপ-কুঁড়ি।"

সেই তিন চাকর বনে এসে দেখে সেখানে রয়েছে শুধু একটা গোলাপ-ঝাড় আর তাতে ধরেছে ছোট্টো একটা গোলাপ-কুঁড়ি—ছেলেমেয়েরা কোথাও নেই। চাকররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "এখানে খুঁজে লাভ নেই।" তার পর বাড়ি ফিরে বুড়ি রাঁধুনিকে বলল—বনের মধ্যে

শুধু রয়েছে একটা গোলাপ ঝাড় আর সেটায় ধরেছে একটা গোলাপ-কুঁড়ি।

তাদের কথা শুনে ভীষণ ধমকে বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, "গাধা কোথাকার! তোদের উচিত ছিল গোলাপ-ঝাড়টা দু টুকরো ক'রে ভেঙে গোলাপ-কুঁড়িটা কুড়িয়ে আনা। এক্ষুনি গিয়ে যা বললাম কর।"

তাদের খোঁজে দ্বিতীয়বার বেরুল চাকররা। দূর থেকে তাদের আসতে দেখে লেন্‌চেন্ বলল, "কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি, তুই আমাকে কখনো ছেড়ে যাবি না তো?"

ছেলেটি বলল, "কক্ষনো না, কক্ষনো না।"

"আমি তা হলে একটা গির্জে হয়ে যাব, আর তুই হবি তার মধ্যেকার ক্রুশ্।"

চাকররা এসে দেখে সেখানে রয়েছে শুধু একটা গির্জে আর তার মধ্যে একটা ক্রুশ্। তাই নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করল, "এখানে খুঁজে লাভ নেই। বাড়ি ফেরা যাক।"

বুড়ি তাদের প্রশ্ন করল, "কিছুই খুঁজে পেলি না?" তারা বলল— না, একটি গির্জে আর তার মধ্যে একটি ক্রুশ্ ছাড়া আর কিছু তারা দেখে নি।

বুড়ি তাদের ধমকে বলল, "গাধা কোথাকার! গির্জেটা ভেঙে কেন তোরা ক্রুশ্‌টা আনলি না?"

এর পরের বার ছেলেমেয়েদের খোঁজে চাকরদের সঙ্গে বুড়ি গেল নিজে। ছেলেমেয়েরা আবার দূরে দেখল চাকরদের আর তাদের পিছন পিছন বুড়িকে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আসতে। লেন্‌চেন্ প্রশ্ন করল, "কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি, তুই আমাকে কখনো ছেড়ে যাবি না তো?"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বললে, "কক্ষনো না, কক্ষনো না।"

লেন্‌চেন্ বলল, "তা হলে তুই একটা পুকুর হয়ে যা। আমি হাঁস হয়ে সেখানে সাঁতার কাটব।"

হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ি রাঁধুনি সেখানে পৌঁছল আর পুকুরটা দেখে ঝুঁকে পড়ে চেষ্টা করল সেটা চুমুক দিয়ে শুষে নিতে। কিন্তু সেই হাঁস সাঁতরে এসে ঠোঁট দিয়ে বুড়ির মাথা চেপে জলের মধ্যে টেনে আনল। ফলে বুড়ি গেল ডুবে। তার পর মহা ফুর্তিতে ছেলেমেয়েরা ছুটে গেল বাড়িতে। আর তার পর থেকে যদি তারা মারা গিয়ে না থাকে তা হলে এখনো নিশ্চয়ই সেখানে তারা আছে বেঁচে।

সাদা-গোলাপ আর লাল-গোলাপ

এক গরিব বিধবা ছোট্টো এক কুঁড়েঘরে থাকত। কুঁড়েঘরের সামনে ছিল একটি বাগান আর সেই বাগানে ছিল দুটি গোলাপগাছ। একটি গাছে ফুটত সাদা অন্যটিতে লাল গোলাপ। বিধবার ছিল দুটি মেয়ে আর তাদের দেখতে ছিল এই দুটি গোলাপগাছের মতো। তাই একজনকে ডাকা হত 'সাদা-গোলাপ' আর অন্যজনকে লাল-গোলাপ' বলে। মেয়ে দুটি ভারি ভালো আর খুব পরিশ্রমী। কিন্তু লাল-গোলাপের চেয়ে সাদা-গোলাপ ছিল অনেক শান্ত আর নম্র। লাল-গোলাপ ভালোবাসত মাঠে-মাঠে ফুল তুলতে আর প্রজাপতি ধরতে। কিন্তু সাদা-গোলাপ ভালোবাসত বাড়িতে তার মার কাছে থাকতে, সংসারের কাজে সাহায্য করতে আর কাজ না থাকলে মাকে বই পড়ে শোনাতে। মেয়ে দুটির মধ্যে ছিল খুব ভাবসাব আর ভালোবাসা। বেড়াতে বেরুত তারা হাত ধরাধরি করে। সাদা-গোলাপ যখন বলত, "আমরা কেউ কাউকে কোনোদিন ছেড়ে যাব না," লাল-গোলাপ উত্তর দিত, "জীবনে কখনো না।" আর তাদের মা বলত, "যখন যা পাবি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিবি।" লাল বেরিফল তুলতে প্রায়ই তারা বনে যেত। কিন্তু কোনো জীবজন্তু কখনো তাদের ক্ষতি করত না। পোষা জীবজন্তুর মতো তারা আসত মেয়ে দুটির কাছে। তাদের হাত থেকে ভীরু খরগোশ কুটুকুটু করে খেত বাঁধাকপির পাতা, মেয়ে হরিণরা চরে বেড়াত তাদের পাশে পাশে, ছেলে হরিণরা মনের আনন্দে তাদের পাশ

কাটিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেত আর গাছের ডালে ডালে চুপচাপ বসে পাখির দল গলা ছেড়ে গাইত গান। কোনোদিন কোনো আপদ-বিপদে তারা পড়ে নি। বনের মধ্যে রাত হয়ে গেলে নরম শ্যাওলার উপর পাশাপাশি শুয়ে তারা ঘুমত সকাল পর্যন্ত। তাদের মা সে কথা জানত, তাই তাদের জন্য কখনো দুশ্চিন্তা করত না।

একবার বনে এইভাবে রাত কাটাবার পর তাদের ঘুম যখন ভাঙল ভোরের আকাশ তখন গোলাপী হয়ে উঠেছে। জেগে উঠে তারা দেখে জ্বলজ্বলে সাদা পোশাক পরে ভারি সুন্দর এক শিশু তাদের পাশে বসে রয়েছে। শিশুটি দাঁড়িয়ে উঠে তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বনের মধ্যে চলে গেল। কিন্তু কোনো কথা কইল না। সে চলে যেতে চার দিকে তাকিয়ে মেয়েরা দেখে যেখানে তারা ঘুমচ্ছিল তার পাশেই গভীর একটা খাদ। রাতের অন্ধকারে আর কয়েক পা এগুলেই নির্ঘাত খাদের মধ্যে তারা পড়ে যেত। মা তাদের বলল,

শিশুটি নিশ্চয়ই কোনো দেবদূত, ভালো ছেলেমেয়েদের যে আপদ-বিপদ থেকে বাঁচায়।

সাদা-গোলাপ আর লাল-গোলাপ তাদের মায়ের ছোট্টো কুঁড়েঘরটি ভারি সুন্দর সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখত, গ্রীষ্মকালে প্রতি সকালে মায়ের ঘুম ভাঙার আগে লাল-গোলাপ তার বিছানার সামনে রাখত একটি করে ফুলের তোড়া। তোড়ায় থাকত সেই দুটি গোলাপগাছের একটি করে ফুল। শীতকালে সাদা-গোলাপ উনুনে আঁচ দিয়ে চড়িয়ে দিত কেতলি। কেতলিটা পেতলের। কিন্তু খুব ভালো করে ঘসা-মাজার দরুন সেটা ঝক্‌মক্ করত সোনার মতো। সন্ধেয় তুষারের পাপড়ি পড়ার সময় তাদের মা বলত, "সাদা-গোলাপ দরজাটায় হুড়কো দিয়ে আয়।" তার পর দুই বোন উনুনের পাশে বসে সুতো কাটত আর তাদের মা একটা মোটা বই থেকে পড়ে-পড়ে শোনাত। তাদের পাশে মেঝেয় শুয়ে থাকত

ভেড়ার একটা ছানা আর ডানার মধ্যে মুখগুঁজে দাঁড়ে বসে থাকত সাদা একটা বন-পায়রা।

এক সন্ধেয় তারা সবাই আরাম করে বসেছে এমন সময় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। তাদের মা বলল, "লাল-গোলাপ, শিগ্‌গির দরজাটা খোল। নিশ্চয়ই কোনো পথিক রাতের জন্যে আশ্রয় নিতে এসেছে।"

লাল-গোলাপ গিয়ে দরজার হুড়কো খুলল। প্রথমে সে ভেবেছিল অতিথি বুঝি কোনো গরিব লোক। কিন্তু দেখা গেল সেটা একটা ভালুক। ভালুক তার প্রকাণ্ড কালো মাথাটা দরজার মধ্যে গুঁজে দিল। তাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে পালাল লাল-গোলাপ। ভেড়ার ছানা লাগল ব্যা-ব্যা করতে। বন-পায়রা ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল। আর সাদা-গোলাপ লুকিয়ে পড়ল তার মায়ের খাটের নীচে। কিন্তু ভালুকটা মানুষের গলায় কথা বলতে শুরু করে বলল, "ভয় পেয়ো না। তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। ঠাণ্ডায় আমি মরমর। শুধু একটু আগুন পোয়াতে চাই।"

তাদের মা বলল, "বেচারা, আগুনের পাশে শুয়ে পড়ো। শুধু সাবধান—তোমার লোমগুলো যেন না পোড়ে।" তার পর সাদা-গোলাপ আর লাল-গোলাপকে ডেকে বলল, "তোরা বেরিয়ে আয়। ভালুক তোদের ক্ষতি করবে না। বেচারি শুধু একটু আগুন পোয়াতে চায়।"

মায়ের কথা শুনে মেয়েরা বেরিয়ে এল। তার পর ভেড়ার ছানা আর বন-পায়রাটাও এল তার কাছে। ভালুককে কেউই আর ভয় পেল না।

ভালুক তার পর বলল, "মেয়েরা, আমার লোম থেকে শ্যাওলা ঝেড়ে দাও।" দুই বোন তখন কাঁটা এনে ভালুকের শ্যাওলা ঝেড়ে দিল আর আগুনের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আরামে ভালুকটা করতে লাগল ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ। অল্প সময়ের মধ্যেই ভালুকের ভয়-ডর তাদের কেটে গেল আর তার সঙ্গে মেয়েরা শুরু করে দিল নানারকম ফষ্টিনষ্টি করতে। কখনো তারা তার লোম ধরে টানে, কখনো পিঠে পা দিয়ে তাকে এদিক-ওদিক ঠেলে নিয়ে যায়, কখনো হেজেলগাছের একটা ডাল দিয়ে তাকে পেটায়। ভালুক আপত্তি করলে তারা হাসতে থাকে। তাদের অত্যাচার খুব বেড়ে উঠলে আর সহ্য করতে না পেরে শেষটায় ভালুক বলে উঠল, "মেয়েরা, আমাকে মেরে ফেলো না।

"গোলাপ মেয়ে, গোলাপ মেয়ে,
একটা কথা শোনো—
ভালোবাসার লোককে
মারবে না কক্ষনো।"

রাত বাড়তে মেয়েরা বিছানায় শুয়ে পড়ার পর ভালুককে তাদের মা বলল, "ইচ্ছে করলে আগুন-তাতেই শুয়ে থেকো। ওখানে থাকলে শীতে কষ্ট পাবে না।"

পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই মেয়েরা দরজা খুলে দিল আর তুষারের উপর দিয়ে গুট্‌গুট্‌ করে হেঁটে ভালুক চলে গেল বনে। তার পর থেকে প্রতি সন্ধেয় একই সময়ে ভালুক এসে শুয়ে থাকে আগুনের পাশে আর মেয়েরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে আশ মিটিয়ে খেলা করে। ভালুকের সঙ্গে শেষটায় তাদের এমনই ভাব হয়ে গেল যে, সে না আসা পর্যন্ত সন্ধেয় বাড়ির দরজায় তারা হুড়কো দিত না।

তার পর এল বসন্তকাল। সবুজে-সবুজে ছেয়ে গেল সারা বন আর মাঠ। তখন এক সকালে সাদা-গোলাপকে ভালুক বলল, "এবার আমাকে যেতে হয়। সারা গ্রীষ্মকাল আমি আর আসতে পারব না।"

সাদা-গোলাপ প্রশ্ন করল, "ভালুকভায়া, কোথায় যাবে?"

"বনে গিয়ে পাজি বামনদের হাত থেকে আমার ধনদৌলত পাহারা দিতে হবে। শীতকালে জমি যখন জমে শক্ত হয়ে যায় তখন মাটির তলা থেকে বামনরা বেরুতে পারে না। কিন্তু এখন খট্‌খটে রোদে মাটি নরম হয়ে গেছে। বামনরা এখন মাটি ফুঁড়ে উঠে লুটপাট করতে আসবে। তারা একবার যে জিনিস নিজেদের গর্তে নিয়ে যায় সেগুলো সহজে আর উদ্ধার করা যায় না।"

ভালুক চলে যাবে শুনে সাদা-গোলাপের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দরজার হুড়কো সে খুলে দিতে ভালুক গেল বেরিয়ে। কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় দরজায় ঘষা লেগে ভালুকের চামড়া খানিকটা ছড়ে গেল। আর সাদা-গোলাপের মনে হল ভালুকের লোমের নীচে সোনা যেন ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল। কিন্তু সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে সে পারল না। ভালুকটাও কোনো দিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে ছুটে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

কিছুদিন পরে মা তাদের বনে পাঠাল জ্বালানী কাঠ জোগাড়

করতে। যেতে-যেতে তারা পৌঁছল প্রকাণ্ড একটা গাছের কাছে। কারা সেটাকে কেটে মাটিতে ফেলে গিয়েছিল। গাছটার গুঁড়ির কাছে ঘাসের মধ্যে কী যেন একটা ছট্‌ফট্‌ করছিল। মেয়েরা কিন্তু বুঝতে পারল না সেটা কী। কাছে গিয়ে তারা দেখে সেটা একটা বামন। মুখটা তার বুড়োদের মতো রেখাবহুল, প্রায় দেড় হাত লম্বা পাকা দাড়ি। তার দাড়ির শেষ দিকটা গাছের গুঁড়ির একটা ফাটলে আটকে গিয়েছিল। তাই কুকুর-ছানা দড়ি যেমন টানে তেমনি করে লাফাতে-লাফাতে দাড়িটা সে টানছিল। ভেবে পাচ্ছিল না কী করে সেটা ছাড়ানো যায়। মেয়েদের দিকে টকটকে লাল চোখে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বামন চেঁচিয়ে উঠল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমাকে সাহায্য করতে আসতে পারছ না?"

লাল-গোলাপ প্রশ্ন করল, "বামন, তুমি করছিলে কী?"

খেঁকিয়ে বামন জবাব দিল, "বোকা, ডেঁপো, বাঁদরি কোথাকার! গাছটা ভেঙে রান্নাঘরের জন্যে কাঠের ছোটো-ছোটো আঁটি নিয়ে যেতে এসেছিলাম। মোটা কাঠ জ্বালালে আমাদের খাবারের ছোটো ডিশ্‌গুলো পুড়ে যায়। তোমরা হ্যাংলা আর পেটুক—তোমাদের মতো গব্‌ গব্‌ করে আমরা গিলি না। গাছটার ফাটলে আমি একটা গোঁজ চালিয়ে-ছিলাম। তাইতেই কাঠের ছোটো-ছোটো টুকরো জোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু গোঁজটা ছিল খুব মসৃণ। তাই, আমি টের পাবার আগেই, পিছলে সেটা বেরিয়ে যায়। আর গাছের ফাটলটি চট্‌ করে এমন সেঁটে যায় যে, আমার সুন্দর সাদা দাড়িটা টেনে নেবার ফুরসৎ পাই নি। এখন এমন চেপে আটকেছে যে, আমি আর টেনে ছাড়াতে পারছি না। কচিমুখে দাঁত বের করে খিল্‌খিল্‌ করে হাসছ কেন? ছি-ছি! তোমাদের আমি ঘেন্না করি।"

মেয়েরা প্রাণপণে বামনের দাড়ি ধরে টানাটানি করল। কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারল না। লাল-গোলাপ তখন বলল, "তোমার দাড়ি ছাড়াবার জন্যে লোকজন ডেকে আনি গে।"

পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে বামন বলল, "হাঁদার দল! লোকজন ডেকে লাভ কী? আর কোনো বুদ্ধি মাথায় খেলছে না?"

সাদা-গোলাপ বলল, "ব্যস্ত হোয়ো না। আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।" এই-না বলে পকেট থেকে ছোটো একটা কাঁচি বের করে দাড়ির আগাটা

সে কেটে দিল।

মোহর-ভরা একটা থলি গাছের শেকড়ের মধ্যে বামন লুকিয়ে রেখেছিল। ছাড়া পাবার সঙ্গে-সঙ্গে সেটা বার করে নিয়ে গজ্‌গজ্‌ করে বামন বলে উঠল, "অসভ্য জংলী কোথাকার! আমার সুন্দর দাড়ি কতটা কেটে ফেলেছে। উচ্ছন্নে যাও!" এই-না বলে থলিটা কাঁধে ফেলে গট্‌গটিয়ে সে চলে গেল। মেয়েদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

তার পর কিছুদিন পর সাদা-গোলাপ আর লাল-গোলাপ নদীতে গেল মাছ ধরতে। জলের কাছে পেঁৗছে তাদের মনে হল গঙ্গা-ফড়িঙের মতো কী যেন একটা জলের দিকে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছে। দেখে মনে হয় সেটা বুঝি জলে ঝাঁপাবে। তারা ছুটে গিয়ে দেখে—সেই বামনটা। লাল-গোলাপ বলল, "কী করছ? জলে ঝাঁপ দেবে নাকি?"

তীক্ষ্ণ মিহি গলায় বামন জবাব দিল, "আমি অত বোকা নই! দেখতে পাচ্ছ না শয়তান মাছটা আমাকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চায়?"

আসলে হয়েছিল কী—বামনটা সেখানে বসে মাছ ধরছিল। কপাল খারাপ—তাই তার দাড়িটা ছিপের সুতোর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। আর তার খানিক পরেই প্রকাণ্ড একটা মাছ টোপ্‌ গেলে। দুর্বল বামনের গায়ে মাছটাকে টেনে তোলার শক্তি ছিল না। মাছটার শক্তি বেশি বলে বামনকে সে টেনে নিয়ে চলেছিল জলের মধ্যে। বৃথাই সে চেষ্টা করছিল ঘাসের চাপড়া আর নলখাগড়াগুলো ধরে নিজেকে সামলাতে। মাছটা তাকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আর-একটু হলেই জলের মধ্যে সে পড়ত। মেয়েরা ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরে সুতোর সঙ্গে দাড়ির জট খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু জট ছাড়ানো অসম্ভব দেখে আবার সেই ছোট্রো কাঁচি বার করে দাড়ির আরো খানিকটা ছাঁটতে তারা বাধ্য হল। তাই-না দেখে গলা ফাটিয়ে বামন চেঁচাতে লাগল, "হাঁদার দল, এইভাবে কখনো মানুষের সৌন্দর্য নষ্ট করতে হয়? সেদিন আমার দাড়ি ছেঁটে সাধ মেটে নি? আজকে আবার ছাঁটলে? বন্ধুদের কাছে এখন লজ্জায় মুখ দেখাই কী করে? তোমাদের শাপ দিলাম—শুকতলা-ছাড়া জুতো পরে পৃথিবীময় হেঁটে বেড়াও!" নল-

খাগড়ার বনে এক থলি মুক্তো লুকনো ছিল। সেটা কাঁধে ফেলে আর কোনো কথা না বলে বামন অদৃশ্য হল প্রকাণ্ড একটা পাথরের পিছনে।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে মা তাদের পাঠাল পাশের শহর থেকে ছুঁচ, সুতো, লেস আর ফিতে কিনতে। পথে ছিল একটা পোড়ো জমি। জমিটায় পাথরের বড়ো-বড়ো টুকরো ছড়ানো। সেখানে পেঁীছে তারা দেখে আকাশে প্রকাণ্ড একটা পাখি তাদের মাথার উপর ধীরে ধীরে পাক খেয়ে ঘুরছে। হঠাৎ সেটা ছোঁ মেরে পড়ল তাদের কাছে পাথরের একটা টুকরোর উপর। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের কানে ভেসে এল তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার। ছুটে সেখানে গিয়ে তারা দেখে তাদের পুরনো বন্ধু সেই বামনকে—ঈগল পাখি নখে করে তাকে নিয়ে যাবার উপক্রম করছিল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা বামনকে জাপটে ধরল, তার পর অনেক ধস্তাধস্তি করে ঈগলের কবল থেকে তাকে আনল ছাড়িয়ে। কিন্তু ভয় কাটার পর বামনটা তার মিহি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে বলল, "অত ধস্তাধস্তি করার কী ছিল? দেখো তো—আমার ছোট্টো সুন্দর কোটটা টেনে-হিঁচড়ে কী রকম কুটিকুটি করে ফেলেছ!—গবেট আর হাঁদা কোথাকার!" এই-না বলে জহরত-ভর্তি একটা থলি কাঁধে ফেলে পাথরের একটা গর্তের মধ্যে সে সেঁধিয়ে গেল। বামনের অকৃতজ্ঞতায় মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই তারা অবাক না হয়ে আবার যেতে শুরু করল। তার পর শহরে পেঁীছে সারল কেনাকাটা।

ফিরতি পথে সেই পোড়ো জমিতে পেঁীছে হঠাৎ তারা দেখে সেই বামনটাকে। পাথরের উপর পরিষ্কার একটা জায়গায় জহরতগুলো সে ঢেলেছিল। আশা করে নি অত রাত্রে সেখান দিয়ে কেউ যাবে। সূর্যের পড়ন্ত রোদে ঝল্‌মল্‌ করছিল জহরতগুলো। নানা রঙের সুন্দর ছটা বেরুচ্ছিল তাদের ভিতর থেকে। মেয়েরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেগুলো দেখতে লাগল। তাই-না দেখে বামনের রেখাবহুল বুড়োটে মুখটা রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল। সে চেঁচিয়ে বলল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছ কেন?"

গলা ছেড়ে বামনটা তাদের গালাগালি করতে যাবে এমন সময় শোনা গেল ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার আর দেখা গেল বন থেকে প্রকাণ্ড একটা কালো ভালুককে ছুটে আসতে। আঁতকে বামনটা লাফিয়ে

উঠল, কিন্তু তার লুকোবার জায়গায় পৌঁছবার আগেই ভালুকটা এসে পড়ল সেখানে। তাই-না দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বামন চেঁচাতে লাগল, "কর্তামশাই, কর্তামশাই, আমায় মারবেন না। এই দেখেন সব সুন্দর-সুন্দর দামী-দামী জহরতগুলো। প্রাণে মারবেন না। আমার সব ধনরত্ন আপনাকে দিয়ে দেব। আমার মতো একটা চিম্‌সে ছোট্টো-খাট্টো মানুষকে খেয়ে আপনার লাভ কী। আমি তো আপনার এক গ্রাসও হব না। কিন্তু ঐ দেখুন, ওখানে দুটো শয়তান হৃষ্টপুষ্ট বাচ্ছা মেয়ে রয়েছে। ওদের খেতে আপনার খুব ভালো লাগবে। ওদের খেয়ে ফেলুন।" ভালুক কিন্তু পাজি বামনের কথা কানে না তুলে তাকে এমন এক থাবা কষাল যে, বামন পড়ল ছিট্‌কে—আর নড়ল-চড়ল না।"

বাচ্ছা মেয়ে দুটি পালাচ্ছিল। কিন্তু ভালুক তাদের ডেকে বলল, "সাদা-গোলাপ, লাল-গোলাপ। ভয় পেয়ো না। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। মেয়েরা তখন তার স্বর চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তাদের কাছে পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গে ভালুকের গা থেকে খসে পড়ল তার চামড়াটা। আর তার জায়গায় দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে সুপুরুষ এক তরুণ। পরনে তার সোনার সুতোয় বোনা পোশাক। সে বলল, "আমি এক রাজার ছেলে। এই শয়তান বামন আমার সমস্ত ধন-দৌলত চুরি করে আমাকে একটা বুনো ভালুক করে দিয়েছিল। সে যতদিন না মরে ততদিন আমার মুক্তি ছিল না। আজ সে মরেছে। আমিও জাদুমুক্ত হয়েছি।

সাদা-গোলাপ বিয়ে করল রাজপুত্রকে আর লাল-গোলাপ বিয়ে করল তার ভাইকে। বামন তার গুহায় যে অজস্র ধনদৌলত জমিয়েছিল সেটা তারা নিল ভাগাভাগি করে। মেয়েদের বুড়ি মা তাদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বেঁচেছিল অনেক বছর। সেই দুটি গোলাপগাছ এনে সে পুঁতেছিল তার জানলার সামনে। আর প্রতি বছর সেই গাছ দুটিতে ফুটত আশ্চর্য সুন্দর-সুন্দর সাদা আর লাল-গোলাপ।

লোহার হান্‌স্‌

এক সময় এক রাজা ছিলেন। তাঁর কেল্লার কাছে ছিল প্রকাণ্ড একটা বন। সেই বনে ছিল সবরকম পশুপাখি। বিনা অনুমতিতে কেউ সেখানে শিকার করতে পারত না। একদিন এক শিকারীকে তিনি সেখানে পাঠালেন একটা হরিণ মেরে আনতে। কিন্তু শিকারী আর ফিরে এল না।

রাজা ভাবলেন, হয়তো সে কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছে। তাই পরদিন পাঠালেন আরো দুজন শিকারীকে। কিন্তু তারাও ফিরল না।

তৃতীয় দিন সকালে তাঁর সব শিকারীদের ডেকে তিনি বললেন, "যত দিন না আমার লোকদের সন্ধান পাও ততদিন সারা পৃথিবী তোমরা খুঁজে বেড়াবে।"

কিন্তু তাদের একজনও ফিরল না। এমন-কি, তাদের সঙ্গে যে-শিকারী কুকুরগুলো গিয়েছিল সেগুলোরও একটা ফিরল না। তার পর থেকে সেই বনে যেতে কেউ সাহস পেত না। গভীর স্তব্ধতা নিয়ে রহস্যময় হয়ে ছিল সেই বন। মাঝে মাঝে শুধু দেখা যেত কোনো ঈগল বা শকুনকে সেটার উপর উড়তে।

এইভাবে কাটল অনেকগুলো বছর। তার পর একদিন বিদেশী এক শিকারী রাজার সঙ্গে দেখা করে সেই বনে যাবার অনুমতি চাইল।

রাজা বললেন, "সেখানে গিয়ে কী লাভ? অন্যদের বরাতে যা জুটেছে তোমার বরাতেও তাই জুটবে—কেউ আর তোমার কোনো খোঁজ-খবর পাবে না।"

শিকারী বলল, "মহারাজ, নিজের দায়িত্বেই সেখানে যাব। আমার কোনো ভয়ডর নেই।"

এই-না বলে নিজের কুকুরকে নিয়ে বিদেশী শিকারী সেই বনের মধ্যে চলে গেল। খানিক পরেই কুকুরটা পেল একটা হরিণের গন্ধ। হরিণের পিছু নিতে গিয়ে কুকুর পৌঁছল গভীর একটা ডোবার সামনে। সেই ডোবা থেকে বেরিয়েছিল খালি একটা হাত। হাতটা কুকুরকে ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। বিদেশী লোকটি তখন ফিরে গিয়ে তিনজন লোককে নিয়ে এল বালতি দিয়ে জল ছেঁচে ডোবাটাকে পরিষ্কার করার জন্যে। ডোবার তলাটা যখন তাদের নজরে পড়ল তারা দেখে সেখানে একটা হিংস্র চেহারার লোক শুয়ে রয়েছে। রঙ তার তামাটে আর সমস্ত শরীর মর্চে-পড়া লোহার। তার দাড়ি আর চুল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। দড়ি দিয়ে লোকটাকে বেঁধে তারা তাকে নিয়ে এল কেল্লায়। লোকটার অদ্ভুত চেহারা দেখে সবাই হল ভীষণ অবাক। বুনো লোকটার জন্য রাজা বানালেন লোহার একটা খাঁচা। খাঁচাটাকে রাখা হল কেল্লার আঙিনায়। রাজা ঘোষণা করলেন, খাঁচার দরজা যে খুলবে তাকেই মেরে ফেলা হবে। খাঁচার চাবি রইল স্বয়ং রানীর কাছে।

তার পর থেকে যে-কেউ সেই বনে নিরাপদে যেতে পারত।

রাজার এক আট বছরের ছেলে ছিল। একদিন আঙিনায় খেলতে-খেলতে তার সোনার বলটা হঠাৎ পড়ে গেল খাঁচার মধ্যে।

ছেলেটি সেখানে ছুটে গিয়ে বলল, "আমার বলটা ছুঁড়ে দাও।"

বুনো লোকটা বলল, "খাঁচার দরজা খুলে না দিলে বল পাবে না।"

ছেলেটি বলল, "খাঁচার দরজা খোলা বারণ। আমার বাবা—রাজা—নিষেধ করে দিয়েছেন।" এই-না বলে ছেলেটি সেখান থেকে ছুটে চলে গেল।

পরদিন সকালে আবার এসে ছেলেটি তার বল চাইল।

বুনো লোকটা বলল, "দরজা খোলো।" ছেলেটি কিন্তু খুলল না।

তৃতীয় দিন রাজা বেরিয়েছিলেন শিকারে। ছেলেটি তখন খাচার কাছে গিয়ে বলটা চেয়ে বলল, "ইচ্ছে থাকলেও দরজা খুলতে পারব না। কারণ চাবি আমার কাছে নেই।"

বুনো লোক বলল, "চাবিটা আছে তোমার মার বালিশের তলায়। সহজেই সেটা আনতে পারবে।"

বলটা পাবার জন্য ছেলেটি পাগল হয়ে উঠেছিল। তাই সব-কিছু ভুলে ছুটে গিয়ে চাবিটা সে নিয়ে এল। খাঁচার দরজা ছিল খুব ভারি। খুলতে গিয়ে তার আঙুল ছড়ে গেল। দরজা খুললে পর বুনো লোকটা বেরিয়ে এসে ছেলেটিকে তার সোনার বল দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

তাই-না দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে লোকটার পিছন-পিছন ছুটতে-ছুটতে ছেলেটি চেঁচাতে লাগল, "বুনো লোক! পালিয়ো না। পালালে আমায় শাস্তি পেতে হবে।"

বুনো লোকটা তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে তার কাঁধে তুলে এক দৌড়ে ফিরে গেল সেই বনের মধ্যে।

শিকার থেকে ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে রাজার চোখে পড়ল খালি খাঁচাটা। রানীকে প্রশ্ন করলেন, খাঁচাটা খালি কেন? রানী জবাব দিতে পারলেন

না। চাবির খোঁজে ছুটে গিয়ে দেখেন—চাবিটা নেই। তখন তিনি ছেলের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। ছেলের খোঁজে মাঠে-মাঠে রাজা পাঠালেন তাঁর চাকর-বাকরদের। কিন্তু ছেলের খোঁজ তারা পেল না। তখন সহজেই লোকে বুঝল কী ঘটেছে। রাজসভা শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বুনো লোক গহন বনে গিয়ে কাঁধ থেকে ছেলেটিকে নামিয়ে বলল, "বাপ-মাকে তুমি আর জীবনে দেখতে পাবে না। কিন্তু আমি তোমাকে পুষ্যি নেব। খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়েছ বলে তোমার সঙ্গে সদয় ব্যবহারও করব। আমার অনেক সোনা-দানা আছে—অত ধনদৌলত পৃথিবীতে আর কারুরই নেই।"

তার পর শ্যাওলা দিয়ে ছেলেটির জন্য সে বানিয়ে দিল একটা কৌচ্। ছেলেটি তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে তাকে ঝরনার কাছে নিয়ে গিয়ে বুনো লোক বলল, "দেখো, স্ফটিকের মতো কিরকম স্বচ্ছ জল। এখানে বসে লক্ষ্য রেখো এই জলে যেন

কোনো-কিছু না পড়ে। কিছু পড়লেই ঝরনার জল অপবিত্র হয়ে যাবে। রোজ সন্ধেয় এসে দেখব আমার কথামতো কাজ করেছ কি না।"

ঝরনার তীরে বসে ছেলেটার সব সময় চোখে পড়ে একটা সোনালী মাছ বা সোনালী সাপ সেখানে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কোনো-কিছু সেখানে যাতে না পড়ে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখে সে। একবার কিন্তু তার আঙুলে যন্ত্রণা হতে কিছু না ভেবেই আঙুলটা ডোবাল সে জলে। সঙ্গে-সঙ্গে আঙুলটা বার করে নিয়ে সে দেখল সেটা সোনালী হয়ে গেছে! বহু ঘষাঘষি করেও সোনালী দাগটা সে তুলতে পারল না।

সন্ধেয় বুনো লোকটা ফিরে এসে কট্‌মট্‌ করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "ঝরনাটার কী করেছ ?"

"কিচ্ছু করি নি, কিচ্ছু করি নি" বলতে-বলতে নিজের পিছনে আঙুলটা সে লুকোল।

লোকটা কিন্তু বলল, "জলে তুমি আঙুল ডুবিয়েছিলে। এবার কিছু বললাম না। কিন্তু সাবধান, ঝরনায় আর কখনো কিছু ফেল না।"

পরদিন ভোরে আবার সে ঝরনার তীরে গিয়ে বসল পাহারা দিতে। আঙুলটা আবার কন্‌কন্‌ করে উঠতে সেটা সে তার মাথার চুলে ঘষল। ফলে তার একটা চুল পড়ে গেল জলে। সঙ্গে-সঙ্গে চুলটা সে তুলে ফেলল। কিন্তু সেটা তখন সোনা হয়ে গেছে।

ফিরে এসে কোনো প্রশ্ন না করেই বুনো লোকটা টের পেল—কী ঘটেছে। তাই সে বলল, "জলে একটা চুল ফেলেছিলে। আর একবার তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু তৃতীয়বার এ-ধরনের ঘটনা ঘটলে আমার কাছে তুমি আর থাকতে পাবে না।"

তৃতীয় দিন খুব ভোরে ছেলেটি গিয়ে বসল ঝরনার তীরে। মনে-মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল আঙুলটা যতই কন্‌কন্‌ করুক-না কেন কিছুতেই সে হাত নাড়াবে না। কিন্তু সময় যেন আর কাটতেই চায় না। তাই কিছু একটা করার জন্য জলের মধ্যে নিজের মুখের ছায়া সে দেখতে লাগল। আর দেখতে-দেখতে জলের দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়তে লাগল তার মাথা। তার চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। তাই খুব নিচু হয়ে ঝুঁকতে তার চুল পড়ে গেল জলের মধ্যে। সঙ্গে-সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে তার মাথার সব চুল সোনা হয়ে গিয়ে সূর্যের মতো ঝল্‌মল্‌ করছিল। ভীষণ ভয় পেয়ে রুমাল দিয়ে

চুলগুলো সে জড়াল। ভেবেছিল লোকটা লক্ষ্য করবে না।

লোকটা কিন্তু ফিরেই তাকে বলল, "রুমালটা খোলো।"

আর রুমালটা খুলতেই সোনালী চুলগুলো পড়ল ছড়িয়ে। ছেলেটি অনেক করে ক্ষমা চাইল কিন্তু কোনো ফল হল না।

লোকটা তাকে বলল, "আমার কথামতো কাজ তুমি করতে পার নি। তাই এখানে আর থাকতে পারবে না। এখন থেকে দেশে-দেশে ঘুরে শেখো গরিব হওয়া কাকে বলে। কিন্তু তোমার মনটা খুব ভালো। তাই তোমার ক্ষতি না করে একটা বর তোমায় দেব।—খুব অভাবে পড়লে এই বনে এসে ডেকো, 'লোহার হান্‌স্।' আমি তখন তোমাকে সাহায্য করতে আসব। আমার কীরকম ক্ষমতা তুমি ধারণাই করতে পার না। তা ছাড়া আমার আছে প্রচুর সোনা আর রুপো।"

রাজপুত্র তাই বন থেকে বেরিয়ে নানা পথ দিয়ে হেঁটে চলল। শেষটায় সে পৌঁছল বড়ো একটা শহরে। অনেক জায়গায় সে কাজের খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও কাজ পেল না। কারণ কোনোরকম কাজই সে শেখে নি। শেষটায় সেখানকার কেল্লায় গিয়ে সে একটা চাকরি চাইল। রাজসভার লোকরা বুঝতে পারল না কী কাজ তাকে দেওয়া যায়। কিন্তু তার চেহারা দেখে পছন্দ হওয়ায় তাকে তারা সেখানে থাকতে দিল। রাঁধুনি তাকে শেষ পর্যন্ত দিল কাঠ কাটার, জল তোলার আর ছাই ফেলার কাজ।

একদিন হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে রাজার খাবার টেবিলে স্যুপ্ পরিবেশন করার জন্য রাঁধুনি তাকে পাঠাল। সোনার চুলগুলো লুকোবার জন্য সে পরেছিল তার টুপিটা। রাজা বললেন, "রাজ-টেবিলে যখন খাবার পরিবেশন করবে তখন মাথায় টুপি রাখবে না।"

ছেলেটি বলল, "মহারাজ, আমার মাথায় একটা খারাপ অসুখ আছে। তাই টুপি খুলতে পারি না।"

রুগ্‌ণ একটা ছেলেকে চাকরি দিয়েছে বলে রাজা তখন রাঁধুনিকে ডেকে খুব ধমকালেন। বললেন, ছেলেটাকে দূর করে দিতে। কিন্তু রাজপুত্রের জন্য রাঁধুনির করুণা হল। তাই মালির ছোকরা চাকরকে নিজের কাছে রেখে রাজপুত্রকে দিল মালির ছোকরা চাকরের কাজ।

রাজপুত্র তখন বাগানের কাজ করতে লাগল। বছরের সব

সময়েই তাকে হয় গাছ পুঁততে, মাটি কোপাতে নয় বীজ বুনতে আর গাছপালায় জল দিতে হত। গ্রীষ্মকালে একদিন একলা বাগানে কাজ করতে-করতে তার খুব গরম লাগল। তাই মাথায় বাতাস লাগাবার জন্য যেই-না সে টুপিটা খুলেছে অমনি রোদ পড়ে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল তার সোনার চুলগুলো।

সেই ঝল্‌মলে আভা ঠিকরে পড়ল এক রাজকন্যের শোবার ঘরের জানলার শার্সিতে। চমকে উঠে কী ব্যাপার দেখার জন্য ছুটে গেল রাজকন্যে। জানলা থেকে ছেলেটিকে দেখে রাজকন্যে তাকে বলল, "আমার জন্যে এক তোড়া ফুল নিয়ে এসো।"

তাড়াতাড়ি টুপিটা পরে বুনো ফুল দিয়ে রাজপুত্র বানাল একটা তোড়া।

সিঁড়িতে মালির সঙ্গে তার দেখা। মালি তাকে বলল, "রাজকন্যের জন্যে সাধারণ বুনো ফুল নিয়ে যেয়ো না। বাগানের সেরা ফুল দিয়ে চট্‌পট্‌ একটা তোড়া বেঁধে নিয়ে যাও।"

ছেলেটি বলল, "না-না। বুনো ফুলের গন্ধ অনেক বেশি মিষ্টি। এই ফুলগুলোই রাজকন্যের বেশি ভালো লাগবে।"

রাজকন্যের ঘরে যেতে ছেলেটিকে সে বলল, "তোমার টুপিটা খোলো। আমার ঘরে টুপি পরে আসতে নেই।"

রাজাকে যা বলেছিল রাজকন্যেকেও সেই কথাগুলো সে বলল। কিন্তু রাজকন্যে তার কোনো ওজর-আপত্তি শুনল না—এক টানে খুলে দিল তার টুপিটা। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার আশ্চর্য সুন্দর থোকা-থোকা সোনার চুল ছড়িয়ে গেল তার ঘাড় আর কাঁধের উপর। তাই দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল রাজকন্যে। ছেলেটি তখন চেষ্টা করল সেখান থেকে ছুটে পালাতে। কিন্তু রাজকন্যে তাকে ধরে রেখে এক মুঠো মোহর দিল। মোহরগুলো নিয়ে বাইরে এসে মালিকে দিয়ে রাজপুত্র বলল, "তোমার ছেলেমেয়েদের দিলাম—মোহর নিয়ে খেলতে হয়তো তাদের ভালো লাগবে।"

পরদিন রাজকন্যে আবার তাকে ডাকল, সে ঘরে ঢুকতে খুলতে চেষ্টা করল তার টুপি। কিন্তু ছেলেটি দুহাত দিয়ে রইল সেটা চেপে। রাজকন্যে তাকে দিল আর-এক মুঠো মোহর আর আগের মতোই সেগুলো সে দিয়ে দিল মালিকে তার ছেলেমেয়েদের জন্য। তৃতীয় দিনেও ঘটল একই ঘটনা।

বেশ কিছুদিন বাদে সেই রাজত্বে লড়াই বাধল। রাজা তাঁর প্রজাদের একত্র করলেন। কিন্তু তাদের সাহায্যে শত্রুদের বাধা দিতে পারবেন বলে তাঁর সন্দেহ ছিল। কারণ শত্রুপক্ষের সৈন্য ছিল খুব শক্তিশালী আর সংখ্যায় অনেক বেশি।

মালির ছোকরা চাকর বলল, "এখন আমি বড়ো হয়ে উঠেছি। আমাকে একটা ঘোড়া দিলে যুদ্ধে যাব।"

তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠে বলল, "আমরা চলে যাবার পর আস্তাবলে গিয়ে দেখো কোনো ঘোড়া পাও কি না।"

আস্তাবলে ছিল একটি মাত্র খোঁড়া ঘোড়া। অন্যরা চলে যাবার পর ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠল সে, চলল সেই গহন বনের দিকে। বনের কিনারে পৌঁছে ঘোড়াটাকে বেঁধে তিনবার সে হাঁক দিল, "লোহার হান্‌স্! লোহার হান্‌স্! লোহার হান্‌স্!" এমন জোরে সে চেঁচাল যে থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল গাছগুলো।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বুনো লোকটা হাজির হয়ে বলল, "কী চাই?"

"আমার একটা সুস্থ সবল ঘোড়া দরকার। কারণ আমি চলেছি লড়াই করতে।"

বুনো লোকটা বনের মধ্যে চলে গেল আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এক সইস্ এমন একটা তেজী ঘোড়া নিয়ে হাজির হল যেটাকে তার পক্ষে ধরে রাখা ছিল প্রায় অসম্ভব। সেই ঘোড়ার পিছনে ছিল বর্মধারী একদল সৈন্য। রোদে ঝক্‌ঝক্ করছিল তাদের কোষমুক্ত তরোয়াল। সইস্‌কে খোঁড়া ঘোড়াটা দিয়ে তেজী ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদলের আগে-আগে চলল রাজপুত্র।

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সে পৌঁছল রাজার সৈন্যরা তখন কচু-কাটা হচ্ছে। মনে হল সেদিন নির্ঘাত তাদের হার হবে, কিন্তু নিজের বর্মধারী ছোটো সৈন্যদল নিয়ে রাজপুত্র যুদ্ধের চেহারা একেবারে দিল পালটে। শত্রুদের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে সে গেল। যে কেউ বাধা দিতে আসে সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সে কেটে ফেলে। শত্রুর দল পড়িমরি করে পালাল। জিত হল রাজার। কিন্তু তার পর রাজার কাছে না গিয়ে নিজের সৈন্যদল নিয়ে সেই বনের কিনারে পৌঁছে রাজপুত্র ডাকল লোহার হান্‌স্‌কে।

বুনো লোকটা বলল, "কী চাই?"

রাজপুত্র বলল, "তোমার তেজী ঘোড়াটা ফিরিয়ে নাও। আমার খোঁড়া ঘোড়াকে ফিরিয়ে দাও।"

তার পর খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে সে ফিরল কেল্লায়।

রাজা বাড়ি ফিরতে যুদ্ধজয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে রাজকন্যে গেল তাঁর কাছে ছুটে।

রাজা বললেন, "যুদ্ধে আমি জিতি নি। জিতেছে অজানা এক বীর। হঠাৎ বর্মধারী একদল সৈন্য নিয়ে সে হাজির হয়। তার সাহায্য না পেলে আমরা হারতাম।"

অজানা বীর কে জানবার জন্য রাজকন্যের খুব কৌতূহল হল। কিন্তু রাজা সেই রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "শত্রুদের তাড়া করে সে গিয়েছিল। তার পর থেকে কেউই আর তাকে দেখে নি।"

রাজকন্যে তখন মালিকে প্রশ্ন করল, "তার ছোকরা চাকর কোথায়।"

হেসে মালি বলল, "এইমাত্র সে তার খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে ফিরেছে। গ্রামের লোক তাকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে টিটকিরি দিয়ে চেঁচাচ্ছিল, 'ঐ দেখো আমাদের নড়্‌বড়ে খোঁড়া ঘোড়াটা।' তারা তাকে জিগেস করছিল লড়াইয়ের সময় কোন ঝোপের তলায় সে লুকিয়েছিল। সে বলছিল, 'ভালোর জন্যেই সব-কিছু করেছি। আমি না থাকলে রাজার সৈন্যরা হারত।' তার কথা শুনে সবাই অবশ্য হেসে গড়িয়ে পড়ে।"

রাজা তার পর তাঁর মেয়েকে বললেন, "আমি একটা বিরাট ভোজ-সভার আয়োজন করছি। তিনদিন ধরে নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া চলবে। তুমি একটা সোনার আপেল ছুঁড়ো। অচেনা বীরপুরুষ হয়তো সেটা লুফে নেবে।"

ভোজসভার কথা ঘোষণা হবার পর রাজপুত্র সেই বনে গিয়ে হাঁক দিল, "হান্‌স্‌।"

সঙ্গে-সঙ্গে হাজির হয়ে সে প্রশ্ন করল, "কী চাই?"

রাজপুত্র বলল, "রাজকন্যের সোনার আপেলটা লুফতে চাই।"

হান্‌স্‌ বলল, "তাই হবে। লাল একটা বর্ম পরে লাল একটা শেয়ালের পিঠে চড়ে তুমি যাবে।"

ভোজসভার প্রথম দিন অন্যান্য নাইট্‌দের (ভদ্রবংশের বীর-সৈনিক) সঙ্গে মিশে রাজপুত্র সেখানে হাজির হল। কেউই তাকে চিনতে পারল না। রাজকন্যে তাদের মধ্যে ছুঁড়ে দিল সোনার আপেল। কিন্তু একমাত্র রাজপুত্রই পারল সেটা লুফতে। আর তার পরেই সে গেল চলে। দ্বিতীয় দিন লোহার হান্‌স্ তাকে পরাল সাদা নাইট্-এর পোশাক আর সে গেল সাদা ঘোড়ায় চড়ে। দ্বিতীয় দিনেও আপেলটা লুফল সে। কিন্তু তার পর সেখানে না থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করার আগেই সাদা ঘোড়ায় চড়ে সে চলে গেল।

রাজা রেগে বললেন, "এ-কাজটা বে-আইনি। আমার কাছে এসে নিজের নাম বলতে সে বাধ্য।"

তার পর রাজা ঘোষণা করলেন: যে-নাইট্ দুবার সোনার আপেল লুফেছে তৃতীয়বার সে এলে তার যেন পিছু নেওয়া হয়; সে বাধা দিলে যারা পিছু নেবে তারা যেন তরোয়াল দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলে। তৃতীয় দিন লোহার হান্‌স্-এর কাছ থেকে রাজপুত্র পেল একটা বর্ম আর কুচ্‌কুচে কালো একটা ঘোড়া। আর তার পর আবার সে লুফে নিল সোনার আপেলটা। ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপুত্র যখন ফিরে চলেছে রাজার লোকজন তার পিছু নিল। একজন তরোয়ালের ডগা দিয়ে তার পায়ে আঘাত করল। সঙ্গে-সঙ্গে তার ঘোড়া পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ডাক ছেড়ে আচমকা এমন ভাবে খাড়া হয়ে উঠল যে, রাজপুত্রের হেল্‌মেট্ পড়ল খসে আর সঙ্গে-সঙ্গে তার আশ্চর্য সোনার চুল পড়ল কাঁধের উপর লুটিয়ে। রাজপুত্রকে কেউই কিন্তু ধরতে পারল না। যারা পিছু নিয়েছিল সমস্ত ঘটনার কথা রাজাকে গিয়ে তারা জানাল।

পরদিন রাজকন্যে মালিকে জিগেস করল তার ছোকরা চাকরের কথা।

মালি বলল, "বাগানে সে কাজ করছে। ক্লাউনটা গিয়েছিল ভোজসভা দেখতে। গত রাতে ফিরে যে-তিনটে সোনার আপেল সে জিতেছিল সেগুলো আমার ছেলেমেয়েদের দেখিয়েছে।"

তাই শুনে রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। রাজপুত্র হাজির হল তার টুপি পরে। কিন্তু রাজকন্যে তার কাছে গিয়ে টুপিটা খুলে নিল আর সঙ্গে-সঙ্গে তার কাঁধে লুটিয়ে পড়ল সোনার চুলের গুচ্ছ। তাই দেখে সবাই হল ভীষণ অবাক।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "পরপর তিনদিন তিনরকম পোশাক পরে এসে তিনটে সোনার আপেল যে লুফেছিল—তুমিই কি সেই নাইট্ ?"

রাজপুত্র বলল, "হ্যাঁ, এই দেখুন আপেলগুলো।" এই-না বলে পকেট থেকে আপেলগুলো বার করে সে দেখাল। তার পর বলে চলল, "আরো প্রমাণ চান তো এই দেখুন আমার পায়ের ক্ষত। আপনার যে-সব চাকর আমার পিছু নিয়েছিল তাদের একজন তরোয়ালের খোঁচা মেরেছিল এইখানে। আর আমিই সেই নাইট্ যে আপনাকে সাহায্য করেছিল শত্রুকে হারাতে।"

"এ-সব কাজ করে থাকলে কখনোই তুমি মালির চাকর হতে পার না। আমায় বল, তোমার বাবা কে ?"

আমার বাবা এক পরাক্রান্ত রাজা। ধনদৌলতের আমার অভাব নেই।"

রাজা বললেন, "তোমার কাছে আমি খুব ঋণী। তোমাকে কোনো উপহার দিতে পারি ?"

রাজপুত্র বলল, "নিশ্চয়ই। আপনার মেয়েকে আমায় দিন।"

রাজকন্যে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলল, "এ-মানুষটা সোজাসুজি সব কথা বলতে ভালোবাসে। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। আশ্চর্য সোনার চুল দেখেই বুঝেছিলাম মালির সাধারণ ছোকরা চাকর এ নয়।" এই-না বলে উঠে এসে রাজপুত্রকে সে চুমু খেল।

রাজপুত্রের বাবা-মা এলেন বিয়েতে। তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। কারণ ছেলের আবার দেখা পাবার আশা বহুকাল আগেই তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের ভোজ খাবার জন্যে সবাই যখন টেবিলের চার পাশে বসেছে এমন সময় হঠাৎ বহু পারিষদ নিয়ে সেখানে হাজির হলেন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ এক রাজা।

রাজপুত্রের কাছে সোজা গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন, "আমার নাম লোহার হান্‌স্। জাদুর মায়ায় বনের একটা বুনো লোক হয়ে এতদিন ছিলাম। তুমি আমাকে জাদুমুক্ত করেছ। আমার সব ধনরত্ন আজ থেকে তোমার হল।"

চড়ুই আর তার চার ছানা

এক চড়ুই সোয়ালো পাখির বাসায় তার চার ছানাকে রেখেছিল। ছানাদের ডানা গজাবার পর কতকগুলো পাজি ছেলে এসে বাসাটা ভেঙে ফেলে। ছানাদের কপাল ভালো—তারা পালাতে পেরেছিল। কিন্তু বুড়ি চড়ুইয়ের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ বাইরের পৃথিবীর বিপদ-আপদ সম্বন্ধে তাদের সে সাবধান করে দিতে পারে নি। পারে নি সৎ উপদেশ দিতে।

শরতের গোড়ায় এক গম-ক্ষেতে কতকগুলো চড়ুই জমায়েত হল। বুড়ি চড়ুই সেখানে তার ছানাদের দেখে খুব খুশি হয়ে তাদের নিয়ে এল বাড়িতে।

তার পর বলল, "বাছারা, একা-একা উড়ে গিয়ে সারা গ্রীষ্মকাল আমাকে কী রকম যে ভাবিয়েছিস যদি জানতিস। মনে রাখিস—ছোট্টো পাখিদের অনেক বিপদ। এইবার আমার উপদেশ শোন—তোদের মা যা করে সব সময় তাই করবি।"

তার পর সে তার বড়ো ছানাকে জিগেস করল, গ্রীষ্মকালে কী-কী সে করেছে আর কী খেয়ে বেঁচেছে।

বড়ো ছানা বলল, "চেরি ফল না পাকা পর্যন্ত বাগানের কেঁচো আর শুঁয়োপোকা খেয়ে বেঁচেছিলাম।"

তার মা বলল, "বাছা, ওতে অনেক বিপদ। তাই খুব সাবধানে থাকিস—বিশেষ করে লোকে যখন লম্বা-লম্বা সবুজ ফাঁপা বাঁশ নিয়ে ঘোরে যেগুলোর সামনে ফুটো থাকে।"

বড়ো ছেলে প্রশ্ন করল, "কিন্তু মা, সেই ফুটোগুলোর ওপর যদি সবুজ পাতা মোম দিয়ে আটকানো থাকে, তা হলে?"

"কোথায় ওরকম জিনিস দেখেছিস?"

"এক সদাগরের বাগানে।"

তার মা বলল, "বাছা, সদাগররা ভারি সেয়ানা আর ধড়িবাজ। সদাগরদের ওখানে ঘোরাঘুরি করে থাকলে নিশ্চয়ই তোর সংসার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান-গম্যি হয়েছে। সেগুলো কাজে লাগাস। নিজেকে কখনো খুব চালাক ভাবিস না।"

বুড়ি চড়ুই প্রশ্ন করল তারা কোথায় ছিল, কেমন ছিল।

একটা ছানা বলল, "রাজসভায়।"

তার মা বলল, "চড়ুইরা বোকাসোকা ছোট্রো পাখি। রাজসভার মতো জায়গায় সুস্থিরে তারা থাকতে পারে না। সোনা-দানা রেশম-মখমল তাদের কোনো কাজে লাগে না। আস্তাবল আর আঙিনায় থাকিস। ফসল ঝাড়াই হবার সময় রোজ দুবেলা খেতে পাবি।"

তার ছেলে বলল, "ঠিক বলেছ মা। কিন্তু সইস আর আস্তাবলের ছোকরা চাকররা যখন খড়ের গাদায় ফাঁদ পাতে কিংবা গুলতি ছোঁড়ে অনেক পাখি তখন জখম হয়, অনেকের মাথাও কাটা পড়ে।"

বুড়ি চড়ুই প্রশ্ন করল, "সে কথা জানলি কী করে?"

"আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

"বাছা, ছোকরা চাকরগুলো ভারি পাজি। রাজসভায় থেকেও, সেখানকার চাকর-বাকর-সইসদের সঙ্গে মেলামেশা করেও দেখছি তোর একটা পালকও খোয়া যায় নি। তাই মনে হচ্ছে নিজের ভার নিজেই নিতে পারিস। কিন্তু বাছা, হুঁশিয়ার। মনে রাখিস—খুব চালাক-চতুর কুকুরদেরও নেকড়েরা অনেক সময় খেয়ে ফেলে।"

বুড়ি চড়ুই তার পর তার সেজো ছেলেকে প্রশ্ন করল, "তুই ছিলি কোথায় ?"

সে বলল, "রাজপথ আর গলিঘুঁজিতে গাড়ি থেকে চাল-ডাল-গমের দানা আমি খুঁটে খেতাম।"

তার বুড়ি মা বলল, "ওগুলো খুব ভালো পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু সব সময় একটা চোখ খোলা রাখবি। মনে থাকে যেন—গাড়োয়ানদের পাথর কুড়নো মানেই বিপদ।"

সেজো ছেলে জবাব দিল, "সে কথা জানি। কিন্তু তাদের বুক পকেটে ইঁট-পাথরের টুকরো লুকনো থাকলে কী করব ?"

"সেরকমটা কোথায় দেখেছিস ?"

"গাড়ি চালাবার আগে পাহাড়ীরা সাধারণত বড়ো-বড়ো পাথর সঙ্গে নেয়। এটা আমি লক্ষ্য করেছি।"

"পাহাড়ী গাড়োয়ানরা ভারি বিচক্ষণ। তাদের সঙ্গে মিশে থাকলে নিশ্চয়ই অনেক কিছু শিখেছিস। তবু তাদের কাছ থেকে উড়ে পালাস। প্রায়ই তারা চড়ুইদের সর্বনাশ করে ছাড়ে।"

তার পর তাদের মা কোলের ছেলেকে বলল, "বেবি, সব সময় তুই ছিলি সব চেয়ে বোকা আর সব চেয়ে কাহিল। তুই আমার সঙ্গে থাক। পৃথিবীতে অনেক বড়ো-বড়ো নিষ্ঠুর পাখি আছে। তাদের ঠোঁট বাঁকানো, নখ লম্বা। তাদের একমাত্র কাজ—ছোটো-ছোটো দুর্বল পাখিদের ছোঁ মেরে ধরে গিলে ফেলা। তাই এখানে থাক। গাছের শুঁয়োপোকা আর বাসার মাকড়সাদের ধরিস। তা হলেই সুখে শান্তিতে থাকবি।"

ছোটো ছেলের নাম বেঞ্জামিন। সে বলল, "মামণি, যে সৎপথে থাকে, অন্যদের ঘাঁটায় না—কোনো ঈগল, শকুন, বাজপাখি তার ক্ষতি করতে পারে না। করুণাময় ঈশ্বর বনের সব পাখিদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের তিনি বাঁচিয়ে রাখেন। জীবন ধারণের জন্যে শুধু দরকার সকাল সন্ধে তাঁর আরাধনা করা। প্রতিটি কাকের ছানার প্রার্থনা তিনি শোনেন, প্রতিটি চড়ুই-এর কথা তিনি জানেন।"

তার মা প্রশ্ন করল, "এটা শিখলি কোথায় ?"

ছোটো ছেলে জবাব দিল, "যে ভয়ঙ্কর ঝড় তোমার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়েছিল সেটাই আমাকে নিয়ে যায় এক গির্জেয়। সেখানে সারা গ্রীষ্ম কাটাই জানালার মাছি আর মাকড়সা পরিষ্কার

করে। তোমাকে যা বললাম যাজককে সেই কথাগুলোই বলতে শুনেছি। তাই সব চড়ুইদের যিনি পিতা, তিনিই সারা গ্রীষ্ম আপদ-বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করেছেন, শিকারী পাখিদের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন।"

ছোটো ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি চড়ুই, "মানিক আমার! দেখছি তুই-ই সব চেয়ে দামী কথাটা শিখেছিস। ভবিষ্যতে গির্জেয় গেলে তোর জন্যে আমার কোনো দুর্ভাবনা হবে না। সেখানকার জানলার মাছি-মাকড়সা পরিষ্কার করবি আর জয়গান করবি সৃষ্টিকর্তার। তা হলেই থাকবি নিরাপদে। পৃথিবীতে শুধুই যদি হিংস্র পাখি থাকে—তা হলেও কোনোদিন তোর কোনো ক্ষতি হবে না।"

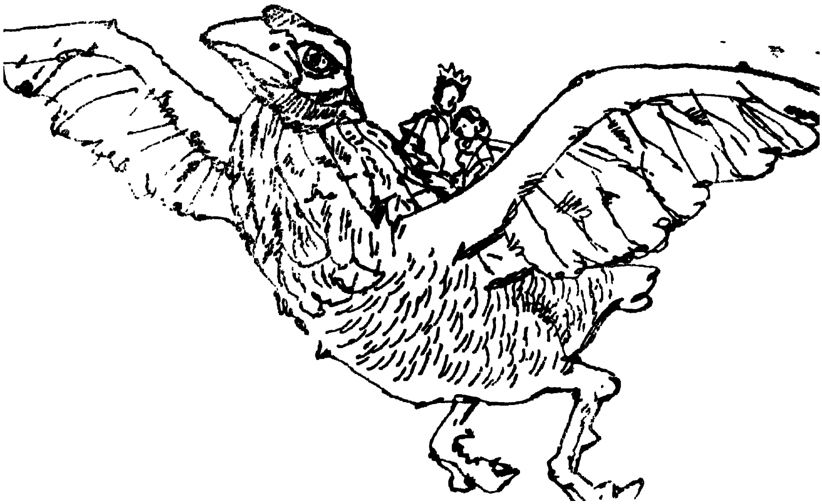

নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখি

এক সময় একটি লোক দেশ ভ্রমণে বেরুবার আগে নিজের তিন মেয়ের কাছে বিদায় নেবার সময় প্রশ্ন করল তাদের জন্য কী-কী উপহার আনবে। বড়ো মেয়ে বলল মুক্তো, মেজো মেয়ে বলল হীরে। কিন্তু ছোটো মেয়ে বলল তার চাই একটা নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখি।

তার বাবা বলল, "ওরকম পাখি পেলে নিশ্চয়ই আনব।" তার পর তিন মেয়েকে চুমু খেয়ে সে যাত্রা করল। বাড়ি ফেরার সময় হলে বড়ো আর মেজো মেয়ের জন্য সে কিনল মুক্তো আর হীরে। কিন্তু ছোটো মেয়ের জন্য নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখি কোথাও খুঁজে পেল না।

ফিরতি পথে পড়ল একটা বন। সেই বনের মাঝখানে ছিল একটা চমৎকার দুর্গ আর তার কাছে একটা গাছের মগডালে বসেছিল একটা নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখি। পাখিটাকে দেখে তার ভারি আনন্দ হল। কারণ ছোটো মেয়েকেই সে সব চেয়ে ভালোবাসত আর এ-পর্যন্ত তার জন্য পাখি জোগাড় করতে পারে নি বলে সে মনমরা হয়ে পড়েছিল।

খুশি হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক সময়েই পেয়ে গেছি।" তার পর চাকরকে বলল গাছে চড়ে ভরতপাখিটাকে ধরে আনতে।

কিন্তু তার চাকর যেই-না গাছের কাছে গেছে অমনি একটা সিংহ কেশর ঝাঁকিয়ে বন কাঁপিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, "যে আমার নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখিকে চুরি করতে যাবে তাকে খেয়ে ফেলব।"

লোকটি বলল, "জানতাম না পাখিটা তোমার। আমাকে মেরো না। তোমায় অনেক মোহর দেব।"

সিংহ বলল, "একমাত্র শর্তে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি—বাড়ি ফেরার পর যার সঙ্গে প্রথম তোমার দেখা হবে তাকে যদি দাও। এতে রাজি হলে পাখিটা তোমার মেয়ের জন্যে নিয়ে যেতে পার আর তুমি প্রাণেও যাবে বেঁচে।"

লোকটি খানিক ইতস্তত করে বলল, "হয়তো ছোটো মেয়ের সঙ্গেই আমার প্রথম দেখা হবে। কারণ সে আমায় খুব ভালোবাসে। বাড়ি ফিরলে প্রায়ই সবার আগে সে-ই ছুটে আসে আমার কাছে।"

তার চাকর কিন্তু খুবই ঘাবড়ে পড়েছিল। তাই সে বলে উঠল, "কর্তা, আপনার মেয়ে হতে যাবে কেন? খুব সম্ভব প্রথম দেখবেন বাড়ির কোনো কুকুর বা বেড়ালকে।" চাকরের কথা শুনে সিংহের শর্তে রাজি হয়ে লোকটি সেই নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখিকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়ি ফিরতে প্রথমেই কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ছোটো মেয়ের, যাকে সে সব চেয়ে ভালোবাসত। দৌড়ে এসে মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। বাবা তার জন্য নাচিয়ে গাইয়ে ভরতপাখি এনেছে দেখে মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না।

তার বাবা কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাছা, এই ছোট্টো পাখিটার জন্যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। এর বদলে তোমায় এক হিংস্র সিংহকে দিয়ে দিতে আমি বাধ্য। নিশ্চয়ই সে তোমায় টুকরো-টুকরো করে ফেলবে।" তার পর সব ঘটনার কথা জানিয়ে মেয়েকে সে মিনতি করে বলল, "সিংহকে যে কথা দিয়েছি সেটা না রাখলে যাই ঘটুক-না কেন—তুমি যেয়ো না।"

মেয়েটি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "বাবা, তুমি যে কথা দিয়েছ সেটা রাখতেই হবে। আমি গিয়ে সিংহকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরাপদে

তোমার কাছে ফিরে আসব।" পরদিন বিদায় নিয়ে সে বলল তাকে সেই বনের পথটা দেখিয়ে দিতে।

আসলে সেই সিংহ ছিল এক রাজপুত্তুর। জাদুর প্রভাবে সে আর তার অনুচররা দিনের বেলায় হয়ে যেত সিংহ, রাতে হয়ে উঠত মানুষ। তাই সেই দুর্গে পৌঁছবার পর মেয়েটিকে সবাই আদর-অভ্যর্থনা জানাল আর রাতে সেই সিংহ সুন্দর রাজপুত্তুর হয়ে উঠে সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটিকে বিয়ে করল। আনন্দে কাটতে লাগল তাদের সময়—সমস্ত দিন তারা ঘুময় আর সমস্ত রাত থাকে জেগে।

একদিন রাজপুত্তুর মেয়েটিকে বলল, "তোমার বড়ো বোনের বিয়ে বলে কাল তোমার বাবার বাড়িতে খুব ধুমধাম, বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। তুমি যেতে চাইলে আমার সিংহরা রক্ষীদল হয়ে তোমার সঙ্গে যাবে।"

মেয়েটি বলল, বাবাকে দেখার খুবই তার ইচ্ছে। তাই সিংহদের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। তাকে দেখে সবাই খুব খুশি। কারণ তারা ভেবেছিল অনেকদিন আগেই সিংহ তাকে খেয়ে ফেলেছে। তাদের সে জানাল, তার স্বামী ভারি চমৎকার আর তার দিন কাটছে খুব আনন্দে। তার বড়ো বোনের বিয়ের ভোজ শেষ হবার পর আবার সে ফিরে গেল বনে।

তার মেজো বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে সিংহকে সে বলল, "এবার কিন্তু একলা যাব না। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

সিংহ জানাল, যাওয়া তার পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ জ্বলন্ত আগুনের রশ্মি তার উপর পড়লে পায়রা হয়ে তাকে সাতটা বছর উড়ে বেড়াতে হবে।

তার বউ কিন্তু মিনতি করে বলল, "আমার সঙ্গে চল। কিচ্ছু হবে না। সবরকম আলো থেকে তোমায় আমি আড়াল করে রাখব।"

ফলে রাজপুত্তুরকে রাজি হতে হল। নিজেদের শিশুকন্যাকে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

বাপের বাড়ি পৌঁছে হলঘরের একটা অংশ পুরু দেয়াল দিয়ে ঘিরিয়ে নিল মেয়েটি। বিয়ে বাড়ির বাতি জ্বলে ওটার সময় রাজপুত্তুরকে সে বলল সেখানে থাকতে। কিন্তু সেখানকার দরজাটা বানানো হয়েছিল কাঁচা কাঠ দিয়ে। তাই সেটা শুকিয়ে ওটার সময় ছোট্টো একটা ফাটল

ধরে। কারুর সেটা নজরে পড়ে নি। গির্জে থেকে বর-কনেকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে আসার সময়ে মশালের সামান্য আলো পড়ে রাজপুত্তুরের গায়ে। ফলে তার বউ সেখানে ফিরে এসে দেখে—রাজপুত্তুর নেই। তার জায়গায় রয়েছে সাদা একটা পায়রা।"

মেয়েটিকে পায়রা বলল, "সাত বছর পৃথিবীতে আমায় উড়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু সাত-পা ছাড়া-ছাড়া একটা করে সাদা পালক আর এক ফোঁটা করে রক্ত আমি ফেলে যাব। সেই পথ ধরে গেলে তুমি আমায় মুক্তি দিতে পারবে।"

এই-না বলে পায়রা উড়ে গেল আর তার পিছন-পিছন চলল মেয়েটি। সাত-পা ছাড়া-ছাড়া সাদা পালক আর রক্তের ফোঁটা দেখে দেখে এগিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে সে ঘুরে বেড়াল। সাতটা বছর শেষ হয়ে আসার সময় স্বামীকে মুক্তি দেবার সম্ভাবনার কথা ভেবে মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু হঠাৎ সে দেখে রক্তের ফোঁটা আর সাদা পালক আর পড়ছে না। আর পায়রাও হয়েছে অদৃশ্য।

মেয়েটি ভাবল, 'মানুষ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

তাই সূর্যের কাছে গিয়ে সে বলল, "সুয্যিঠাকুর, পাহাড়-পর্বত খানা-খন্দর—সব জায়গায় তোমার আলো পড়ে। একটা সাদা পায়রাকে দেখেছ?"

সূর্য বলল, "না, দেখি নি। কিন্তু এই বাক্সটা নাও। খুব বিপদে পড়লে এটা খুলে দেখো।"

মেয়েটি তার পর চাঁদকে প্রশ্ন করল, "সমস্ত রাত ধরে ক্ষেতে-ক্ষেতে বনে-বনে তুমি আলো ছড়াও। একটা সাদা পায়রাকে দেখেছ?"

চাঁদ বলল, "না, দেখি নি। কিন্তু এই ডিমটা নাও। খুব বিপদে পড়লে এটা ভেঙে দেখো।"

চাঁদকে ধন্যবাদ দিয়ে মেয়েটি চলল এগিয়ে। যেতে-যেতে রাতের বাতাস এসে পড়ল মেয়েটির মুখে। তাকে সে বলল, "গাছেদের মধ্যে দিয়ে তুমি বয়ে যাও, পাতাদের তুমি দোলাও। একটা সাদা পায়রাকে দেখেছ?"

রাতের বাতাস বলল, "না দেখি নি। কিন্তু অন্য তিন বাতাসকে আমি প্রশ্ন করছি। তারা হয়তো দেখে থাকবে।"

পুবে আর পশ্চিমে বাতাস এসে বলল, কোনো সাদা পায়রা তারা

দেখে নি। কিন্তু দক্ষিণে বাতাস বলল, "আমি একটা সাদা পায়রাকে দেখেছি। লোহিত-সাগরে সেটা উড়ে গিয়ে আবার সিংহ হয়ে গেছে—কারণ সাতটা বছর শেষ হয়েছে। এখন সে লড়াই করছে একটা কুমিরের সঙ্গে। আসলে কুমিরটা ছদ্মবেশী এক রাজকন্যে।"

রাতের বাতাস মেয়েটিকে তখন বলল, "তোমাকে একটা উপদেশ দিই, শোনো। লোহিত-সাগরের তীরে যাও। ডান তীরে দেখবে অনেক বেণু-বাঁশ জন্মেছে। এক গোছা বেণু-বাঁশ কেটে সেগুলো দিয়ে কুমিরটাকে মেরো। সিংহ তা হলে লড়াইতে জিতে যাবে আর দুজনেই তখন ফিরে পাবে নিজেদের আসল চেহারা। তার পর চার দিকে তাকালে দেখবে সেখানে ঘুমচ্ছে প্রকাণ্ড 'শোক-পাখি'। রাজপুত্তুরকে নিয়ে তার পিঠে লাফিয়ে উঠো। জল-স্থলের ওপর দিয়ে উড়ে পাখিটা তোমাদের আবার বাড়িতে নিয়ে আসবে। এই বাদামটা নাও। মাঝ সমুদ্রে পৌঁছে এটাকে ফেলে দিয়ো। সঙ্গে-সঙ্গে জলের ওপর গজিয়ে উঠবে প্রকাণ্ড একটা বাদামগাছ। সেই গাছের ডালে বসে 'শোক-পাখি' বিশ্রাম নেবে। কারণ ততক্ষণে সে পড়বে খুব ক্লান্ত হয়ে। বাদামটা ফেলতে ভুললে পাখি তোমাদের দুজনকেই ফেলে দেবে সমুদ্রে।"

রাতের বাতাসের উপদেশমতো সব কাজ সে করল। বেণু-বাঁশ কেটে তাই দিয়ে মারল সে কুমিরকে। সিংহ তখন লড়াইতে জিতল আর তারা দুজনেই আবার ফিরে পেল মানুষের দেহ। কিন্তু কুমিররূপী রাজকন্যে জাদুমুক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত্তুরকে জড়িয়ে ধরে 'শোক-পাখি'র পিঠে লাফিয়ে উঠে উড়ে গেল।

এত দূর আসার পর তাকে ফেলে রাজপুত্তুর আর রাজকন্যেকে উড়ে যেতে দেখে বেচারি মেয়েটি একা বসে-বসে কাঁদতে লাগল। শেষটায় সাহসে বুক বেঁধে সে বলে উঠল, "স্বামীর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি হেঁটে চলব—যতক্ষণ বাতাস বইবে আর মুরগি ডাকবে।"

এই-না বলে হাজার-হাজার মাইল সে হাঁটল আর শেষটায় এসে-পৌঁছল এক রাজপ্রাসাদে, যেখানে তারা দুজন থাকতে গিয়েছিল।

তাদের আসন্ন বিয়ে উপলক্ষে সেখানে তখন বিরাট এক ভোজসভা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে ছোট্টো বাক্স সূর্য তাকে দিয়েছিল মেয়েটি তখন সেটা খুলে দেখে তার মধ্যে রয়েছে সূর্যের মতোই চোখ-ধাঁধানো সোনার একটা পোশাক। পোশাকটা পরে মেয়েটি গেল রাজপ্রাসাদে। তাকে

দেখে লোকে কনের চেয়েও বেশি তার রূপের প্রশংসা করতে লাগল। কনেরও খুব পছন্দ হল পোশাকটা। কনে প্রশ্ন করল কত দামে পোশাকটা সে বিক্রি করবে।

মেয়েটি বলল, "অগুনতি মোহর দিলেও বিক্রি করব না। বিক্রি করতে পারি শুধু রক্ত-মাংসের বিনিময়ে।"

কনে প্রশ্ন করল, তার কথাটার মানে কী?

মেয়েটি বলল, "বরের শোবার ঘরে একটা রাত আমায় কাটাতে দিলে পোশাকটা পাবে।"

কথাটা কনের বিশেষ পছন্দ হল না। কিন্তু পোশাকটা দেখে সে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে তাতেই সে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু শোবার ঘরের চাকরকে সে বলে দিল রাজপুত্তুরকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিতে।

রাতে রাজপুত্তুর ঘুমিয়ে পড়ার পর মেয়েটিকে তারা শোবার ঘরে পৌঁছে দিল। বিছানায় বসে মেয়েটি বলে চলল, "সাত বছর ধরে তোমার পেছন-পেছন সারা পৃথিবীতে আমি ঘুরেছি। তার পর সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম সূর্য, চাঁদ আর স্বর্গের চার বাতাসের কাছে। আর তার পর বেণু-বাঁশ দিয়ে কুমিরকে মেরে তোমায় আমি উদ্ধার করে-ছিলাম। এ-সব কথা কি তুমি ভুলে গেছ?" কিন্তু রাজপুত্তুর তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে। মেয়েটির স্বর তার মনে হল যেন বাইরেকার পাইন-গাছের মর্মর।

ভোর হতে সেই শোবার ঘর থেকে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল আর সেই সোনার পোশাকটা রাজকন্যেকে দিতে সে বাধ্য হল। মনের দুঃখে একটা মাঠে গিয়ে বসে মেয়েটি কাঁদতে লাগল। তার পর তার মনে পড়ল সেই ডিমের কথা, চাঁদ যেটা তাকে দিয়েছিল। ডিমটা ভাঙতে বেরিয়ে এল সোনার বারোটা ছানা নিয়ে একটা মুরগি। পিঁ-পিঁ করে ছানাগুলো ছুটোছুটি করে চলল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাদের।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠে মাঠের মধ্যে দিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। প্রাসাদের জানলা থেকে তাদের দেখতে পেয়ে রাজকন্যে মোহিত হয়ে গেল। তার পর নেমে এসে তাদের সে চাইল কিনতে।

মেয়েটি বলল, "অগুনতি মোহর দিলেও বিক্রি করব না। বিক্রি করতে পারি শুধু রক্ত-মাংসের বিনিময়ে। রাজপুত্তুরের শোবার ঘরে আর-এক রাত কাটাতে দিলে এদের পাবে।"

রাজকন্যে রাজি হয়ে গেল। ভেবেছিল গত রাতের মতোই তাকে আবার ঠকাবে। কিন্তু রাজপুত্তুর শুতে গিয়ে তার ভৃত্যকে প্রশ্ন করল— গত রাতে সে যে-সব মর্মরধ্বনি শুনেছিল তার অর্থ কী?

ভৃত্য তাকে জানাল সব কথা। বলল, এক গরিব ভবঘুরে মেয়ে তার ঘরে ছিল বলে তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। আজকেও ঘুমের ওষুধ তাকে খাওয়াবার কথা।

রাজপুত্তুর বলল, "ওষুধটা আমার বিছানার পাশে মেঝের ওপর ফেলে দাও।" আর তার পর মেয়েটি এসে যখন তার কাহিনী বলতে শুরু করল রাজপুত্তুর তার আসল বউ-এর গলার স্বর চিনতে পেরে লাফিয়ে উঠে বলল, "এইবার আমি সত্যি-সত্যি মুক্তি পেলাম। সব-কিছুই আমার স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কুমিররূপী অচেনা রাজকন্যে জাদুর মায়ায় আমাকে বশ করে তোমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভগবান ঠিক সময়ে আমার ভুল বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

মাঝরাতে তারা দুজন চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদ থেকে। কারণ তাদের ভয় ছিল রাজকন্যের জাদুকর বাবা তাদের ধরে ফেলতে পারে। তার পর সেই প্রকাণ্ড 'শোক-পাখি'র পিঠে তারা লাফিয়ে উঠল আর সেটা তাদের নিয়ে উড়ে চলল লোহিত-সাগরের উপর দিয়ে। মাঝ-সমুদ্রে পৌঁছে মেয়েটি বাদামটা ফেলে দিল আর সঙ্গে-সঙ্গে গজিয়ে উঠল বিরাট একটা বাদামগাছ। সেই গাছে খানিক বিশ্রাম নিয়ে তাদের পিঠে করে পাখিটা উড়ে এল তাদের বাড়িতে। সেখানে পৌঁছে তারা দেখে তাদের মেয়ে বড়োসড়ো আর ভারি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

তার পর থেকে আজীবন মনের আনন্দে তারা রইল।

পৃথিবীর বামন

এক সময় এক রাজার ছিল তিন মেয়ে। প্রতিদিন তারা রাজপ্রাসাদের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াত। সেই বাগানে ছিল অনেক লম্বা-লম্বা সুন্দর-সুন্দর গাছ। এই গাছগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা গাছের আপেল পেড়ে খেলে লোকে সঙ্গে-সঙ্গে মাটির একশো ফুট তলায় চলে যেত। তাই সেই গাছ থেকে আপেল পাড়া বারণ ছিল। শরৎকাল এই বিশেষ গাছের আপেলগুলো হয়ে উঠত রক্তের মতো লাল। প্রতিদিন রাজকন্যেরা সেই গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দেখত বাতাসে কোনো আপেল খসে পড়েছে কি না। কিন্তু কোনো আপেলই খসে পড়ত না— যদিও ফলের ভারে সেটার নানা ডাল মাটি ছুঁয়ে থাকত। একবার ছোটো রাজকন্যের খুব ইচ্ছে হল—একটা আপেল চেখে দেখে। তাই বোনদের সে বলল, "বাবা আমাদের খুব ভালোবাসেন। তাই একটা আপেল পাড়লে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন না। আইনটা যে বাইরের লোকদের জন্যে করা সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।" এই-না বলে ছোটো রাজকন্যে টুকটুকে লাল বড়ো একটা আপেল পেড়ে এক কামড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "একবার চেখে দেখো। এরকম মিষ্টি আর রসালো আপেল আগে কখনো খাই নি।" তার কথা শুনে অন্য দুই রাজকন্যেও আপেলটায় কামড় দিল আর সঙ্গে-সঙ্গে তারা তিনজনেই মাটির মধ্যে গেল ডুবে। তাদের একগাছা চুলও আর দেখা গেল না।

দুপুরে রাজা তাঁর মেয়েদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদ

আর বাগান তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাদের দেখা পাওয়া গেল না। রাজা তখন আদেশ দিলেন সমস্ত রাজ্য জুড়ে খোঁজ করতে আর ঘোষণা করলেন—যে তাঁর মেয়েদের খুঁজে বার করতে পারবে তার সঙ্গে এক মেয়ের বিয়ে দেবেন। দলে-দলে তরুণ খোঁজ শুরু করে দিল। কারণ রূপ আর গুণের জন্যে তিন রাজকন্যেকে সবাই খুব ভালোবাসত। যারা খোঁজ করছিল তাদের মধ্যে ছিল তিন তরুণ শিকারী। আট দিন ধরে যাবার পর তারা পেঁছিল বিরাট এক দুর্গে। সেখানে ছিল অনেক বড়ো-বড়ো ঘর। একটা ঘরের একটা টেবিলে থরে-থরে সাজানো ছিল নানারকম মুখরোচক খাবার। কিন্তু সেই দুর্গে জন-প্রাণীর দেখা মিলল না। দুপুর পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করলে। কিন্তু খাবারগুলো ঠাণ্ডা হল না। গরম খাবার থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বেরুতে লাগল। শেষটায় খিদের জ্বালা আর সইতে না পেরে তারা শুরু করে দিল খেতে। তার পর তারা স্থির করল সেখানে থেকেই তিন রাজকন্যের তারা খোঁজ করবে—দুজন থাকবে দুর্গে আর একজন বেরুবে খোঁজে। প্রথম দিন খুঁজতে যাবার ভার পড়ল যে-শিকারী বয়সে সব চেয়ে বড়ো তার উপর। কিন্তু পরদিন খোঁজে বেরুল ছোটো দুজন শিকারী। বড়োজন রইল দুর্গে। দুপুরবেলায় এক বামন সেখানে এল রুটি নিতে। এক টুকরো রুটি কেটে শিকারী তাকে দিল। কিন্তু দেবার সঙ্গে-সঙ্গে রুটির টুকরো মাটিতে ফেলে দিল বামন। তার পর বলল সেটা তাকে তুলে দিতে। আর যেই-না শিকারী সেটা তুলতে গেছে অমনি তার চুলের মুঠি ধরে ছড়ি দিয়ে বামন তাকে সজোরে মারল তিনবার।

সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে অন্য দুই শিকারী ফিরে এসে বড়ো শিকারীকে প্রশ্ন করল "কেমন ছিলে?"

"খুবই খারাপ।"

তার পর সে জানাল সব ঘটনার কথা।

তৃতীয় দিনে দুর্গে রইল সব চেয়ে ছোটো শিকারী। বামন এসে তার কাছে রুটি চাইল আর হাত থেকে রুটির টুকরো ফেলে তাকে বলল কুড়িয়ে দিতে।

ছোটো শিকারী বলল, "নিজে কুড়ুতে না পারলে রোজ-রোজ রুটি পাবে না।"

তার কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে রুটির টুকরোটা কুড়িয়ে দেবার জন্যে বামন জোর-জুলুম শুরু করে দিল। ছোটো শিকারীর আর বরদাস্ত হল না। বামনের ঘাড় ধরে আচ্ছা করে লাগল পেটাতে।

পরিত্রাহি চেঁচাতে-চেঁচাতে বামন তখন বলল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। রাজকন্যেদের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তোমায় বলছি। আমি হলাম পৃথিবীর বামন।"

তাকে সে নিয়ে গেল শুকনো একটার কুয়োর কাছে। তার পর বলল, "তোমার সঙ্গীরা সৎ লোক নয়। রাজকন্যেদের উদ্ধার করতে তাই তোমায় একলা যেতে হবে। অন্য দুজন শিকারীও রাজকন্যেদের

খুঁজবে। কিন্তু তাদের সাহস-টাহস নেই। গা ঘামাতে তারা চায় না। হাতে একটা ঘণ্টা আর ছোরা নিয়ে একটা চুপড়িতে বসে বোলো কুয়োর মধ্যে নামাতে। কুয়োর নীচে দেখবে তিনটে ঘর। তিন রাজকন্যে সেই তিন ঘরে আছে। ঘরগুলো পাহারা দিচ্ছে এক-একটা ড্রাগন। তাদের অনেকগুলো করে মাথা। তাদের মাথাগুলো তোমায় কাটতে হবে।"

কথাগুলো বলে বামন অদৃশ্য হল।

সন্ধেয় অন্য দুই শিকারী ফিরে প্রশ্ন করল, সে কেমন ছিল?

ছোটো শিকারী বলল, "ভালোই ছিলাম। দুপুরে যখন খাচ্ছি অদ্ভুত একটা বামন এসে রুটি চায়। হাত থেকে রুটির টুকরোটা ফেলে দিয়ে আমায় সে বলে কুড়িয়ে দিতে। বামনটার হম্বি-তম্বি বরদাস্ত করতে পারি নি। তাই আচ্ছা করে তাকে পিটিয়েছি। পিটুনির দরুন সে বলল রাজকন্যেদের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

কথাগুলো শুনে অন্য দুই শিকারী হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল।

পরদিন সকালে লটারি করে স্থির হল বড়ো শিকারী বসবে

চুপড়িতে। সেখানে বসে সে বলল, "দুবার ঘণ্টা বাজালে চট্‌পট্‌ আমায় টেনে তুলো।" নামবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে কিন্তু ঘণ্টা বাজাল। তাই তাকে তারা টেনে তুলল। তার পর নামার পালা এল ছোটো শিকারীর। কুয়োর মধ্যে নেমে চুপড়ি থেকে বেরিয়ে ছোরা হাতে প্রথম দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগল। ড্রাগনের নাক ডাকার শব্দ শুনে দরজা ভেঙে ঘরে গিয়ে সে দেখে এক রাজকন্যে বসে আছে আর তাকে ঘিরে রয়েছে ড্রাগনের নটা মাথা। সঙ্গে-সঙ্গে ছোরা দিয়ে সে কেটে ফেলল মাথাগুলো। রাজকন্যে তখন লাফিয়ে উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরে খেল অনেক চুমু। তার পর সে গেল দ্বিতীয় ঘরে। সেখানে বসেছিল আর-এক রাজকন্যে আর তাকে ঘিরেছিল সাত মাথাওয়ালা একটা ড্রাগন। সেটার মাথাগুলো কেটে সে গেল তৃতীয় রাজকন্যের কাছে। তার ড্রাগনের ছিল চারটে মাথা। সেগুলোও সে ফেলল কেটে। উদ্ধার পেয়ে তিন রাজকন্যে তাকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানাল। তার পর সে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজকন্যেদের একের পর এক তুলে দিল চুপড়িতে আর দুজন শিকারী তাদের তুলে নিল উপরে। ছোটো শিকারীর তখন মনে পড়ল বামন বলেছিল অন্য দুজন সৎ লোক নয়। তাই তাকে তোলার জন্য তারা চুপড়ি নামাতে ছোটো শিকারী তাতে নিজে না উঠে তুলে দিল ভারি একটা পাথর। সেটা অর্ধেক তুলে পাজি শিকারী দুজন দড়ি কেটে দিল। ফলে চুপড়িসুদ্ধ হুড়্‌মুড়িয়ে পড়ে গেল পাথরটা। তারা ভাবল ছোটো শিকারী নির্ঘাত মরেছে।

রাজকন্যেদের তারা বলল রাজাকে যেন বলে, তারাই তাদের উদ্ধার করেছে।

খুব খুশি হয়ে রাজা বললেন, তাদের দুজনের সঙ্গে দুই রাজকন্যের বিয়ে দেবেন।

এদিকে ছোটো শিকারী মাটির তলার ঘরগুলোয় ঘুরতে-ঘুরতে দেখে দেয়ালে একটা বাঁশি ঝুলছে। বাঁশিটা বাজাতেই হাজির হল দলে-দলে বামন।

তারা সবাই তাকে প্রশ্ন করল, সে কী চায়। সে বলল পৃথিবীতে দিনের আলোয় তাকে নিয়ে যেতে। প্রত্যেক বামন তার একগাছা করে চুল ধরে তাকে উপরে নিয়ে গেল।

উপরে এসেই সোজা সে চলে গেল রাজার দুর্গে। সেখানে তখন এক রাজকন্যের বিয়ের উৎসব চলছিল।

তাকে দেখেই তিন রাজকন্যে হয়ে গেল অজ্ঞান।

রাজা ভাবলেন রাজকন্যেদের সে তুক্ করে ফেলেছে। তাই আদেশ দিলেন তাকে হাজতে পুরতে।

জ্ঞান ফিরে আসতে রাজকন্যেরা রাজাকে বলল ছোটো শিকারীকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়।

রাজা প্রশ্ন করলেন—কেন ?

আসল কথা রাজাকে তারা জানাতে পাজি শিকারীদের রাজা দিলেন ফাঁসি আর ছোটো শিকারীর সঙ্গে দিলেন ছোটো রাজকন্যের বিয়ে।

বিয়ের সময় ছোটো রাজকন্যে পরেছিল কাঁচের চটি। কিন্তু গির্জে থেকে ফেরার সময় একটা পাথরে হোঁচট খেয়েছিল বলে সেটা ফেটে যায়।

দাঁড়কাক

এক সময় এক রানীর ছোট্টো একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি এক দিন দারুণ দুষ্টুমি জুড়ে দিল। কিছুতেই রানী তাকে শান্ত করতে পারলেন না। রাজপ্রাসাদের চারি দিকে তখন অনেক দাঁড়কাক উড়ছিল। তিতিবিরক্ত হয়ে জানলা খুলে রানী বললেন, "আমার ইচ্ছে করছে তুই একটা দাঁড়কাক হয়ে যা। তা হলে তুই উড়ে যাবি আর আমিও শান্তিতে থাকব।"

কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই মেয়েটি একটা দাঁড়কাক হয়ে তাঁর কোল থেকে উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাজা-রানী তাঁদের মেয়ের কোনো খবর পেলেন না। একদিন সেই বন দিয়ে যাচ্ছিল একটি লোক। দাঁড়কাকের ডাক শুনে তার কাছে যেতে দাঁড়কাক বলল, "আসলে আমি রাজকন্যে। কিন্তু দাঁড়কাক হয়ে গেছি। তুমি ইচ্ছে করলে আবার আমাকে মানুষ করে দিতে পার।"

লোকটি প্রশ্ন করল, "আমায় কী করতে হবে?"

দাঁড়কাক বলল, "এই বনের আরো ভেতরে যাও। সেখানে দেখবে একটা বাড়িতে এক বুড়ি আছে। বুড়ি তোমাকে খাবার-দাবার দেবে। কিন্তু সে-সব খবরদার খাবে না। কারণ তার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করলে তুমি পড়বে ঘুমিয়ে। তা হলে আমাকে আর সাহায্য করতে পারবে না। বাড়িটার পেছনের বাগানে আছে মস্ত এক খরগোশের খাঁচা। সেটার ওপর দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। তিন দিন রোজ দুপুর দুটোয় আমি একটা জুড়িগাড়িতে আসব। সেই

গাড়িটা প্রথম দিন টানবে চারটে সাদা, দ্বিতীয় দিন চারটে লাল আর শেষ দিন চারটে কালো ঘোড়া। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে থাকলে আমি জাদুমুক্ত হতে পারব না।"

লোকটি কথা দিল তার কথামতো কাজ করবে বলে। কিন্তু দাঁড়কাক বলল, "আমি জানি তুমি আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। কারণ বুড়ির দেওয়া খাবার নিশ্চয়ই তুমি খাবে।"

লোকটি আবার তাকে কথা দিল বুড়ির দেওয়া খাবার-দাবার খাবে না বলে। কিন্তু সেই বাড়িটার কাছে পেঁছিতে বুড়ি বেরিয়ে এসে বলল "বাছা, তোমায় ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ভেতরে এসে কিছু খাও-দাও।"

লোকটি বলল, "না-না, আমি কিছু খাব-দাব না।"

ধূর্ত বুড়ি তাকে কিন্তু ছাড়ল না। বলল, "কিছু না খাবে তো খেয়ো না। এই গেলাস থেকে অন্তত এক ঢোক জল তো খাও। সেটাকে আর খাওয়া-দাওয়া বলে না।"

নাছোড়বান্দা বুড়ির কথায় তাই এক ঢোক জল সে খেল। তার পর দুপুর দুটোয় বাগানে গিয়ে খরগোশের খাঁচায় চড়ে দাঁড়কাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ খুব ক্লান্ত বোধ করায় সে ভাবল জেগে-জেগে খানিক গড়িয়ে নেবে। আর যেই-না শোয়া সঙ্গে-সঙ্গে তার দু চোখের পাতা ঘুমে গেল জড়িয়ে আর সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক দুপুর দুটোয় চারটে সাদা-ঘোড়ায় টানা জুড়িগাড়িতে চেপে দাঁড়কাক এসে আপন মনে বলল, 'লোকটা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।' আর তার পর খরগোশের খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়কাক দেখল তাকে অঘোরে ঘুমতে। জুড়িগাড়ি থেকে নেমে তাকে ডাকাডাকি করে অনেকবার সে ঝাঁকাল। কিন্তু কিছুতেই লোকটার ঘুম ভাঙল না।

পরদিনও খাবার জন্য বুড়ি তাকে ধরে বসল আর প্রথমে আপত্তি করে শেষপর্যন্ত গেলাস থেকে সে খেল এক ঢোক জল। তার পর দুপুর দুটো নাগাদ সে গিয়ে দাঁড়াল খরগোশের খাঁচার উপর। কিন্তু কিছুতেই সে জেগে থাকতে পারল না। আগের মতোই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। চারটে লাল-ঘোড়ায়-টানা জুড়িগাড়িতে চেপে দাঁড়কাক এসে আপন মনে বলল, 'লোকটা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়ছে।' তার পর জুড়িগাড়ি থেকে নেমে তাকে ডাকাডাকি করে অনেকবার সে ঝাঁকাল। কিন্তু কিছুতেই লোকটার ঘুম ভাঙল না।

তৃতীয় দিন বুড়ি তাকে খাবার জন্য আবার ঝুলোঝুলি করে প্রশ্ন করল, "খাচ্ছ না কেন? উপোস করে কি মরবে?"

সে শুধু বলল, "না, কিছুতেই খাব না।"

বুড়ি কিন্তু তার পাশে ভালো-ভালো খাবার-ভরা একটা ট্রে নামিয়ে রেখে চলে গেল। আর খাবারের ভুরভুরে গন্ধে সে আর লোভ সামলাতে পারল না। পেট ভরে খেয়ে দুপুর দুটো নাগাদ বাগানে গিয়ে খরগোশের খাঁচায় উঠে সে রাজকন্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু আগের মতোই সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। তার পর চারটে কালো-ঘোড়া-টানা জুড়িগাড়িতে দাঁড়কাক সেখানে পৌঁছল বিষণ্ণ মনে। কারণ আগে থেকেই সে জানত লোকটি পড়বে ঘুমিয়ে। অনেক ডাকাডাকি করে অনেকবার ঝাঁকিয়েও আগের মতো দাঁড়কাক তাকে জাগাতে পারল না। তখন লোকটির পাশে সে নামিয়ে রাখল রুটি, মাংস আঙুর-রস। কারণ এখন সে যত খাওয়া-দাওয়াই করুক-না কেন—কিছুই যাবে আসবে না। তার পর নিজের নাম-লেখা সোনার একটা আংটি আঙুল থেকে খুলে সে পরিয়ে দিল লোকটির আঙুলে। আর তার পাশে রেখে গেল একটা চিঠি। তাতে লেখা ছিল: "আমি বুঝতে পারছি এখানে আমায় তুমি কোনোদিন জাদুমুক্ত করতে পারবে না। কিন্তু স্ট্রোম্‌বার্গের সোনার কেল্লায় গিয়ে আমায় কি জাদুমুক্ত করবে? আমি জানি, ইচ্ছে করলে পার।" তার পর জুড়িগাড়িতে চড়ে সে চলে গেল স্ট্রোম্‌বার্গের সোনার কেল্লায়।

ঘুম থেকে জেগে লোকটির মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। আপন মনে সে বলে উঠল, 'রাজকন্যে এসে নিশ্চয়ই চলে গেছে। তাকে আমি জাদুমুক্ত করতে পারলাম না।'

তার পর চিঠিটা নজরে আসতে সেটা পড়ে সে জানতে পারল সব ঘটনার কথা। স্ট্রোম্‌বার্গের কেল্লায় যাবার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে সে যাত্রা করল। কিন্তু জানত না কোন দিকে সেটা আছে। তাই বহুকাল নানা দেশে সে ঘুরল। শেষটায় পথ হারাল গহন এক বনে। চোদ্দো দিন ধরে সেই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক সন্ধেয় ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল এক বৈঁচি-ঝোপের উপর। পরদিন সে আবার এলোমেলো ঘুরতে লাগল আর সন্ধেয় ক্লান্ত হয়ে আবার যখন শুতে যাবে তার কানে ভেসে এল নানা আর্তনাদ আর কান্নাকাটির শব্দ। তাই ঘুমতে সে

পারল না। অন্ধকার ঘন হতে তার চোখে পড়ল আলোর একটি শিখা। উঠে পড়ে সেদিকে হাঁটতে-হাঁটতে সে পৌঁছল একটা বাড়ির কাছে। বাড়িটাকে খুব ছোট্টো দেখাচ্ছিল। কারণ সেটার সামনে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড একটা দৈত্য। প্রথমে সে ভাবল, 'বাড়িটার মধ্যে যেতে গেলে খুব সম্ভব দৈত্য আমায় শেষ করে দেবে।' কিন্তু শেষটায় সাহসে ভর দিয়ে সে এগুলো।

দৈত্য বলল, "তুই এসেছিস—ভালোই হয়েছে। আমার খুব খিদে পেয়েছে। তোকে গিলে রাতের জলখাবার সেরে নেব।"

লোকটি বলল, "আমায় গিলো না। পেট ভরে তোমায় খেতে দেব।"

দৈত্য বলল, "তাই যদি হয় তোর দুর্ভাবনার কারণ নেই। আমার কাছে খাবার-দাবার নেই বলেই তোকে গিলতে চেয়েছিলাম।"

তারা গিয়ে খাবার টেবিলের সামনে বসতে লোকটি তার ঝোলা থেকে বার করল প্রচুর রুটি, মাংস আর আঙুর-রস।

পেট ভরে খেয়ে খুশি হয়ে দৈত্য বলল, "আঃ—ভারি তৃপ্তি পেলাম।"

লোকটি তখন প্রশ্ন করল, "স্ট্রোম্‌বার্গের সোনার কেল্লা কোথায় বলতে পার?"

দৈত্য বলল, "আমার মানচিত্রটা দেখছি। সেখানে প্রত্যেক শহর, গ্রাম আর বাড়ি দাগানো আছে।" ভিতরের ঘর থেকে মানচিত্র এনে সে সোনার কেল্লাটা খুঁজল। কিন্তু কোনো হদিশ না পেয়ে বলল, "ওপরতলার আলমারিতে আরো ভালো ভালো বড়ো-বড়ো মানচিত্র আছে। সেগুলো খুঁজে দেখছি।"

কিন্তু সেগুলোর মধ্যেও সোনার কেল্লার হদিশ পাওয়া গেল না। শেষটায় আরো অনেক পুরনো মানচিত্র ঘেঁটে স্ট্রোম্‌বার্গের সোনার কেল্লার খোঁজ তারা পেল। কিন্তু দেখা গেল সেখান থেকে সেটা হাজার মাইল দূরে।

লোকটি প্রশ্ন করল, "কী করে সেখানে যাই।"

দৈত্য বলল, "আমার হাতে এখন ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। যতটা পারি জায়গাটার কাছাকাছি তোকে নিয়ে যাচ্ছি। তার পর কিন্তু বাচ্চাকে খাওয়াবার জন্যে আমায় ফিরতেই হবে।" এই-না বলে দৈত্য তাকে সোনার কেল্লার একশো মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, "এখন এটুকু পথ একলাই যেতে পারবি।"

গ্রিম—২-৮

দৈত্য ফিরে যেতে রাতের পর রাত দিনের পর দিন হেঁটে লোকটি পৌঁছল স্ট্রোমবার্গের সোনার কেল্লায়। কেল্লাটা ছিল এক কাঁচের পাহাড়ের ওপর। দাঁড়কাক-রাজকন্যে সেটার চার দিকে জুড়িগাড়িতে অনেকবার ঘুরে শেষটায় সেঁধুতে পেরেছিল। রাজকন্যেকে কেল্লার মধ্যে দেখতে পেয়ে লোকটির খুব আনন্দ হল। কিন্তু যতবারই কাঁচের পাহাড়টায় উঠতে যায় ততবারই সে যায় পিছলে পড়ে। শেষটায়

যখন দেখল কাঁচের পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব তখন বিষণ্ণ মনে সে বলে উঠল, "আমি এখানে থেকে রাজকন্যের জন্যে অপেক্ষা করব।" এই-না বলে সেখানে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে সে অপেক্ষা করে রইল এক বছর। প্রতিদিনই রাজকন্যেকে সে দেখে দুর্গের চার ধারে জুড়িগাড়িতে ঘুরে বেড়াতে। শত চেষ্টা করেও নিজে পিছল পাহাড়টায় উঠতে পারে না।

একদিন সে তার কুঁড়েঘর থেকে দেখে তিনটে ডাকাত নিজেদের মধ্যে ভীষণ মারামারি করছে। কী নিয়ে তাদের ঝগড়া-মারামারি জানার জন্য সে গেল তাদের কাছে।

এক ডাকাত বলল তার কাছে এমন একটা লাঠি আছে যেটার এক বাড়িতে যে-কোনো দরজা খুলে যায়। আর একজন বলল, তার কাছে এমন একটা আলখাল্লা আছে যেটা পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়। তৃতীয়জন বলল, এমন একটা ঘোড়া সে ধরেছে, যেটায় চেপে যেখানে খুশি যাওয়া যায়—এমন-কি, কাঁচের পাহাড়টার ওপরেও। তারা স্থির করতে পারছে না—প্রত্যেকে একটা করে জিনিস নেবে, নাকি সবগুলোই সবাই মিলে ভোগ-দখল করবে।

লোকটি বলল, তাদের সম্পত্তির গুণাগুণ সে যাচাই করে দেখবে আর সন্তুষ্ট হলে সেগুলোর বিনিময়ে তাদের দেবে এমন জিনিস, সোনাদানা দিয়ে যেটা কেনা যায় না। তার কথায় রাজি হয়ে তাকে তারা চড়তে দিল ঘোড়াটায় আর তার পর তার হাতে সেই লাঠি দিয়ে তার কাঁধে ঝুলিয়ে দিল আলখাল্লাটা। সঙ্গে-সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তার পর সেই লাঠি দিয়ে তাদের দারুণ পিটিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "হতভাগার দল! এই নে তোদের সম্পত্তির দাম।"

ঘোড়ায় চড়ে কাঁচের পাহাড়ের উপর উঠে সে দেখে কেল্লার দরজা বন্ধ। কিন্তু তার লাঠির এক বাড়িতেই দরজাটা খুলে গেল। তখন ভিতরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক হলঘরে পেঁছে সে দেখে এক তরুণী সেখানে বসে আর তার সামনে রয়েছে সোনার পাত্রে আঙুর-রস। আলখাল্লা পরা ছিল বলে মেয়েটি তাকে দেখতে পেল না। কিন্তু কাছে গিয়ে সোনার পাত্রে সে সেই আংটিটা ফেলতেই মেয়েটি বলে উঠল, "এটা যে দেখছি আমার আংটি! যে-লোক আমাকে মুক্তি দেবে নিশ্চয়ই সে এখানে এসেছে।"

মেয়েটি সমস্ত কেল্লা তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেল না। কারণ লোকটি তখন কেল্লার বাইরে গিয়ে আলখাল্লা খুলে বসেছিল তার ঘোড়ার পিঠে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল আর লোকটি তখন ঘোড়া থেকে নেমে তাকে করল আলিঙ্গন। রাজকন্যে তাকে চুমু খেয়ে বলল, "আমায় তুমি জাদুমুক্ত করেছ। কাল আমাদের বিয়ে।"

নীল বাতি

এক সময় এক সৈনিক বহু বছর এক রাজার কাছে মন-প্রাণ দিয়ে চাকরি করে। লড়াইতে অনেকবার সে আহত হয়। কিন্তু লড়াই শেষ হবার পর রাজা তাকে বললেন, "তোমাকে আর দরকার নেই। এবার বাড়ি যাও। আর তোমাকে বেতন দিতে পারব না। কারণ বসে-বসে কাউকে আমি খাওয়াই না।"

বেচারা সৈনিক ভেবে পেল না কী করে সে বাঁচবে। বাড়ি ফেরার পথে সে পৌঁছল এক গহন বনে। অন্ধকার হলে পর সে দেখল একটা কুঁড়েঘর থেকে আলো বেরুচ্ছে। সেই কুঁড়েঘরে থাকত এক ডাইনি। ডাইনিকে সে বলল, "একটু শোবার জায়গা আর কিছু খাবার-দাবার দাও। নইলে মরে যাব।"

হো-হো করে হেসে ডাইনি বলল, "বেকার সৈনিককে বিনা পয়সায় কে খাবার-দাবার দেয় শুনি? কিন্তু আমার কথামতো কাজ করলে তোমাকে এখানে থাকতে আর খেতে-দেতে দেব।"

সৈনিক প্রশ্ন করল, "আমায় কি করতে হবে?"

"কাল আমার বাগানটা কুপিয়ে দিয়ো।"

রাজি হয়ে সৈনিক পরের দিন খুব খাটল। কিন্তু সন্ধের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারল না।

ডাইনি বলল, "দেখছি আজ রাতের মধ্যে আর কাজ করতে পারবে না। কিন্তু একটা গাছের গুঁড়ি আমার জন্যে ফালা-ফালা করে কেটে দিলে আর-একটা রাত তোমায় থাকতে দেব।"

পরের দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সৈনিক কাঠ চেলা করার পর ডাইনি তাকে বলল আর-একটা রাত থাকতে।

"কাল তোমাকে একটা হালকা কাজ দেব। আমার বাড়ির পেছনে একটা শুকনো কুয়ো আছে। সেটার মধ্যে আমার নীল বাতিটা পড়ে গেছে! সেটা কখনো নেভে না। বাতিটা তোমায় তুলে আনতে হবে।"

পরদিন বুড়ি ডাইনি তাকে কুয়োর কাছে নিয়ে গিয়ে একটা ঝুড়িতে

করে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দিল। নীল বাতিটা নিয়ে সে ইশারায় বলল তাকে টেনে উপরে তুলতে। ডাইনি তাকে টেনে তুলল আর কুয়োর মুখে সে পৌঁছবার পর বাতিটা নেবার জন্য ডাইনি বাড়িয়ে দিল তার হাত। ডাইনির কুমতলব বুঝতে পেরে সৈনিক বলল, "যতক্ষণ-না দু পায়ে মাটির ওপর দাঁড়াচ্ছি ততক্ষণ বাতিটা তোমায় দেব না।" তার কথা শুনে রাগে গর্‌গর্‌ করতে-করতে আবার তাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে ডাইনি চলে গেল।

কুয়োর নীচটা ভিজে আর নরম ছিল বলে সৈনিকের লাগল না। নীল বাতিটা জ্বলতে লাগল। কিন্তু তাতে আর তার লাভ কী? সে বুঝল তাকে মরতেই হবে। খানিকক্ষণ খুব মনমরা হয়ে সে বসে রইল। তার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখে অর্ধেক তামাক-ভরা তার পাইপটা রয়েছে। "এটাই আমার জীবনের শেষ আনন্দ"—এই-না বলে নীল বাতি দিয়ে সেটা ধরিয়ে সে টানতে শুরু করে দিল। পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠে যখন বাতাসে ভাসছে এমন সময় হঠাৎ কালো একটা বামন হাজির হয়ে বলল :

"স্যার, আপনার কী হুকুম?"

অবাক হয়ে সৈনিক তাকে বলল, "তোমায় হুকুম দিতে যাব কেন?"

বামন বলল "আপনি যা হুকুম দেবেন তাই আমাকে করতে হবে।"

সৈনিক বলল, "ভালো—আমাকে কুয়ো থেকে বার কর।"

বামন তার হাত ধরে একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে চলল। নীল বাতিটা সঙ্গে নিতে সে ভুলল না। যেতে-যেতে বামন তাকে দেখাল ডাইনির লুকনো রাশি-রাশি ধনরত্ন। সেখান থেকে যত পারল তত মোহর সৈনিক ভরল তার পকেটে।

উপরে উঠে এসে বামনকে সে বলল, "ডাইনির হাত-পা বেঁধে হাকিমের কাছে নিয়ে চল।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা হুলো বেড়ালের পিঠে চেপে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে তার পাশ দিয়ে ডাইনি হল অদৃশ্য। বামন বলল, "এতক্ষণে ডাইনি ফাঁসিকাঠে লটকাচ্ছে।"

তার পর বামন বলল, "স্যার, আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

সৈনিক বলল, "এখন আর তোমার কাজ নেই। বাড়ি যেতে পার। কিন্তু তৈরি থেকো—ডাকলেই যেন আসো।"

বামন বলল, "ডাকবার দরকার নেই, স্যার। নীল বাতিটা দিয়ে আপনি পাইপ ধরালেই হাজির হব।" এই-না বলে বামন হল অদৃশ্য।

শহরে ফিরে সৈনিক উঠল সব চেয়ে ভালো হোটেলে। কিনল দামী-দামী পোশাক। আর আদেশ দিল তার জন্য একটা ঘর আসবাবপত্র দিয়ে খুব ভালো করে সাজাতে। ঘরটা সাজানো-গোছানো হবার পর কালো বামনকে ডেকে সৈনিক বলল, "মন-প্রাণ দিয়ে রাজার

কাজ আমি করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন উপোস করে মরতে। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।"

বামন প্রশ্ন করল, "কী আমায় করতে হবে, স্যার?"

"রাতে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যেকে নিয়ে এসো। সে আমার দাসী হয়ে থাকবে।"

বামন বলল, "কাজটা আমার কাছে সহজ কিন্তু আপনার পক্ষে বিপজ্জনক।"

মাঝরাতের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সৈনিকের ঘরের দরজা খুলে গেল আর বামন নিয়ে এল রাজকন্যাকে।

সৈনিক বলল, "এলে তা হলে! এক্ষুনি ঝাঁটা এনে ঘর ঝাঁট দাও।" ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ হলে আরাম-কেদারায় বসে পা বাড়িয়ে দিয়ে রাজকন্যেকে সে বলল জুতো খুলতে। রাজকন্যে জুতো খোলার পর সেগুলো তার মুখে ছুঁড়ে মেরে সৈনিক বলল পালিশ করে দিতে। চোখ আধবুজে, নিঃশব্দে, কোনো আপত্তি না করে সৈনিকের সব হুকুম তামিল করে গেল রাজকন্যে। ভোরের মোরগ ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে বামন তাকে আবার রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিল।

পরদিন সকালে রাজার কাছে গিয়ে রাজকন্যে জানাল, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। বলল, "বিদ্যুৎগতিতে নানা পথ দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এক সৈনিকের ঘরে। দাসীর মতো তার কাজ করতে আমি বাধ্য হই। আমাকে ঘর ঝাঁট দিতে হয়, জুতো বুরুশ করতে হয়। ব্যাপারটা স্বপ্ন হলেও আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে বাস্তবিকই সে-সব কাজ যেন করেছি।"

রাজা বললেন, "এটা স্বপ্ন না হতেও পারে। তোমার পকেটে মটর-দানা ভরে একটা ফুটো করে রেখো। আবার তোমাকে নিয়ে যাওয়া হলে মটর-দানাগুলো পথে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তাইতে পথ চেনা যাবে।"

অদৃশ্য থেকে বামন রাজার কথাগুলো শুনল। ঘুমন্ত রাজকন্যেকে আবার যখন সে নিয়ে এল পথে মটর-দানাগুলো পড়েছিল বটে—কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। কারণ ধূর্ত বামন আগে থেকেই সব পথে ছড়িয়ে দিয়েছিল মটর-দানা। ভোরের মোরগ-ডাক পর্যন্ত রাজকন্যেকে আবার করতে হল দাসীর কাজ।

পরদিন রাজা তাঁর লোকজনদের পাঠালেন। কিন্তু তাদের ঘোরাঘুরিই সার হল। কারণ প্রত্যেক পথেই তারা দেখল মটর-দানা ছড়ানো। তাই তারা নিজেরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "গত রাতে নিশ্চয়ই মটর-দানা বৃষ্টি হয়েছিল।"

রাজা বললেন, "আর-একটা ফন্দি আঁটা দরকার। ঘুমতে যাবার সময় জুতো পরে শুয়ো। যেখানে তোমায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে একপাটি জুতো রেখে এসো। তা হলে জায়গাটা আমি খুঁজে বার করতে পারব।"

রাজার কথাগুলো বামন শুনেছিল। তাই সে-রাতে রাজকন্যেকে আনার আদেশ পেয়ে সৈনিককে সে বলল, "এবার কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। আপনার ঘরে জুতোটা পাওয়া গেলে বিপদে পড়তে পারেন।"

সৈনিক বলল, "যা বললাম তাই কর।"

তৃতীয় রাতেও রাজকন্যে এসে দাসীর কাজ করল। কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আগে একপাটি জুতো রাজকন্যে রাখল বিছানার তলায় লুকিয়ে। পরদিন সকালে মেয়ের জুতোর জন্য রাজা গোটা শহর খানাতল্লাসি করালেন। সেটা পাওয়া গেল সৈনিকের ঘরে। বামনের অনুরোধে সৈনিক চট্‌পট্‌ সরে পড়েছিল শহর থেকে। কিন্তু রাজার লোক-লস্কর তাকে ধরে হাজতে পুরল। পালাবার তাড়াহুড়োয় সে তার দুটো সব চেয়ে দামী সম্পত্তি সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছিল—সেই নীল বাতি আর ডাইনির মোহরগুলো। তার সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকটা মোহর। শেকল-বাঁধা অবস্থায় সে দাঁড়িয়েছিল হাজতের জানলার সামনে। এমন সময় সে দেখল তার এক পুরনো বন্ধুকে যেতে। জানলার শার্সিতে টোকা দিয়ে তাকে কাছে ডেকে সৈনিক বলল, "হোটেলে আমি একটা ছোট্টো পুঁটলি ফেলে এসেছি। সেটা এনে দিলে কয়েকটা মোহর দেব।" তার বন্ধু দৌড়ে গিয়ে পুঁটলিটা এনে দিল। সে চলে যেতেই নীল বাতি দিয়ে পাইপটা ধরাল সৈনিক। আর সঙ্গে-সঙ্গে হাজির হল তার বন্ধু সেই ছোট্টো কালো বামন।

বামন বলল, "ভয় পাবেন না, স্যার। যেখানেই ওরা আপনাকে নিয়ে যাক-না কেন, শান্তভাবে যাবেন। কিন্তু নীল বাতিটা সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।"

পরদিন হাকিম তার বিচার করলেন। কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। ফাঁসিকাঠের কাছে তাকে নিয়ে যাবার আগে রাজাকে সৈনিক বলল, "আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে।"

রাজা প্রশ্ন করলেন, "কী অনুরোধ।"

"যাবার সময় পথে আমার পাইপটা একবার টানতে চাই।"

রাজা বললেন, "একবার কেন, তিনবার পাইপ টানতে পার। কিন্তু মনে রেখো তাতে প্রাণ তোমার বাঁচবে না।"

সৈনিক তার পাইপ বার করে নীল বাতি দিয়ে ধরাল। আর ধোঁয়ার প্রথম কুণ্ডলি বাতাসে ভাসার আগেই একটা মুগুর হাতে নিয়ে তার সামনে হাজির হয়ে বামন বলল, "কী হুকুম, স্যার?"

"মিথ্যেবাদী হাকিমকে মেরে মাটিতে পেড়ে ফেল। রাজাকেও রেহাই দিয়ো না। আমার সঙ্গে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছেন।"

চার পাশের লোকদের ভীষণ ভাবে মুগুর পিটে বামন তাদের মাটিতে পেড়ে ফেলল। কাতরাতে-কাতরাতে রাজা বুকে হাঁটতে লাগলেন আর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সৈনিকের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে দিলেন তাঁর রাজত্ব।

তিন পাখি

কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের দেশে রাজত্ব করতেন কয়েকটি ক্ষুদে-ক্ষুদে রাজা। তাঁদের একজন থাকতেন কেণ্টারবার্গের চুড়োয় সুন্দর এক কেল্লায়। শিকারে তাঁর ছিল দারুণ শখ। সেই পাহাড়ের নীচে তিন বোন গোরু চরাত। শিকার করার জন্য একদিন রাজা নেমে এলেন তাঁর দুর্গ থেকে। শিকারীর দলের সঙ্গে রাজাকে আসতে দেখে বড়ো বোন অন্য দুজনকে চেঁচিয়ে বলল, "রাজাকে দেখছিস? এই রাজা ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করব না।"

মেজো বোন ছিল পাহাড়ের অন্য পাশে। সে চেঁচিয়ে বলল, "রাজার ডাইনে যে লোকটি রয়েছে তাকে দ্যাখ। তাকে না পেলে জীবনে বিয়ে করব না।"

ছোটো বোন তখন চেঁচিয়ে উঠল, "রাজার বাঁয়ে যে রয়েছে তাকেই আমার পছন্দ। তাকে ছাড়া আমিও অন্য কোনো লোককে বিয়ে করব না।"

এরা দুজন ছিল রাজার মন্ত্রী। তিন বোনের প্রত্যেকটি কথা রাজা শুনেছিলেন। শিকার থেকে ফিরে তিনি আদেশ দিলেন তিন বোনকে কেল্লায় নিয়ে আসতে। তারা হাজির হতে রাজা প্রশ্ন করলেন, কী তারা বলাবলি করছিল। তারা কিন্তু নিজেদের কথা রাজাকে বলতে চাইল না। রাজা তখন বড়ো বোনকে প্রশ্ন করলেন, "আমাকে বিয়ে করতে চাও?"

সেটাই তার অন্তরের কথা বলে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।" আর কিছু-দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

অন্য দু বোনও বিয়ে করল রাজার দুই মন্ত্রীকে। তিন বোনই ছিল খুব রূপসী। বিশেষ করে রানী। তার ছিল ভারি সুন্দর সোনালী চুল। রানীর দুই বোনের ছেলেপুলে ছিল না। একবার রাজা অনেক-দিনের জন্য বিদেশ যাবার আগে এই দুই বোনকে বললেন কেল্লায় রানীর কাছে থাকতে। রানীর ছিল ফুটফুটে ছোট্টো এক ছেলে। নিঃসন্তান বোনেদের তাই খুব হিংসে ছিল। তারা স্থির করল ছেলেটিকে মেরে ফেলবে। তাই একদিন ছেলেটিকে তারা নদীতে দিল ভাসিয়ে। আর তাকে ভাসিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে গান গাইতে গাইতে ছোট্টো একটি পাখি গেল আকাশ দিয়ে উড়ে :

"মরতে প্রস্তুত হলেও
উত্তরটা চাই।
পদ্মফুলের দেশে চলেছি উড়ে।
তুমিই কি সেই ছোট্টো সাহসী ছেলে ?"

গানটা শুনে দারুণ ভয় পেয়ে দুই বোন সেখান থেকে দৌড়ে চলে গেল।

রাজা ফিরতে তারা তাঁকে বলল এক ডাইনি রাজপুত্তুরকে কুকুর দিয়েছে। খবরটা শুনে রাজার খুব দুঃখ হল। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বেস তিনি বললেন, "যা কিছু ঘটে তা ভালোর জন্যই ঘটে।"

নদীর কাছেই থাকত এক জেলে আর জেলেনী। ছোট্টো ছেলেটিকে যেতে দেখে জেলে তাকে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে আনল। তাদের ছেলেপুলে ছিল না। তাই তাকে তারা মানুষ করতে লাগল।

এক বছর পর আবার রাজাকে যেতে হল বিদেশে। রানীর কোলে তখন এল দ্বিতীয় ছেলে। শয়তান দুই বোন আবার নদীতে ভাসিয়ে দিল সেই ছেলেকে। আর আবার সেই ছোট্টো পাখিটা গান গাইতে গাইতে আকাশ দিয়ে গেল উড়ে :

"মরতে প্রস্তুত হলেও
উত্তরটা চাই।
পদ্মফুলের দেশে চলেছি উড়ে,
তুমিই কি সেই ছোট্টো সাহসী ছেলে ।"

রাজা ফিরতে আবার সেই মিথ্যে কাহিনী তারা তাঁকে বলল।

জেলে আবার মেজো ছেলেটিকে জল থেকে তুলে এনে মানুষ করতে লাগল বড়োটির সঙ্গে।

এক বছর পর রাজাকে তৃতীয়বারের জন্য যেতে হল বিদেশে। আর অবাক কাণ্ড—রানীর কোলে তখন এল তৃতীয় এক শিশু। এবার আর ছেলে নয়—ভারী সুন্দরী ছোট্টো একটি মেয়ে। শয়তান দুই বোন তাকেও দিল নদীতে ভাসিয়ে। আর আগের মতোই আবার সেই ছোট্টো পাখিটা গান গাইতে গাইতে আকাশ দিয়ে গেল উড়ে :

"মরতে প্রস্তুত হলেও
উত্তরটা চাই।
পদ্মফুলের দেশে চলেছি উড়ে ।
তুমিই কি সেই ছোট্টো সাহসী মেয়ে ?"

মেয়েটিকেও জেলে জল থেকে তুলে এনে মানুষ করতে লাগল অন্য দুটি ছেলের সঙ্গে।

রাজা ফিরতে শয়তান বোনেরা আবার সেই মিথ্যে কাহিনী তাঁকে বলল। এবার তারা জানাল ছোট্টো মেয়েটিকে ডাইনি একটা বেড়াল করে দিয়েছে। সব শুনে রাজা ভীষণ রেগে গেলেন। সাবধান হয় নি বলে জোর গলায় রানীকে লাগলেন দুষতে। এমন-কি, তাঁর সন্দেহ হল রানী একটা বজ্জাত মেয়েমানুষ। তাই আদেশ দিলেন রানীকে হাজতে পুরতে।

ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে উঠল। একদিন বড়ো ছেলে গেল তার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে মাছ ধরতে। তাদের একজন বলে উঠল, "ভাগ এখান থেকে। তুই তো কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। তোর সঙ্গে আমরা মিশব না।"

মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে বুড়ো জেলেকে সে প্রশ্ন করল, সত্যিই সে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে কি না। জেলে বলল, জল থেকে তাকে সে তুলে এনেছিল। তাই শুনে বড়ো ছেলে বলল, সে যাবে তার বাবার খোঁজে। বুড়ো জেলে অনেক করে তাকে বারণ করল তার বাড়ি থেকে চলে যেতে। কিন্তু কোনো কথায় কান না দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। অনেক মাইল হাঁটার পর সে পৌঁছল বিরাট এক নদীর সামনে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এক বুড়ি মাছ ধরছিল।

তাকে সে বলল, "শুভদিন ঠান্‌দি, যেভাবে মাছ ধরার চেষ্টা করছ তাতে একটা মাছ ধরতে তোমার অনেক সময় লাগবে।"

বুড়ি বলল, "বাবাকে খুঁজে বার করতে তোমারও জন্মযুগ লেগে যাবে। নদীটা কী করে পেরুবে শুনি?"

বড়ো ছেলে বলল, "তা তো জানি না।"

বুড়ি তখন পিঠে করে তাকে নদী পার করে দিল। তার পর বহু বছর ধরে সে খুঁজে চলল তার বাবাকে।

এক বছর পরে দ্বিতীয় ছেলে বেরুল তার ভাইয়ের খোঁজে। সেও পেঁ ৗছল সেই নদীর তীরে। আর তাকেও নদী পার করে দিল সেই বুড়ি।

ছোটো মেয়েটি বাড়িতে একলা পড়ে গেল। ভাইরা না থাকায় কিছুই আর তার ভালো লাগে না। তাই জেলেকে বলে সে বেরুল ভাইদের খোঁজে। আর সেই বিরাট নদীর তীরে পেঁ ৗছে বুড়িকে সে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই অনেক মাছ ধরতে পারবে।"

তার কথায় খুব খুশি হয়ে বুড়ি তাকে নদী পার করে দিল। তার পর তাকে একটা বার্চগাছের ডাল দিয়ে বলল, "বাছা, সোজা যেয়ো। পথে তোমার সঙ্গে বিরাট একটা কালো কুকুরের দেখা হবে। ভয় না পেয়ে তার পাশ দিয়ে চলে যাবে। তাকে দেখে হেসো না কিংবা তাকে লাথি মেরো না। তার পর পেঁ ৗছবে বিরাট এক কেল্লায়। সেটার দরজা খোলা। দরজা পেরুবার সময় বার্চগাছের ডালটা ফেলে দেবে। তার পর সোজা যাবে হেঁটে। অন্য পাশে পেঁ ৗছে দেখবে একটা মজে-আসা কুয়ো। সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক দিনকার একটা গাছ। সেই গাছের ডালে ঝুলছে পাখির একটা খাঁচা। কুয়ো থেকে এক গেলাস জল আর খাঁচাটা নিয়ে যে পথ দিয়ে গিয়েছিলে সেই পথে ফিরবে। তার পর বার্চগাছের ডালটা কুড়িয়ে নিয়ে কালো কুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেটাকে এলোপাথাড়ি মেরে তার মুখটা কেটে দেবে।"

মেয়েটি বুড়ির কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করল। আর ফিরতি পথে দেখা গেল তার হারিয়ে-যাওয়া দু ভাই-এর। একসঙ্গে তারা ফিরে চলল। যেতে-যেতে সেই কুকুরটার দেখা পেতে বার্চগাছের ডাল দিয়ে তার মুখে সজোরে তাক্কা মারল। আর মারবার সঙ্গে-সঙ্গে

কুকুরটা হয়ে গেল সুন্দর এক রাজপুত্তুর। রাজপুত্তুরও চলল তাদের সঙ্গে-সঙ্গে। যেতে-যেতে তাদের সঙ্গে দেখা হল সেই বুড়ির। মাছ ধরতে-ধরতে তাদের জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। তাদের দেখে বুড়ি খুব খুশি হল। আর তার পর নদীটা তাদের পার করে দিয়ে চলে গেল। কারণ সে তখন জাদুর মায়া থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

পালিত ছেলেমেয়েরা আবার তার বাড়িতে ফিরে আসায় বুড়ো জেলের আনন্দ আর ধরে না। পাখির খাঁচাটা দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে মনের আনন্দে সেখানে তাদের দিন কাটতে লাগল। দ্বিতীয় ছেলের ছিল শিকারের খুব সখ। একদিন বন্দুক নিয়ে সে বনে গেল শিকার

করতে। ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য বসে সে তার বাঁশি বাজাতে শুরু করল। রাজাও সেদিন তাঁর শিকারীদের নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন। বাঁশির শব্দ শুনে দূত পাঠিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর বনে শিকার করার অনুমতি তাকে কে দিয়েছে।

ছেলেটি বলল, "কেউ না।"

"কে তুমি ?"

"আমি বুড়ো জেলের ছেলে।"

"কিন্তু তার তো ছেলেপুলে নেই।"

"আমার কথায় বিশ্বাস না হলে আমার সঙ্গে তার কাছে চল।"

জেলের কাছে তারা গেল। জেলেকে রাজা বললেন সব কথা তাঁকে বলতে। কিন্তু জেলে উত্তর দেবার আগেই খাঁচার পাখিটা গেয়ে চলল ঃ

"মা বেচারি জেলে বন্দী।
রাজা, তোমার ছেলেমেয়েদের
হিংসুটে বোনেরা
ভাসিয়েছিল নদীর জলে।
এই দয়ালু জেলে
তাদের করেছে মানুষ।"

পাখির গান শুনে সবাই ভীষণ অবাক হয়ে গেল। দেয়াল থেকে তখন পাখির খাঁচাটা তুলে নিয়ে জেলে আর তিন ছেলেমেয়েদের রাজা বললেন তাঁর সঙ্গে কেল্লায় যেতে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আদেশ দিলেন রানীকে হাজত থেকে মুক্তি দিতে। মনের দুঃখে রানী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মেয়ে তাকে দিল সেই কুয়ো-থেকে আনা এক গেলাস জল। সেটা খেয়ে দেখতে দেখতে রানী সুস্থ হয়ে উঠল। তার পর দুই শয়তান বোনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হল সেই রাজপুত্তুরের। আর তার পর থেকে সবাই রইল মনের আনন্দে।

জীবন-জল

এক রাজার একবার খুব অসুখ করে। কেউই ভাবে নি তিনি আবার ভালো হয়ে উঠবেন। তাঁর তিন ছেলে মনের দুঃখে কেল্লার বাগানে কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। একদিন সেখানে এক বুড়ো লোকের সঙ্গে তাদের দেখা। বুড়ো জানতে চাইল কেঁদে-কেঁদে তারা ঘুরে বেড়ায় কেন। তারা জানাল তাদের বাবার খুব অসুখ, প্রাণের আশা নেই। বুড়ো বলল, "রাজার অসুখের ওষুধ আমি জানি। সেটার নাম জীবন-জল। সেটা খেলে তিনি সেরে উঠবেন। কিন্তু জীবন-জল পাওয়া খুব কঠিন।"

বড়ো ছেলে বলল, "আমি সেটা খুঁজে বার করব।" রাজার কাছে সে গেল জীবন-জলের খোঁজে বেরুবার অনুমতি নিতে।

রাজা বললেন, "না—তোমাকে যেতে দেব না। তাতে অনেক বিপদ। তার চেয়ে আমার মরাই ভালো।"

কিন্তু ছেলের কাকুতি-মিনতিতে শেষটায় তিনি মত দিলেন। রাজপুত্তুর মনে মনে ভাবল, 'জীবন-জল খুঁজে পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই বাবার সব চেয়ে প্রিয়পাত্র আমি হব আর রাজত্বটা আমায় তিনি দেবেন।'

এই-না ভেবে সে বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়ায় চড়ে খানিকটা যাবার পর পথের পাশে এক বামনের সঙ্গে তার দেখা।

বামন তাকে বলল, "অমন হন্তদন্ত হয়ে চলেছ কোথায়?"

রাজপুত্তুর উদ্ধতভাবে বলল, "তুই তো বেজায় বেহায়া দেখছি। আমি কোথায় চলেছি সে-খোঁজে তোর দরকার কী?" এই-না বলে

ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলে গেল।

তাইতে ভীষণ চটে গেল বামন। মনে-মনে বলল, 'ওর কখনো ভালো হবে না।'

যেতে যেতে রাজপুত্তুর পৌঁছল এক গিরিসঙ্কটে। যতই সে এগোয় ততই সংকীর্ণ হয়ে আসে পথটা। শেষে এক জায়গায় পাহাড় দুটো মিশতে এক-পাও সে আর এগুতে পারল না। ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে বা জিনের উপর নড়তে-চড়তেও পারল না সে।

অসুস্থ রাজা ছেলের ফেরার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। কিন্তু ছেলে তাঁর ফিরল না।

তখন মেজো ছেলে বলল, "বাবা জীবন-জলের খোঁজে আমাকে বেরুবার অনুমতি দাও।" মনে মনে ভাবল, 'ভাই মরে গিয়ে থাকলে রাজত্বটা আমি পাব।'

প্রথমে রাজা কিছুতেই অনুমতি দিতে চান নি। কিন্তু ছেলের ঝুলোঝুলিতে শেষটায় মত দিলেন। বড়ো ভাই যে-পথ ধরে গিয়েছিল মেজো রাজপুত্তুরও চললে সেই পথে। তার সঙ্গেও দেখা হল সেই বামনের আর একই প্রশ্ন বামন তাকে করল।

রাজপুত্তুর বলল, 'বেঁটে বাঁটকুল, তোর যে বড়ো বাড় বেড়েছে দেখছি! আমি কোথায় চলেছি সে খোঁজে তোর কী দরকার?" এই-না বলে পিছনে না তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলে গেল।

তাইতে ভীষণ চটে মনে মনে বামন বলল, 'ওর কখনো ভালো হবে না।' মেজো রাজপুত্তুরও এক গিরিসঙ্কটে আটকা পড়ল। সেখান থেকে না পারল ফিরতে, না পারল এগুতে।

মেজো ছেলেও না ফেরায় ছোটো ছেলে চাইল যেতে। আর শেষটায় তাকেও যাবার অনুমতি দিলেন রাজা।

পথে তার সঙ্গেও দেখা হল সেই বামনের। বামন তাকে যখন প্রশ্ন করল হন্তদন্ত হয়ে কোথায় সে চলেছে। ছোটো রাজপুত্তুর ঘোড়ার রাশ টেনে বলল, "আমার বাবার খুব অসুখ। তাঁর জন্যে জীবন-জলের খোঁজে চলেছি।"

বামন প্রশ্ন করল, "কোথায় সেটা পাবে জান?"

রাজপুত্তুর বলল, "না।"

বামন বলল, "তোমার ব্যবহার ভারি ভদ্র। ভাইদের মতো তোমার

স্বভাব উদ্ধত নয়। তাই তোমায় বলছি জীবন-জল কোথায় আছে।— জাদুর মায়ায় ঘেরা আছে একটা কেল্লা। সেখানকার আঙিনার একটা ফোয়ারা থেকে টগ্‌বগ্‌ করে সেটা বেরোয়। আমি তোমাকে একটা লোহার ডাণ্ডা আর দুটো রুটি দিচ্ছি। এগুলো সঙ্গে না থাকলে সেই কেল্লার মধ্যে তুমি ঢুকতে পারবে না। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে লোহার দরজায় তিনবার তুমি ঘা দিয়ো। তা হলেই সেটা হাট হয়ে খুলে যাবে। ভেতরে দেখবে দুটো সিংহ পাহারা দিচ্ছে। তাদের একটা করে রুটি দিয়ো। তা হলেই তারা চুপচাপ থাকবে। তার পর বারোটা বাজার আগে চট্‌পট্‌ জীবন-জল নিয়ে ফিরো। নইলে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তুমি আর বেরুতে পারবে না।”

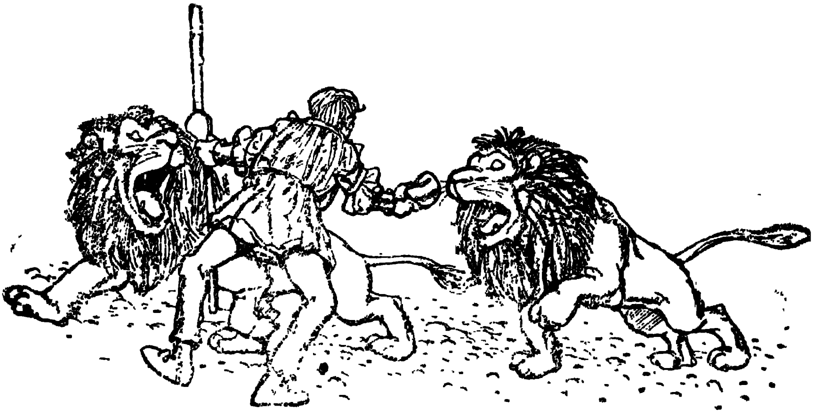

তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে, লোহার ডাণ্ডা আর রুটি দুটো নিয়ে ছোটো রাজপুত্তুর আবার ঘোড়া ছোটাল।

জাদুর কেল্লায় পৌঁছে ছোটো রাজপুত্তুর দেখল বামন যা-যা বলছিল সব-কিছু অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যেতে। লোহার ডাণ্ডার তিন ঘায়ে দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। তার পর সিংহদের রুটি দুটো দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরে গিয়ে সে দেখল জাদুর মায়ায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে রাজপুত্তুররা। তাদের আঙুলের আংটিগুলো সে খুলে নিল। সেখানে পড়েছিল একটা তরোয়াল আর একটা রুটি। সেগুলোও নিল সে।

তার পর গেল আর-একটা ঘরে। সেখানে ছিল রূপসী এক মেয়ে। মেয়েটি তাকে চুমু খেয়ে বলল—সে তার মুক্তিদাতা ; এক বছর পরে ফিরলে তাকে সে বিয়ে করবে আর তার সঙ্গে বসবে একই সিংহাসনে। জীবন-জলের ফোয়ারা কোথায় আছে জানিয়ে মেয়েটি বলল বারোটা বাজার আগে চট্‌পট্‌ সেই জল সংগ্রহ করে নিতে।

সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে শেষটায় সে পৌঁছল এক শোবার ঘরে। সেখানে দুধের মতো সাদা তুল্‌তুলে একটা বিছানা পাতা। সেটা দেখে সেখানে শুয়ে খানিক বিশ্রাম নেবার লোভ সে সামলাতে পারল না। তাই বিছানাটায় সে শুলো আর শোবার সঙ্গে-সঙ্গে পড়ল ঘুমিয়ে। ঘুম ভাঙতে সে শুনতে পেল পৌনে বারোটার ঘণ্টা বাজছে। দারুণ ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে ফোয়ারটার কাছে সে ছুটে গেল। পাশেই ছিল একটা গামলা। সেই গামলায় খানিকটা জল ভরে এক দৌড়ে সে যখন লোহার দরজাটার কাছে পৌঁছল তখন ঢং-ঢং করে বারোটা বাজছে। এক লাফে সে বাইরে বেরিয়ে এল আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

ফিরতি পথে সেই বামনের সঙ্গে আবার তার দেখা। সেই তরোয়াল আর রুটি দেখে বামন বলল, "ওগুলো এনে খুব ভালো করেছ। তরোয়ালটা দিয়ে শত্রুর সৈন্যবাহিনীকে তুমি কচুকাটা করতে পারবে। রুটিটা কখনো শেষ হবে না।"

ভাইদের সঙ্গে না নিয়ে ছোটো রাজপুত্তুরের কিন্তু দেশে ফিরতে মন চাইল না। তাই সে বলল, "ভাই বামন, আমার ভাইরা কোথায়, জান ? আমার আগে জীবন-জলের খোঁজে তারা বেরিয়েছিল। কিন্তু ফেরে নি।"

বামন বলল, "দুটো পাহাড়ের মাঝখানে তারা আটকে আছে। তারা ভারি উদ্ধত। আমায় তারা অপমান করেছিল। তাই সম্মোহন-মন্ত্র দিয়ে তাদের আমি বন্দী করে রেখেছি।"

তাদের মুক্তি দেবার জন্য বামনকে সে খুব কাকুতি-মিনতি করতে শেষটায় বামন রাজি হল। কিন্তু তাকে সে বলল সাবধানে থাকতে। কারণ তাদের ভাইদের স্বভাব খুব খারাপ।

ভাইদের সঙ্গে দেখা হতে ছোটো রাজপুত্তুর খুব খুশি হয়ে তাদের জানাল, কী ভাবে এক রূপসী রাজকন্যেকে জাদুমুক্ত করে এক গামলা

জীবন-জল সে এনেছে। বলল, সেই রাজকন্যে কথা দিয়েছে এক বছর পরে তাকে বিয়ে করবে।

তার পর একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তারা পৌঁছল এক দেশে। সেখানে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ আর ভীষণ যুদ্ধ চলছে। কোনো দিকে কোনো উপায় না দেখে সেখানকার রাজা হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন।

খবর শুনে ছোটো রাজপুত্তুর রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে দিল সেই রুটি আর তরোয়ালটা। রুটি দিয়ে রাজা দেশের দুর্ভিক্ষ মেটালেন আর তরোয়াল দিয়ে করলেন শত্রুসৈন্য নিশ্চিহ্ন। সেই রাজত্বে আবার ফিরে এল সুখ আর শান্তি। তার পর রাজার কাছ থেকে রুটি আর তরোয়ালটা ফেরত নিয়ে ভাইদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ছোটো রাজপুত্তুর আবার যাত্রা করল। পথে আরো দুটো দেশ পড়ল। সে দুটো দেশেও চলছিল দারুণ দুর্ভিক্ষ আর ভীষণ যুদ্ধ। ছোটো রাজপুত্তুরের রুটি আর তরোয়াল সেই দুই দেশেও ফিরিয়ে আনল সুখ আর শান্তি।

তার পর সমুদ্র পেরুবার জন্য তারা গিয়ে উঠল একটা জাহাজে। সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় বড়ো ভাইরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল: "ছোটো ভাই জীবন-জলের খোঁজ পেয়েছে। বাবা নিশ্চয়ই আমাদের বঞ্চিত করে তাকেই সিংহাসন দেবেন। আমাদের সর্বনাশ হবে।" এই-সব আলোচনা করে তাদের মন ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। তাই তারা স্থির করল, ছোটো রাজপুত্তুরের সর্বনাশ করবে। এক রাতে সে ঘুমিয়ে পড়ার পর জীবন-জল চুরি করে গামলায় তারা ভরে দিল সমুদ্রের নোনা জল।

দেশে ফিরেই গামলাটা নিয়ে ছোটো রাজপুত্তুর রাজার কাছে গিয়ে বলল সেই জল খেতে। নোনা জল ঠোঁটে ঠেকিয়েই রাজা থু-থু করে উঠলেন। তাঁর অসুখ গেল আরো বেড়ে। এমন সময় অন্য দু ভাই এসে বলল, ছোটো রাজপুত্তুর চেষ্টা করছিল বিষ খাইয়ে রাজাকে মারতে। এই-না বলে রাজাকে তারা খাওয়াল আসল জীবন-জল। আর সেটা খাবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি হয়ে উঠলেন সুস্থ সবল।

বড়ো ভাইরা তখন ছোটো রাজপুত্তুরকে টিটকিরি দিয়ে বলল, "জীবন-জল তুই যে খুঁজে পেয়েছিলি সে কথা সত্যি। তার জন্যে তোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু এই দ্যাখ—তার পুরস্কার

গেলাম আমরা। বোকার মতো তুই ঘুমিয়ে না পড়লে অত সহজে জীবন-জল আমরা চুরি করতে পারতাম না। এক বছর পরে সেই রূপসী রাজকন্যেকে এনে আমাদের একজন তাকে বিয়ে করবে। রাজাকে এ-সব কথা বলে কোনো লাভ নেই। কারণ তোর একটা কথাও তিনি বিশ্বাস করবেন না। তুই মুখ বুজে থাকলে তোকে প্রাণে মারব না আমরা।"

রাজা ভেবেছিলেন ছোটো ছেলে তাঁকে মারতে চেয়েছিল। তাই তার উপর তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। সভাসদদের ডেকে তিনি আদেশ দিলেন ছোটো রাজপুত্তুরকে গোপনে গুলি করে মারতে। একদিন ছোটো রাজপুত্তুর শিকারে বেরিয়েছে। তার সঙ্গে ছিল রাজার শিকারী। বনের মধ্যে অনেকটা যাবার পর শিকারীর মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠতে দেখে ছোটো রাজপুত্তুর কারণটা জানতে চাইল।

শিকারী বলল, "বলতে পারব না। বলা বারণ।"

ছোটো রাজপুত্তুর তার কথা শুনে বলল, "কী ভাবছ বল। আমি কিছু মনে করব না।"

শিকারী বলল, "তবে বলি, শোনো। রাজার আদেশ—তোমাকে গুলি করে মারতে হবে।"

শিকারীর কথা শুনে ছোটো রাজপুত্তুরের মুখ শুকিয়ে গেল। তার পর বলল, "শোনো শিকারী—আমার সঙ্গে পোশাক বদলে নাও।"

তার কথায় সঙ্গে-সঙ্গে শিকারী রাজি হয়ে গেল। কারণ ছোটো রাজপুত্তুরকে গুলি করতে মোটেই সে চায় নি। পোশাক বদলা-বদলি করে শিকারী ফিরে গেল নিজের বাড়িতে। আর ছোটো রাজপুত্তুর বনের আরো গহনে।

কিছুকাল পরে বুড়ো রাজার কাছে পৌঁছল ছোটো রাজপুত্তুরের জন্য তিন গাড়ি সোনা-জহরতের উপঢৌকন। রুটি আর তরোয়াল দিয়ে যে দুই রাজত্বে সে সুখ আর শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল সে দুই দেশের রাজা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে সেগুলো পাঠিয়েছিলেন। তখন বুড়ো রাজার মনে হল—হয়তো-বা তাঁর ছোটো ছেলে নির্দোষী। সভাসদদের তিনি বললেন, "তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম বলে আমার খুব অনুশোচনা হচ্ছে। সে যদি বেঁচে থাকত—

শিকারী বলল, "মহারাজ, ছোটো রাজপুত্তুর বেঁচে আছে। প্রাণ ধরে

আপনার আদেশ পালন করতে পারি নি।" তার পর রাজাকে সে জানাল সব ঘটনার কথা।

রাজার বুক থেকে ভারি একটা বোঝা নেমে গেল। ছেলেকে ফিরে আসতে অনুরোধ জানিয়ে দেশে-দেশে তিনি দূত পাঠালেন।

ইতিমধ্যে সেই রূপসী রাজকন্যে তার কেল্লায় যাবার পথ সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছিল। পরিচারকদের সে বলে দিল—সেই পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যে তাকে বিয়ে করতে আসবে সেই তার আসল বর। কিন্তু পথের এপাশ বা ওপাশ দিয়ে যে আসবে তাকে সে বিয়ে করবে না।

বছর ঘুরতে চললে বড়ো ছেলে ভাবল রূপসী রাজকন্যেকে বিয়ে করতে যাবার সময় হয়েছে। তাই সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কেল্লার কাছে গিয়ে সোনা-বাঁধানো ঝক্‌ঝকে পথটা দেখে ভাবল, 'এটার ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেলে পথটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা বিশ্রী ব্যাপার।' তাই পথের এক পাশ দিয়ে সে গেল।

কিন্তু কেল্লার সিংহদ্বারে পৌঁছতে পরিচারকরা জানিয়ে দিল—সে আসল বর নয়। বলল তাকে ফিরে যেতে। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় ছেলে বেরুল একই উদ্দেশ্যে। তারও মন চাইল না ঘোড়ার ক্ষুরে পথটা নষ্ট করতে। তাই সে গেল পথের অন্য পাশ দিয়ে। সিংহদ্বারের পরিচারকরা তাকেও দিল হাঁকিয়ে।

বছর পূর্ণ হতে ছোটো রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চড়ে এল রূপসী রাজ-কন্যেকে বিয়ে করতে। কেল্লার কাছে সে যখন পৌঁছল তখন সে বিভোর হয়ে ভাবছিল শুধু সেই রাজকন্যের কথা। তাই সোনার পথটা লক্ষ্য না করে সেটার উপর দিয়েই টগ্‌বগিয়ে পৌঁছল কেল্লার সিংহদ্বারে। রাজকন্যে তাকে সানন্দে গ্রহণ করল আর অল্পদিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। তার পর ছোটো রাজপুত্তুর তার বাবার কাছে গিয়ে জানাল ভাইরা তাকে কী ভাবে ঠকিয়েছিল। কিন্তু রাজা তাদের শাস্তি দেবার আগেই সমুদ্রে তারা পাড়ি দিল। তারা আর ফেরে নি।

সাদা আর কালো পাখি

এক স্ত্রীলোকের দুই মেয়ে ছিল : একটি সৎ-মেয়ে, অন্যটি নিজের। তাদের নিয়ে মাঠে সে ঘাস কাটতে গিয়েছিল। গরিব লোকের বেশ ধরে ভগবান তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বলতে পার কোন পথ দিয়ে গ্রামে যাব ?"

মেয়েদের মা বলল, "নিজেই সেটা খুঁজে নাও গে।"

তার নিজের মেয়ে বলল, "সাইন-পোস্ট দেখলেই জানতে পারবে।"

কিন্তু তার সৎ-মেয়ে বলল, "আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মা আর মেয়ের উপর চটে উঠে ভগবান তাদের অভিশাপ দিলেন : তাদের চেহারা কালো আর কুচ্ছিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন দয়ালু সৎ-মেয়ের উপর। তার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে গ্রামের কাছে পৌঁছে ভগবান তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তিনটে বর চাও।"

মেয়েটি বলল, "সূর্যের মতো পবিত্র আর সুন্দর হতে চাই।"

সঙ্গে-সঙ্গে সে হয়ে উঠল দিনের মতো ফরসা আর সুন্দর।

"আমার দ্বিতীয় ইচ্ছে—এমন একটা থলি যেন পাই কখনো যেটা খালি হবে না।"

থলিটা তাকে দিয়ে ভগবান বললেন, "সর্বদা সৎ পথে থাকবে।"

মেয়েটি তার পর বলল, "আমার তৃতীয় ইচ্ছে—মৃত্যুর পর যেন স্বর্গে যাই।"

ভগবান বললেন, "তাই হবে।" তার পর তিনি চলে গেলেন।

আপন মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীলোকটি দেখে সে আর তার মেয়ে হয়ে উঠেছে কালো আর কুচ্ছিত। কিন্তু সৎ-মেয়ে হয়ে উঠেছে ফরসা আর সুন্দর। তাই-না দেখে দুজনেই তারা মনে-মনে ভীষণ চটে উঠল আর দিন-রাত তারা ভাবতে লাগল—কী করে সৎ-মেয়ের ক্ষতি করা যায়।

সৎ-মেয়েটির এক ভাই ছিল। নাম রেজিনাল্ড্। তাকে খুবই সে ভালোবাসত। ভাইকে সব কথা সে জানাল।

একদিন রেজিনাল্ড্ তাকে বলল, "দিদি, তোমার একটা ছবি আঁকব। তা হলে সব সময় দেখতে পাব তোমাকে। তোমাকে খুব ভালোবাসি; তাই চাই সব সময় আমার চোখের সামনে তুমি থাকো।"

মেয়েটি বলল, "ছবিটা কিন্তু কাউকে দেখতে দিয়ো না।"

নিজের জন্য বোনের ছবি এঁকে রেজিনাল্ড্ সেটা তার ঘরে টাঙিয়ে রাখল। সে ছিল রাজার কোচওয়ান। রাজপ্রাসাদে সে থাকত। প্রিয় বোনটিকে পেয়ে সে খুব খুশি ছিল তাই ছবিটির সামনে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে ভগবানকে সে জানাত ধন্যবাদ।

রাজার বউ সম্প্রতি মারা গিয়েছিল। ভারি রূপসী ছিল সে। তাকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে রাজা অভিভূত হয়ে পড়েন। এদিকে সভাসদরা লক্ষ্য করে প্রতিদিন কোচওয়ান সুন্দর ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ছবিটার জন্য কোচওয়ানের উপর মনে-মনে তাদের বেজায় হিংসে হয়। তাই ছবিটার কথা রাজাকে একদিন তারা জানাল। রাজা আদেশ দিলেন ছবিটা আনতে। তিনি দেখেন ছবিটা হুবহু তার মৃত স্ত্রীর মতো—তবে আরো অনেক সুন্দর। তাই ছবির মেয়েটিকে তিনি খুব ভালোবেসে ফেললেন। কোচওয়ানকে ডেকে তিনি জানতে চাইলেন—ছবিটা কার। কোচওয়ান জানাল ছবিটা তার বোনের। রাজা স্থির করলেন—এই মেয়েটিকে ছাড়া অন্য কাউকেই তিনি বিয়ে করবেন না। তাই সোনার কাজ-করা সুন্দর-সুন্দর নানা পোশাক দিয়ে জুড়িগাড়ি করে কোচওয়ানকে তিনি পাঠালেন মেয়েটিকে আনতে।

রেজিনাল্ড্-এর মুখে খবর শুনে তার বোন খুব খুশি হল। কিন্তু কালো কুচ্ছিত মেয়েটা হিংসেয় জ্বলেপুড়ে তার মাকে গিয়ে বলল, "তোমার তুক্‌তাক্ সব মিথ্যে। কারণ আমাকে তুমি রানী করে দিতে পারলে না।"

বুড়ি বলল, "শান্ত হ বাছা। তোদের জন্যে এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই-না বলে ডাইনির মন্ত্র পড়ে কোচওয়ানের চোখ আধ-কানা আর ফরসা সৎ-মেয়ের কান আধ-কালা সে করে দিল।

তার পর তারা উঠল জুড়িগাড়িতে—প্রথমে রানীর ঝল্‌মলে পোশাক পরে কনে আর তার পর সৎ-মা আর তার মেয়ে। কোচওয়ানের আসনে বসে রেজিনাল্‌ড্‌ লাগল গাড়ি হাঁকাতে। খানিক যাবার পর কোচওয়ান বলে উঠল :

"বৃষ্টি যাতে না ভেজায়
ধুলোয় যাতে মলিন না হয়
ছোট্টো বোন মুখটি ঢেকো।
রাজার সামনে রূপের ছটায়
পৌঁছবার কথাটায়
ভুল না হয়—মনে রেখো।"

কনে প্রশ্ন করল, "ভাই কী বলছে?"

সৎ-মা বলল, "ভাই বলছে, সোনার কাজ-করা পোশাকটা খুলে তোমার বোনকে দিতে।"

তাই কালো কুচ্ছিত বোনকে কনে তার পোশাকটা দিল। তার বদলে সৎ-বোন তাকে দিল পুরনো ছাই-রঙা একটা আঙরাখা।

খানিক পরে তার ভাই আবার বলে উঠল :

"বৃষ্টি যাতে না ভেজায়
ধুলোয় যাতে মলিন না হয়
ছোট্টো বোন মুখটি ঢেকো।
রাজার সামনে রূপের ছটায়
পৌঁছবার কথাটায়
ভুল না হয়—মনে রেখো।"

কনে প্রশ্ন করল, "ভাই কী বলছে?"

সৎ-মা বলল, "ভাই বলছে, সোনার মুকুটটা খুলে তোমার বোনকে দিতে।"

তাই কালো কুচ্ছিত বোনকে সোনার মুকুট পরিয়ে খালি মাথায় বসে রইল কনে।

খানিক পরে আবার তার ভাই বলে উঠল :

"বৃষ্টি যাতে না ভেজায়
ধুলোয় যাতে মলিন না হয়
ছোট্টো বোন মুখটি ঢেকো।
রাজার সামনে রূপের ছটায়
পৌঁছবার কথাটায়
ভুল না হয়—মনে রেখো।"

কনে প্রশ্ন করল, "ভাই কী বলছে ?"

সৎ-মা বলল, "ভাই বলছে, গাড়ির বাইরে মুখ বার করে থাকতে।"

গাড়িটা তখন এক সেতুর উপর দিয়ে যাচ্ছিল। নীচে ছিল গভীর জল। দাঁড়িয়ে উঠে গাড়ির বাইরে কনে যেই ঝুঁকেছে অমনি তার সৎ-মা আর সৎ-বোন তাকে দিল জলের মধ্যে ঠেলে ফেলে। কিন্তু সে ডুবে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে দুধের মতো সাদা একটা হাঁস জলের উপর ভেসে উঠে নদীর স্রোতে সাঁতরে চলল। ভাইটি কিছুই দেখতে পেল না। গাড়ি নিয়ে সে পৌঁছল রাজসভায়। তার পর কালো কুচ্ছিত মেয়েকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে সে বলল—বোনকে এনেছে। আর সত্যিই তার ধারণা হয়েছিল, এই মেয়েই তার বোন। কারণ চোখের দৃষ্টি তখন তার ঝাপ্‌সা। ঝল্‌মলে সোনালী পোশাক ছাড়া স্পষ্ট কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না।

হতকুচ্ছিত মেয়েটাকে দেখে ভীষণ রেগে রাজা আদেশ দিলেন বিষাক্ত সাপে কিল্‌বিলে একটা গর্তের মধ্যে কোচওয়ানকে ফেলে দিতে। কিন্তু বুড়ি ডাইনি জানত রাজাকে ফাঁদে আটকাবার তুক্‌তাক্। তাই মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে রাজার চোখ এমন সে ধাঁধিয়ে দিল যে, তাকে আর তার মেয়েকে রাজা সেখানে থাকতে দিলেন এবং শেষপর্যন্ত তার মেয়েকে করলেন বিয়ে।

এক সন্ধেয় কালো কুচ্ছিত কনে যখন রাজার কোলে বসে আছে সাদা একটা হাঁস রান্না ঘরের চৌবাচ্চার কাছে সাঁতরে এসে বাসন-মাজা চাকরকে বলল :

"তরুণ তুমি আগুন জ্বালো,
শুকিয়ে নেব পালকগুলো।"

তার কথামতো বাসন-মাজা চাকর উনুনে আঁচ দিল। হাঁসটা উনুনের কাছে বসে, শরীর ঝাঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে তার পালকগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করল। পালক পরিষ্কার করতে-করতে সে প্রশ্ন করল, "আমার ভাই রেজিনাল্‌ড্‌ কী করছে?"

বাসন-মাজা চাকর বলল :

"সাপ-খোপের গুহায়
মরতে বসেছে—হায়।"

হাঁস আবার প্রশ্ন করল, "বাড়ির মধ্যে কালো ডাইনি কী করছে?"

বাসন-মাজা চাকর বলল :

"কোল ছাড়ে নি রাজার
আরাম তার হাজার।"

হাঁস বলল "হায় ভগবান!" তার পর সাঁতরে সে চলে গেল।

পরের সন্ধ্যেয় আবার এসে একই প্রশ্ন করল হাস। তার পরের সন্ধ্যেতেও।

বাসন-মাজা চাকর তখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। রাজার কাছে গিয়ে জানাল সব কথা।

রাজার ইচ্ছে হল নিজের চোখে সব-কিছু দেখার। তাই পরদিন সন্ধ্যেয় তিনি নিজে গেলেন সেখানে। আর যেই-না সাদা হাঁস রান্নাঘরের

চৌবাচ্চার কাছে সাঁতরে এসে গলা বাড়িয়েছে, অমনি তরোয়াল বার করে তিনি কেটে ফেললেন তার গলা। সঙ্গে-সঙ্গে সেই হাঁস হয়ে উঠল অপরূপ রূপসী একটি মেয়ে—ছবিতে যেরকম দেখেছিলেন হুবহু সেইরকম। তাকে দেখে রাজার আনন্দ আর ধরে না। মেয়েটির পরনে কোনো পোশাক ছিল না। তাই তিনি আদেশ দিলেন দামী-দামী পোশাক এনে তাকে সাজাতে। তার পর মেয়েটি রাজাকে জানাল কী ভাবে ছল-চাতুরি করে তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয় আর অনুরোধ করল সেই মুহূর্তে তার ভাইকে যেন তুলে আনা হয় সাপের গর্ত থেকে। মেয়েটির ভাইকে তুলে আনা হলে যে-ঘরে বুড়ি ডাইনি বসেছিল সে-ঘরে গিয়ে সব ঘটনার কথা বলে রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন, "এরকম কাজ যে করে তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?"

বুড়ি ডাইনি ততদিনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই কোনোরকম সন্দেহ না করে সে বলল, "এরকম কাজ যে করে তার পোশাক খুলে তাকে একটা পেরেক-লাগানো পিপেয় ভরে ঘোড়া দিয়ে সেই পিপে পৃথিবীময় টানিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

সেই শাস্তিই দেওয়া হল তাকে আর তার কালো-কুচ্ছিত মেয়েকে। তার পর রাজা বিয়ে করলেন দিনের মতো ফরসা আর রূপবতী মেয়েটিকে আর তার বিশ্বস্ত ভাইটিকে অনেক ধনরত্ন দিয়ে শক্তিশালী পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

ছোট্টো গাধা

এক সময় ছিল খুব ধনী এক রাজা আর রানী। একটা জিনিস ছাড়া তাদের কোনো-কিছুর অভাব ছিল না—সেটি হচ্ছে সন্তান। তাই মনের দুঃখে রাতদিন রানী কেঁদে ভাসান। শেষটায় ভগবান রানীর মনের সাধ মেটালেন। রানীর কোলে এল একটি শিশু। কিন্তু দেখতে মানুষের মতো নয়—গাধার ছোট্টো ছানার মতো। তাকে দেখে রানীর চোখের জল নতুন করে আবার উথলে উঠল। ভাবলেন, গাধার বদলে তাঁর কোলে কোনো শিশু না এলেই ভালো হত। ভৃত্যদের তিনি বললেন সেটাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে যাতে তাকে হাঙর-কুমিরে খেয়ে ফেলে।

রাজা কিন্তু বললেন, "না। ভগবান একে আমাদের দিয়েছেন। তাই এ হবে আমার ছেলে। এ পাবে রাজত্ব। আমি মরার পর এ-ই বসবে সিংহাসনে আর পরবে রাজমুকুট।"

তাই রাজপ্রাসাদে সে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। দেখতে-দেখতে তার কান দুটো হয়ে উঠল প্রকাণ্ড আর খাড়া-খাড়া। মনের আনন্দে সব সময় সে ছুটে খেলে বেড়াত। গান-বাজনা ছিল তার বিশেষ প্রিয়। একদিন এক বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে গিয়ে সে বলল, "তোমার মতো ভালো বাঁশি বাজাতে আমাকে শিখিয়ে দাও।"

ওস্তাদ বলল, "রাজাবাবু, বাঁশি বাজানো শেখা তোমার পক্ষে ভারি শক্ত। তোমার আঙুলগুলো এত বড়ো-বড়ো যে বাঁশি বাজাবার উপযোগী নয়। মনে হয় কখনো তুমি শিখে উঠতে পারবে না।"

কিন্তু গাধা তার কথায় কান দিল না। শিখবে বলে গোঁ ধরল। সে ছিল ভারি পরিশ্রমী, খুব যত্ন করে শিখত। তাই শেষটায় ওস্তাদের মতোই ভালো বাঁশি বাজাতে শিখল সে।

একদিন মনমরা হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তরুণ রাজপুত্র পৌঁছল এক কুয়োর কাছে। নীচের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছ জলে সে দেখতে পেল তার গাধার মতো শরীরের ছায়া। তাই-না দেখে মনের দুঃখে একটা মাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল, হাঁটতে-হাঁটতে হাঁটতে-হাঁটতে শেষটায় তারা পৌঁছল এক বুড়ো রাজার রাজত্বে। রাজার ছিল একমাত্র মেয়ে। অপরূপ সে রূপসী।

গাধা বলল, "এখানে আমরা থাকব।" এই-না বলে সিংহদ্বারে টোকা দিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "বাইরে অতিথি দাঁড়িয়ে। দ্বার খোলো

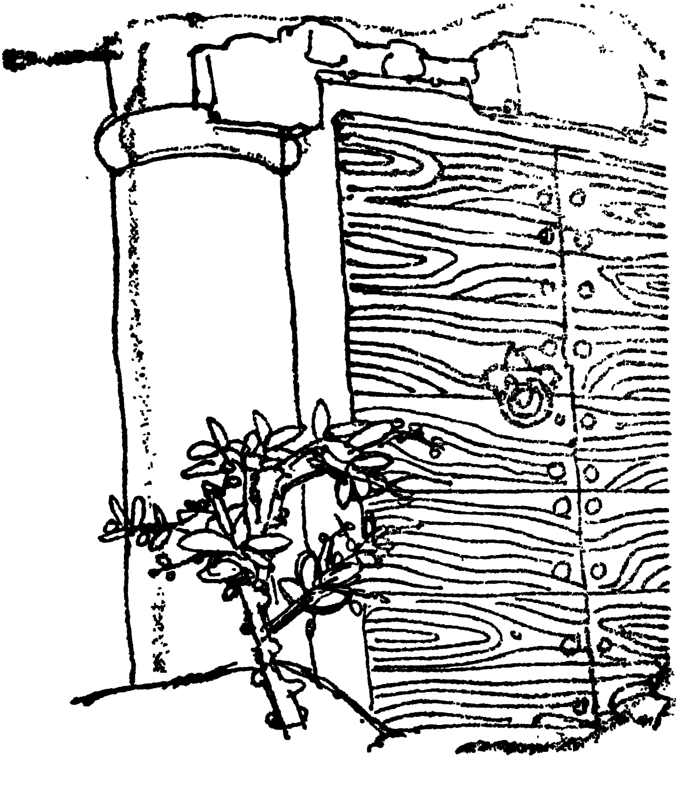

যাতে সে ভেতরে যেতে পারে।" কিন্তু দ্বার খুলতে কেউ না আসায় সেখানে বসে তার বাঁশি বার করে সামনের পা-দুটো দিয়ে সে বাজাতে শুরু করল ভারি মিষ্টি এক সুর।

বাঁশির সুর শুনে দ্বাররক্ষী এসে তাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, সিংহদ্বারের বাইরে বসে একটা বাচ্চা গাধা যে কোনো ওস্তাদের মতো বাঁশি বাজাচ্ছে।"

রাজা বললেন, "ওস্তাদকে নিয়ে এসো।" কিন্তু গাধাকে দেখে সবাই লাগল হো-হো করে হাসতে।

তারা তাকে বলল ভৃত্যদের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে। কিন্তু গাধার সেটা পছন্দ হল না। সে বলল, "রাজবংশে আমার জন্ম। আস্তাবলের সাধারণ গাধা আমি নই।"

তারা বলল, "তাই যদি হয়, যোদ্ধাদের সঙ্গে খেতে বোসো।"

সে বলল, "না, আমি বসব রাজার সঙ্গে।"

তার কথা শুনে হেসে উঠে মিষ্টি করে রাজা বললেন, "গাধা, তাই হবে। এসো, আমার পাশে বোসো।" তার পর তিনি প্রশ্ন করলেন, "গাধা, আমার মেয়েকে কেমন লাগছে?"

ঘাড় ফিরিয়ে রাজকন্যের দিকে তাকিয়ে মাথা হেলিয়ে গাধা বলল, "খুব ভালো লাগছে। এর মতো রূপসী কোনো মেয়ে জীবনে দেখি নি।

রাজা বললেন, "তা হলে তার পাশে বসো।"

"রাজকন্যের পাশে বসতে আমার খুবই ভালো লাগবে," এই-না বলে তার পাশে বসে নিখুঁতভাবে সে খাওয়া-দাওয়া করতে লাগল। কারণ আদব-কায়দায় সে ছিল দুরস্ত।

রাজপ্রাসাদে কিছুকাল কাটাবার পর গাধা ভাবল, 'এভাবে আর চলে না। এবার বাড়ি ফেরা যাক।' তাই মনমরা হয়ে মাথা নিচু করে রাজার কাছে সে যাবার অনুমতি নিতে গেল।

কিন্তু রাজার তাকে খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই তিনি বললেন, "গাধা, তোমার মুখ অমন গোমড়া কেন? কী হয়েছে? আমার কাছে থাকো। যা চাও তাই পাবে। মোহর চাও?"

মাথা নাড়িয়ে গাধা বলল, "না।"

"হীরে-জহরত, জড়োয়া গয়না?"

"না?"

"অর্ধেক রাজত্ব চাও?"

"না! না!"

রাজা তখন বললেন, "কী পেলে সুখী হও যদি জানতাম। তুমি কি আমার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চাও?"

"হ্যাঁ, মহারাজ, তাই চাই।" বলে সঙ্গে-সঙ্গে গাধা হাসিখুশি হয়ে উঠল। কারণ সেটাই ছিল তার আসল ইচ্ছে।

তাই খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

সন্ধেয় বর-কনেকে নিয়ে যাওয়া হল তাদের ঘরে। গাধা কী রকম ব্যবহার করে দেখার জন্য রাজা তাঁর এক ভৃত্যকে সেই ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

দরজায় হুড়কো দিয়ে আর কেউ আছে কি না দেখার জন্য বর চার দিকে তাকাল। তার পর হঠাৎ সে খুলে ফেলল তার গাধার চামড়া আর দেখা গেল সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপুরুষ এক রাজপুত্র।

তার পর রাজকন্যেকে সে বলল, "আসলে আমি কে দেখলে তো। তোমার অযোগ্য আমি নই।"

কনে খুব খুশি হয়ে তাকে চুমু খেল আর খুব ভালোবেসে ফেলল।

পরদিন সকালে উঠে আবার সে পরে নিল তার গাধার চামড়া। কেউ টের পেল না সেই চামড়ার নীচে কে আছে।

তাকে দেখে রাজা বললেন, "বাচ্চা গাধা, এত সকাল সকাল উঠে পড়েছ?" তার পর মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, "বর সাধারণ মানুষ নয় বলে নিশ্চয়ই তোর মনে খুব দুঃখ হয়েছে—তাই-না?"

রাজকন্যে বলল, "মোটেই না, বাবা। সুপুরুষ তরুণের মতোই তাকে ভালোবাসি। আর আজীবন তাই বাসব।"

রাজা ব্যাপারটা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষটায় ভৃত্য এসে সব কথা তাঁকে জানাল।

সব শুনে রাজা বললেন, "অসম্ভব।"

ভৃত্য বলল, "মহারাজ, আপনি নিজে লুকিয়ে থেকে দেখবেন। চামড়াটা পুড়িয়ে ফেললে কেমন হয়? তা হলে তো নিজের আসল চেহারায় দেখা দিতে সে বাধ্য হবে।"

রাজা বললেন, "ঠিক বলেছ।"

রাতে বর-কনে যখন ঘুমচ্ছে চুপি চুপি রাজা গিয়ে দেখলেন তাঁর মেয়ের পাশে রয়েছে সুপুরুষ এক তরুণ। পাশেই মেঝের উপর পড়ে রয়েছে গাধার চামড়াটা। চামড়াটা নিয়ে বাইরে এসে গন্‌গনে আগুনে সেটা পুড়িয়ে তিনি ছাই করে ফেললেন।

তার পর তরুণ কী করে দেখার জন্য সারা রাত অপেক্ষা করে রইলেন।

সূর্যোদয়ের পর রাজপুত্র ঘুম থেকে জেগে খুঁজতে লাগল তার গাধার চামড়াটা। কিন্তু কোথাও সে খুঁজে পেল না। তাই খুব ভয় পেয়ে আপন মনে সে বলে উঠল, 'এবার আমাকে পালাতে হবে।'

কিন্তু বাইরে বেরুতে সে দেখে রাজা সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তাকে বললেন, "বাছা, এত তাড়াহুড়ো করে চলেছ কোথায়?

গ্রিম—২-১০

ব্যাপার কী ? এখানে থাকো। তুমি ভারি সুপুরুষ। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। তোমায় অর্ধেক রাজত্ব দেব। আমার মৃত্যুর পর পাবে গোটা রাজত্ব।"

রাজপুত্র বলল, "শুরুতে যেরকম আনন্দে ছিলাম আশাকরি সে-রকম আনন্দেই থাকব। আপনাকে কক্ষনো ছেড়ে যাব না।"

রাজপুত্র পেল অর্ধেক রাজত্ব। আর এক বছর পরে বুড়ো রাজার মৃত্যুর পর সে পেল রাজত্বটা। নিজের বাবার মৃত্যুর পর সে পেল তাঁর রাজত্বটাও। তার পর সারা জীবন সে ছিল খুব জাঁকজমকের মধ্যে।

বহুকাল আগে এক বুড়ি রানী ছিল। আসলে সে ডাইনি। তার মেয়েটি ভারি রূপসী। বুড়ির একমাত্র চিন্তা ছিল—কী করে লোকেদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরে তাদের সর্বনাশ করা যায়। তাই যে তার মেয়েকে বিয়ে করতে আসত তাকেই সে বলত—একটা ধাঁধার উত্তর দিতে পারলে তবেই তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। অনেকেই মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে ডাইনি যে অসম্ভব কাজ করতে বলত সেটা করার চেষ্টা করত। কিন্তু কেউই পারত না। তাই ডাইনির সামনে নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য হত তারা। আর ডাইনি কেটে ফেলত তাদের মুণ্ডু।

মেয়েটির রূপের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই শুনে এক তরুণ রাজপুত্র তার বাবাকে বলল, "বাবা, মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাবার অনুমতি দাও।"

রাজা বললেন, "কিছুতেই যেতে দেব না। গেলে নির্ঘাত মারা পড়বে।"

তাই শুনে মনের দুঃখে তার ছেলে বিছানা নিল আর সাত বছর অসুখে ভুগতে ভুগতে প্রায় হয়ে পড়ল পঙ্গু। কোনো ডাক্তার-বদ্যিই তাকে সারাতে পারল না।

ছেলেকে সুস্থ করার জন্য কোনো উপায় না দেখে শেষটায় রাজা মনের দুঃখে বললেন, "অতই যদি ইচ্ছে তা হলে নিজের ভাগ্য-পরীক্ষা করতে যাও। তোমাকে আর কী উপদেশ দেব জানি না।"

রাজার কথা শুনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রাজপুত্র বিছানা ছেড়ে উঠল, তার পর মনের আনন্দে বেরিয়ে পড়ল।

ঘোড়ায় চড়ে যেতে-যেতে সে দেখল তার সামনে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা খড়ের গাদার মতো জিনিস পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে সেটা একটা লোকের ভুঁড়ি। লোকটা চিৎপাত হয়ে শুয়েছিল।

রাজপুত্রকে দেখে মোটা লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "তোমার ভৃত্যের দরকার থাকলে আমাকে সঙ্গে নাও।"

রাজপুত্র বলল, "তোমার মতো মোটা ভৃত্য নিয়ে আমি কী করব?"

লোকটা বলল, "এ আর কী মোটা দেখছ! ইচ্ছে করলে এর চেয়ে হাজার গুণ মোটা হয়ে উঠতে পারি।"

রাজপুত্র বলল, "তা হলে চলে এসো আমার সঙ্গে। মনে হয় তুমি আমার কাজে লাগবে।"

রাজপুত্রের পিছন-পিছন চলল মোটা লোকটা। খানিক দূর যাবার পর রাজপুত্র দেখল ঘাসে কান দিয়ে আর-একটা লোক মাঠে শুয়ে আছে।

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "কী করছ?"

লোকটা বলল, "শুনছি।"

"অমন মন দিয়ে কী শুনছ?"

"পৃথিবীতে যা-যা ঘটছে সব-কিছু শুনছি। আমার শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। কিছুই আমার কান এড়িয়ে যায় না। এমন-কি, ঘাস গজাবার শব্দও শুনতে পাই।"

রাজপুত্র বলল, "যে বুড়ি রানীর রূপসী মেয়ে আছে তার রাজসভায় কী-কী ঘটছে জানতে চাই। সে-সব তুমি শুনতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। রাজকন্যেকে যে বিয়ে করতে যাবে তার মুণ্ডু কাটার জন্যে তরোয়াল শানাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

রাজপুত্র বলল, "তুমি আমার কাজে লাগবে। আমার সঙ্গে চলো!" তাই একসঙ্গে তারা তিনজন পথ দিয়ে যেতে লাগল।

যেতে যেতে দূরে তারা দেখল একজোড়া পায়ের পাতা উঁচিয়ে রয়েছে। অনেকটা যাবার পর তারা দেখতে পেল মানুষটার শরীর আর মাথা।

অবাক হয়ে রাজপুত্র বলে উঠল, "কী কাণ্ড! তুমি তো ভীষণ লম্বা!"

লোকটা বলল, "তা সত্যি। তবে ঠিকমতো হাত-পা ছড়ালে আমি

এর চেয়েও তিন হাজার গুণ লম্বা হয়ে যেতে পারি—পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের চেয়েও উঁচু। আমাকে সঙ্গে নিলে ভালো করে তোমার ফাই-ফরমাশ খাটব।"

রাজপুত্র বলল, "তা হলে চলে এসো। তুমি কাজে লাগতে পার।"

তারা যেতে যেতে দেখে পথের পাশে একটা লোক চোখ বেঁধে বসে আছে। রাজপুত্র বলল, "কী ব্যাপার? তোমার চোখ খারাপ নাকি? চোখে আলো সয় না?"

লোকটা বলল, "না-না। আমার চোখের তেজ ভীষণ। তাই আমাকে চোখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখতে হয়। তা না হলে যে জিনিসের দিকে তাকাব সেটাই গুঁড়ো হয়ে যাবে। চোখের এরকম তেজ তোমার কাজে লাগলে আমাকে সঙ্গে নিতে পার।"

রাজপুত্র বলল, "তা হলে চলে এসো। তুমি কাজে লাগতে পার।"

যেতে যেতে তার পর তারা দেখে চড়্চড়ে রোদের মধ্যে একটা লোক শুয়ে এমন থর্থর্ করে কাঁপছে যেন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে।

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "কাঁপছ কেন? রোদ তো এখন আগুনের মতো গন্গনে।"

লোকটা বলল, "আমার ধাত অন্য লোকদের চেয়ে একেবারে উলটো। আবহাওয়া যত গরম হয় তত আমি শীতে কাঁপি। যত ঠাণ্ডা হয় তত গরম হয়ে ওঠে আমার শরীর। বরফের মধ্যে গরমে আমি নিশ্বেস নিতে পারি না। চুল্লির মধ্যে গেলে ঠাণ্ডায় কী যে করব ভেবে পাই না।"

রাজপুত্র বলল, "বাস্তবিকই তুমি দেখছি অদ্ভুত মানুষ। আমার ভৃত্য হতে চাইলে, চলে এসো।"

যেতে যেতে তারা দেখে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার গলাটা এমনই লম্বা যে পাহাড় পর্বতের উপর দিয়ে চার দিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "অমন এক মনে দেখছ কি?"

সে বলল, "আমার দৃষ্টিশক্তি ভীষণ তীক্ষ্ণ। বন আর মাঠ, পাহাড় আর উপত্যকা পেরিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমি দেখতে পাই।"

রাজপুত্র বলল, "আমার সঙ্গে চলে এসো। তোমার মতো এমন আশ্চর্য মানুষকে ছেড়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়।"

যে শহরে বুড়ি রানী থাকে সেই শহরে রাজপুত্র তার পর পৌঁছল তার আশ্চর্য ছয় ভৃত্যকে নিয়ে। নিজের পরিচয় না দিয়ে রানীকে সে বলল, "তোমার সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে যে কোনো কাজ বলবে, করে দেব।"

আর একজন সুপুরুষ তরুণকে নিজের আওতায় পেয়ে খুব খুশি হয়ে ডাইনি বলল, "আমার তিনটে শর্ত আছে। সেগুলো পূর্ণ করতে পারলেই আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "তোমার প্রথম শর্ত কি?"

"লোহিত-সমুদ্রে আমার একটা আংটি পড়ে গেছে। সেটা আমায় এনে দিতে হবে।"

রাজপুত্র বাড়ি ফিরে তার ভৃত্যদের বলল, "প্রথম কাজটা সহজ নয়। লোহিত-সমুদ্রের তলা থেকে একটা আংটি নিয়ে আসতে হবে। কী করে আনা যায়?"

যে লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে বলল, "আমি দেখছি কোথায় সেটা রয়েছে।" দেখে-টেখে সে জানাল আংটিটা একটা ছুঁচলো পাথরে ঝুলছে।

লম্বা লোকটা বলল, "আংটিটা দেখতে পেলে অনায়াসে নিয়ে আসতে পারব।"

মোটা লোকটা বলল, "আমি তোমায় সাহায্য করছি।" এই-না বলে নিচু হয়ে জলের মধ্যে সে হাঁ করল। ঢেউগুলো ভাঙতে লাগল তার মুখের মধ্যে—যেন সেটা প্রকাণ্ড একটা গুহা। দেখতে-দেখতে গোটা সমুদ্রটাকেই সে গিলে ফেলল। সামনে পড়ে রইলে খটখটে একটা মাঠ।

লম্বা লোকটা তখন সামান্য নিচু হয়ে হাতে করে তুলে আনল আংটিটা।

ভারি খুশি হয়ে আংটি নিয়ে রাজপুত্র গেল বুড়ি ডাইনির কাছে।

ভীষণ অবাক হয়ে ডাইনি বলল, "হ্যাঁ, এটাই আমার আংটি। প্রথম শর্ত তুমি পূর্ণ করেছ। এবার দ্বিতীয় শর্তটা বলি। আমার কেল্লার সামনে মোটাসোটা তিনশো ষাঁড় চরছে দেখতে পাচ্ছ? লোম, শিং আর হাড়সুদ্ধু সেগুলোকে তোমায় গিলতে হবে। মাটির তলার ঘরগুলোয় আছে তিনশো পিপে আঙুর-রস। সেগুলোর শেষ ফোঁটা

পর্যন্ত তোমাকে পান করতে হবে। না পারলে মুণ্ডু কেটে তোমায় মেরে ফেলব।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "এই ভোজে একজন অতিথিকে আনতে পারি? একা-একা খেতে ভালো লাগে না।"

বুড়ি ডাইনি বাঁকা হেসে বলল, "একজনকে নেমন্তন্ন করতে পার। একজনের বেশি নয়।"

ভৃত্যদের কাছে ফিরে গিয়ে রাজপুত্র মোটা লোকটাকে বলল, "আজ তুমি আমার অতিথি হবে। পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া কোরো।"

মোটা লোকটা তখন কোমরের বেল্ট খুলে শরীরটাকে হাজার গুণ ফাঁপিয়ে তুলল। হাড়-মাসসুদ্ধ তিনশোটা ষাঁড় গেলা তার পক্ষে মোটেই শক্ত হল না। তার পর তিনশো পিপে আঙুর-রস চক্‌চক্ করে সে গিলল। এক ফোঁটাও পড়ে রইল না।

দ্বিতীয় শর্ত পূর্ণ করেছে জেনে ভীষণ অবাক হয়ে রাজপুত্রকে বুড়ি ডাইনি বলল, "এ-পর্যন্ত কেউই তোমার মতো কাজ করতে পারে নি। এবার আমার তৃতীয় শর্তটা বলছি। সেটাই সব চেয়ে কঠিন। কখনো সেটা পূর্ণ করতে পারবে না। তোমার মুণ্ডু আমি কাটবই।"

খানিক থেমে ডাইনি তার পর রাজপুত্রকে বলল, "আজ সন্ধেয় আমার মেয়েকে তোমার ঘরে রেখে যাব। দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে তুমি বসে থাকবে। সাবধান, ঘুমবে না। রাত বারোটায় আবার আমি আসব। আমার মেয়ে তখন যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তোমার মুণ্ডু কাটব।"

রাজপুত্র ভাবল, এ শর্তটা তো মনে হচ্ছে খুবই সহজ আর মনোরম। ঘুমবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবু ভৃত্যদের ডেকে বুড়ি ডাইনির শর্তের কথা জানিয়ে তাদের সে বলল, "এই শর্তের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা চালাকি আছে। তাই সাবধানের মার নেই। তোমরা সতর্ক হয়ে পাহারা দিয়ো। দেখো রাজকন্যে যেন আমার ঘর থেকে পালাতে না পারে।"

সন্ধেয় ডাইনি তার মেয়েকে নিয়ে এলে রাজপুত্র দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে বসল। লিকলিকে লোকটা তখন তাদের দুজনকে নিজের শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল আর মোটা লোকটা দাঁড়াল দোরগোড়ায় যাতে কেউ ঘরের মধ্যে আসতে না পারে। রাজকন্যে একটি কথাও

বলল না। কিন্তু জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তার অপরূপ সুন্দর মুখে পড়ল। রাজপুত্র এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আনন্দে আর ভালোবাসায় ভরে উঠল তার বুক। তার চোখে পলক পড়ল না। এই ভাবে কাটল রাত এগারোটা পর্যন্ত। তার পর বুড়ি ডাইনি তাদের উপর জাদুর মায়া বিছিয়ে দিতে তারা পড়ল ঘুমিয়ে। আর সেই ফাঁকে মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেল বুড়ি ডাইনি। পৌনে বারোটা পর্যন্ত তারা ঘুমল। তার পর জাদুর মায়া কেটে যেতে তারা উঠল জেগে।

জেগে উঠে রাজপুত্র চীৎকার করে উঠল, "হায়-হায়। এইবার সত্যিই মরতে হবে।"

বিশ্বস্ত ভৃত্যের দল মনের দুঃখে হাত কচ্‌লাতে লাগল। কিন্তু

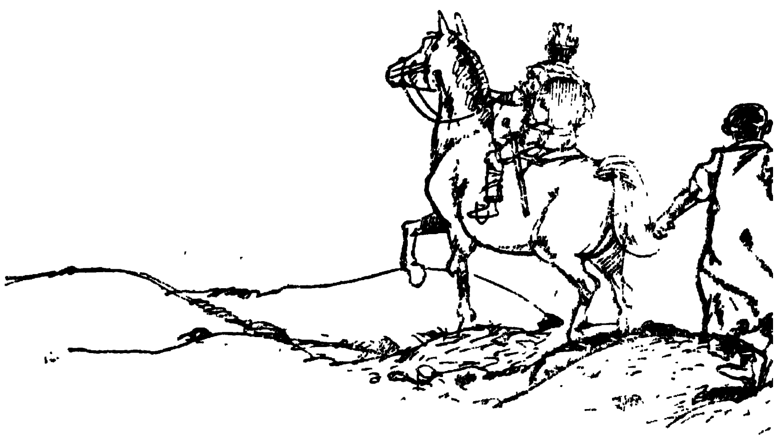

যে-লোকটার শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ সে বলে উঠল, "তোমরা সবাই চুপ কর। আমাকে শুনতে দাও।"

এই-না বলে কান পেতে খানিক শুনে সে বলল, "রাজকন্যে পাথরে-ঘেরা একটা জায়গার মধ্যে বসে মনের দুঃখে কাঁদছে। এখান থেকে সেখানে যেতে লাগে তিনশো ঘণ্টা। লম্বা-ভায়া, একমাত্র তুমিই তাকে সাহায্য করতে পার। কয়েক পা হাঁটলেই তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে।"

লম্বা লোকটা বলল, "তা যেতে পারি। কিন্তু পাথরগুলো ভাঙার জন্যে যার ভয়ংকর চোখের তেজ তাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

এই-না বলে লম্বা লোকটা চোখে-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা লোকটাকে তুলে নিয়ে নিমেষের মধ্যে সেই মায়ায় ঘেরা পাথরটার কাছে পৌঁছে সঙ্গীর

চোখের ব্যাণ্ডেজটা খুলে দিল আর সে তার এক চাউনিতে গুঁড়িয়ে দিল পাথরটা। লম্বা লোকটা তখন রাজকন্যে আর নিজের সঙ্গীকে তুলে নিয়ে আবার নিমেষের মধ্যে যখন ফিরে এল ঘড়িতে তখন বারোটা বাজছে।

বুড়ি ডাইনির ঠোঁটে তখন ফুটে উঠল হিংস্র হাসি। বিড়্‌বিড়্‌ করে বলে উঠল, 'বাছাধনকে এইবার বাগে পেয়েছি।' কারণ সে ভেবেছিল তার মেয়ে আছে শত-শত মাইল দূরে পাথরের মধ্যে। কিন্তু রাজপুত্রের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজের মেয়েকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে সে বলে উঠল, "এই তরুণ দেখছি আমার চেয়েও আশ্চর্য কাজ করতে পারে।"

রাজপুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া ছাড়া ডাইনির তখন আর কিছু করার ছিল না। তবু ফিস্‌ফিস্‌ করে মেয়েকে সে বলল, "নিজে পছন্দ না করে ইতর একটা লোককে বিয়ে করতে যাচ্ছিস—তোর লজ্জা হওয়া উচিত।"

মায়ের কথা শুনে রাজপুত্রের উপর চটে উঠে মেয়ে ভাবতে লাগল প্রতিশোধ নেবার কথা। তাই পরদিন সকালে তিনশোটা গাছের গুঁড়ি আনবার সে আদেশ দিল। তার পর সেগুলোয় আগুন ধরিয়ে সে বলল, "মায়ের তিনটে শর্ত পূর্ণ হয়েছে বটে। কিন্তু এই জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে রাজপুত্রের দলের কেউ একজন বসতে না পারলে আমি তাকে বিয়ে করব না।" সে ভেবেছিল কোনো ভৃত্যই তার প্রভুর জন্য পুড়ে মরতে রাজি হবে না। তাকে ভালোবাসে বলেই রাজপুত্রই জ্বলন্ত আগুনে বসতে গিয়ে পুড়ে মরবে আর সে তার হাত থেকে পাবে নিষ্কৃতি।

ভৃত্যেরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "কাঁপুনে-লোকটা ছাড়া সবাই আমরা কিছু-না-কিছু করেছি। এবার তার পালা।"

তাই সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তারা তাকে পাঠাল। তিন দিন তিন রাত ধরে ভয়ংকর আগুনটা জ্বলবার পর সেটা নিভল। আর তার পর ছাই গাদার মধ্যে দেখা গেল কাঁপুনে-লোকটা দাঁড়িয়ে হি-হি করে কাঁপছে। ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ তার নীল।

সে বলল, "এরকম ঠাণ্ডা জীবনে কখনো ভোগ করি নি। আরো কয়েকদিন এরকম ঠাণ্ডা চললে জমে মরে যেতাম।"

রাজকন্যের আর পালাবার কোন পথ রইল না। কিন্তু রাজপুত্র

এখন বিয়ে করার জন্য রাজকন্যেকে গির্জেয় নিয়ে চলেছে বুড়ি রানী বলল, "এই অপমান আমি আর সইতে পারছি না।" এই-না বলে মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য গির্জেয় সে পাঠাল একদল সৈন্য।

যে-ভৃত্যের শ্রবণশক্তি প্রখর সে কিন্তু শুনতে পেল বুড়ি রানী চুপি চুপি অফিসারদের যে-আদেশ দিচ্ছিল তার কথাগুলো।

মোটা লোকটাকে সে প্রশ্ন করল, "কী করা যায়?"

মোটা লোকটার মাথায় সঙ্গে-সঙ্গে একটা ফন্দি খেলে গেল। লোহিত-সাগর সে গিলেছিল। মুখ হাঁ করে সমুদ্রের জল খানিকটা সে ছাড়ল। ফলে যে সৈন্যদল গির্জেয় যাচ্ছিল তারা মরল ডুবে।

খবর পেয়ে ডাইনি তখন পাঠাল আরো একদল সৈন্য। কিন্তু যে-ভৃত্যের তীব্র চোখের তাপ সে তার ব্যাণ্ডেজ খুলে তাদের দিকে তাকাতে সঙ্গে-সঙ্গে তারা গুঁড়িয়ে গেল কাঁচের মতো।

তার পর বিনা বাধায় বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে গির্জের দোরগোড়া থেকে ছজন ভৃত্য নিল বিদায়।

তারা বলল, "তুমি যা-যা চেয়েছিলে সব-কিছু পেয়েছ। আমাদের কাজ শেষ। তাই বিদায় নিলাম।"

রাজপুত্রের কেল্লার কাছে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে একটি লোক তার শুয়োরের পাল চরাচ্ছিল।

রাজপুত্র তার বউকে বলল, "জান, আসলে আমি কে? আমি রাজপুত্তুর নই। যে লোকটা শুয়োর চরাচ্ছে সে আমার বাবা। শুয়োর চরানোই আমার পেশা। তোমাকে আর আমাকে এখন গিয়ে শুয়োরদের খাবার-দাবার দিতে হবে।"

এই-না বলে সে আর রাজকন্যে সরাইখানার সামনে ঘোড়া থেকে নামল। সরাইখানার মালিকের বউকে রাতে সে বলল রাজকন্যের রাজপোশাক নিয়ে পশমের এক জোড়া মোটা মোজা আর পুরনো একটা সায়া দিতে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর রাজকন্যে ভাবল, আমার গর্ব আর রুক্ষ স্বভাবের জন্যে উচিত শাস্তিই পেয়েছি। তার স্বামীর যে শুয়োর চরানো পেশা সে-বিষয়ে তার মনে কোনোই সন্দেহ রইল না। তার সঙ্গে সে বেরুল শুয়োরদের খাবার-দাবার দিতে।

এইভাবে কাটল আটটা দিন। এই কদিনে রাজকন্যের গা

কেটেকুটে ফুলে উঠেছিল। সে ভেবে পেল না আর কতদিন এভাবে কাজ করতে পারবে। তার পর একদিন কয়েকজন লোক এসে তাকে প্রশ্ন করল, "আসলে তোমার বর কে জান?" সে বলল, "জানি। শুয়োর চরানো তার পেশা। এইমাত্র কাজে সে শহরে গেছে।"

তারা বলল, "আমাদের সঙ্গে এসো। তোমাকে তোমার বরের কাছে নিয়ে যাব।" এই-না বলে তাকে তারা নিয়ে গেল সেই কেল্লায়। তাকে সাদর অভ্যর্থনা করার জন্য রাজপোশাক পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল রাজপুত্র।

রাজপুত্রকে প্রথমে সে চিনতে পারে নি। কিন্তু তাকে আলিঙ্গন করে রাজপুত্র বলল, "তোমার জন্যে আমাকে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে। তার তুলনায় সামান্য কষ্ট সইতে হল তোমায়।"

আর তার পর খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

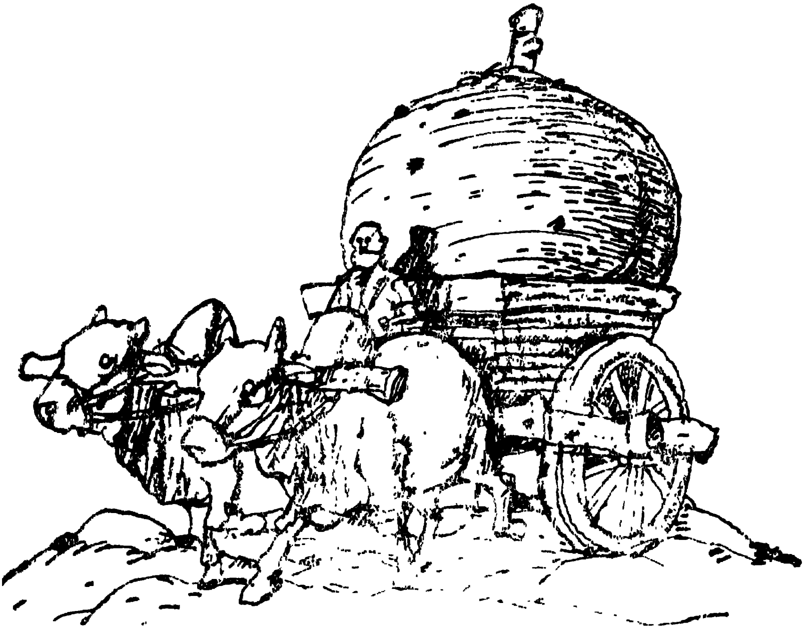

শালগম

এক সময় দুই ভাই ছিল। দুজনেই সৈনিক। একজন গরিব, অন্য জন ধনী। গরিব ভাই নিজের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য সৈনিকের পোশাক খুলে চাষীর কাজ করতে শুরু করল। নিজের ছোট্টো ক্ষেত কুপিয়ে, মই দিয়ে মাটি সমান করে সে পুঁতল শালগমের বীজ।

অল্পদিনের মধ্যেই বীজগুলো থেকে গাছ হল আর তার পর ফলল এমন বড়ো আর মোটা একটা শালগম যার জুড়ি কেউ কখনো দেখে নি, কেউ কখনো দেখবেও না। সেটাকে বলা যেতে পারে 'শালগমের রাজা'। বাড়তে বাড়তে শেষটায় সেটা এমন প্রকাণ্ড হয়ে উঠল যে, পুরো একটা গাড়ির মধ্যে কোনোরকমে সেটা কুলল। গাড়িটা টানার জন্য দরকার পড়ল দুটো ষাঁড়ের। চাষী বুঝতে পারল না সেটা নিয়ে কী করবে। বুঝতে পারল না—সেটা তার সৌভাগ্য আনবে না দুর্ভাগ্য আনবে।

শেষটায় ভাবল, এটা বিক্রি করলে খুব বেশি দাম পাব না। খেতে হলে তো ছোটো শালগমগুলো রয়েছে। সব চেয়ে ভালো—রাজাকে এটা উপহার দেওয়া।

তাই সেটাকে গাড়িতে তুলে দুটো ষাঁড় জুতে রাজপ্রাসাদে গিয়ে শালগমটা সে উপহার দিল রাজাকে। রাজা বললেন, "কী অদ্ভুত! আমি বহু আশ্চর্য জিনিস দেখেছি কিন্তু এরকম প্রকাণ্ড শালগম কখনো দেখি নি। কী রকম বীজ থেকে এটা ফলেছে? নাকি তুমি ভাগ্য-দেবীর সন্তান?"

চাষী বলল, "না, না, মহারাজ! ভাগ্যদেবীর সন্তান আমি নই। আমি গরিব সৈনিক। কিন্তু অভাবের তাড়নায় সৈনিকের লাল কোট খুলে জমি চষতে শুরু করি। আমার এক ভাই আছে। সে ধনী। তাকে আপনি চেনেন। আমি গরিব বলে সবাই আমাকে ভুলে গেছে।"

তার কথা শুনে তার জন্য রাজার দুঃখ হল। তাই তাকে তিনি বললেন, "গরিব হয়ে তোমাকে আর থাকতে হবে না। তোমাকে অনেক ধন-সম্পত্তি দেব। ভাইয়ের মতোই তুমি ধনী হয়ে উঠবে।" এই-না বলে তাকে তিনি দিলেন রাশিরাশি টাকাকড়ি, অনেক গোরু-ভেড়া-ছাগল আর বহু বিঘে জমি। ভাইয়ের চেয়েও অনেক বেশি ধনী তাকে তিনি করে তুললেন।

গরিব ভাই একটা শালগম দিয়ে প্রচুর ধন-সম্পত্তি পেয়েছে শুনে ধনী ভাই ভাবতে লাগল রাজার কাছ থেকে কী করে সে-ও অত ধন-সম্পত্তি আদায় করতে পারে। ভেবে ভেবে সে স্থির করল কাজটা সে হাসিল করবে তার ভাইয়ের চেয়েও অনেক বেশি চালাকি করে। তাই সে অনেক মোহর আর ঘোড়া রাজাকে উপহার দিল। ভেবেছিল—একটা শালগমের বিনিময়ে গরিব ভাই অত ধন-সম্পত্তি পেয়ে থাকলে তার মোহর আর ঘোড়াগুলোর বিনিময়ে রাজা তাকে দেবেন আরো অনেক বেশি ধন-সম্পত্তি।

উপহারগুলো গ্রহণ করে রাজার মনে হল সেই শালগমটার চেয়ে ভালো আর অসাধারণ জিনিস প্রতিদানে দেবার মতো তাঁর কাছে আর কিছু নেই।

তাই ধনী লোককে তার ভাইয়ের শালগমটাই গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে হল। বাড়ি ফিরে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে সে ভেবে পেল না

কার উপর গায়ের ঝাল মেটানো যায়। শেষটায় সে স্থির করল ভাইকে খুন করবে।

তাই সে গুণ্ডা আর খুনেদের ভাড়া করে একটা জায়গায় তাদের লুকিয়ে রেখে ভাইকে গিয়ে বলল, "আমি একটা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। চল—দুজনে মিলে গিয়ে সেটা খুঁড়ে বার করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নি।" তার ভাই সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে কোনো-রকম সন্দেহ না করে বেরুল তার সঙ্গে।

কিন্তু খানিকটা যেতে-না-যেতেই খুনেদের দল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে নিয়ে চলল একটা গাছে লট্‌কে দিতে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কিছু দূর থেকে শোনা গেল দরাজ গলার গান আর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। তাই তারা ঘাবড়ে গিয়ে তাকে ছালায় ভরে একটা গাছে ঝুলিয়ে সেখান থেকে দিল চম্পট। লোকটি কোনোরকমে ছালার উপরে গর্ত করে মাথাটা বার করল।

দেখা গেল এক তরুণ ছাত্র মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

ছালার মধ্যেকার লোকটি তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।"

ছাত্র চার দিকে তাকাল, কিন্তু ভেবে পেল না স্বরটা কোথা থেকে আসছে। তাই সে প্রশ্ন করল, "কে আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছ?"

অন্য লোকটি তখন ডালপালার মধ্যে থেকে জবাব দিল, "ওপর দিকে তাকিয়ে দেখো। আমি এখানে জ্ঞানের ঝুলির মধ্যে বসে আছি। খুব অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখেছি। আর কদিনের মধ্যেই সব-কিছু শিখে ফেলব। তখন আসব নেমে—পৃথিবীতে আমার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ থাকবে না। তারার ভাষা, বাতাসের ভাষা, বালি আর সমুদ্রের ভাষা আমি জানি। জানি অসুখ সারাতে, গাছ-গাছড়া, পাথর আর পাখিকে কাজে লাগাতে। তুমি এখানে এলে বুঝবে এই জ্ঞানের ঝুলি থেকে কী রকম আশ্চর্য সব জ্ঞান বইছে।"

কথাগুলো শুনে খুব অবাক হয়ে ছাত্র বলল, "ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। এই ঝুলির মধ্যে আমিও কি ঢুকতে পারি না?"

অন্যজন তখন কৃত্রিম অনিচ্ছার সুরে বলল, "তোমাকে খুব অল্প সময়ের জন্যে এখানে ঢুকতে দেব। কিন্তু তোমাকে ঘণ্টাখানেক

অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এখনো কিছুটা শেখা আমার বাকি আছে।"

খানিক অপেক্ষা করার পর ছাত্রর একঘেয়ে ধরে গেল। তাই মিনতি করে বলল তাকে ঢুকতে দিতে—কারণ জ্ঞান-পিপাসা সে আর সইতে পারছে না।

ঝুলির লোক তখন রাজি হবার ভান করে বলল, "জ্ঞানের ঝুলি থেকে আমাকে বেরুতে হলে দড়ি দিয়ে ঝুলিটা তোমায় নামাতে হবে। তার পর তুমি ঢুকবে।"

তার কথামতো ঝুলিটা নামিয়ে সেটার মুখ খুলে লোকটির বাঁধন সে আলগা করে দিল। তার পর ঝুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঢুকতে চেষ্টা করে সে বলল, "চট্‌পট্‌ আমায় এবার তুলে দাও।"

অন্যজন তখন চেঁচিয়ে বলল, "থামো! ওভাবে ঢোকে না।" এই-না বলে তার মাথাটা গুঁজড়ে ঝুলির মধ্যে ভরে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রকে সে তুলে দিল গাছের উপর। ঝুলিটা যখন শূন্যে দুলছে লোকটি তখন যাবার সময় তাকে চেঁচিয়ে বলল, "কেমন লাগছে, ভায়া? জ্ঞান ইতিমধ্যেই তোমার কাছে আসতে শুরু করেছে বলে নিশ্চয়ই টের পাচ্ছ। চট্‌পট্‌ তুমি এগিয়ে চলেছ। বুদ্ধি আরো না বাড়া পর্যন্ত ওখানে চুপচাপ বসে থেকো।" এই-না বলে ছাত্রের ঘোড়ায় চেপে সে চলে গেল। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লোক পাঠাল তাকে নামিয়ে আনার জন্য।

বারোজন কুঁড়ে

একবার বারোজন লোক সারাদিন কুঁড়েমি করে কাটাল। সন্ধেতেও কোনো-কিছু করতে তাদের ইচ্ছে হল না। তাই ঘাসের উপর শুয়ে তারা শুরু করল নিজেদের কুঁড়েমি নিয়ে বড়াই করতে।

এক নম্বর কুঁড়ে বলল, "তোমাদের কুঁড়েমির কথা শুনে আমার কী লাভ? আমার কাছে আমার কুঁড়েমিই যথেষ্ট। আমার একমাত্র চিন্তা নিজের শরীরের তদারক করা। আমি খুব কম খাই না, পান করি আরো বেশি। চারবার ভর-পেট খাবার পর আবার খিদে না পাওয়া পর্যন্ত আমি উপোস করি। ভোরে কখনো উঠি না। দুপুর হতে-না-হতে আবার গড়িয়ে নেবার সময় হয়ে যায়। মনিব ডাকলে না শোনার ভান করি। দ্বিতীয়বার ডাকাডাকি করলে ওঠবার আগে আরো খানিক বিশ্রাম নিই। তার পর যাই যত পারি ধীরে-সুস্থে। জীবনটাকে শুধু এইভাবেই বরদাস্ত করা যায়।"

দু নম্বর কুঁড়ে বলল, "আমাকে একটা ঘোড়ার দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু সারাদিন তার মুখের লাগাম খুলি না। ইচ্ছে না হলে তাকে খেতেই দিই না। এমন ভাব দেখাই—যেন খেয়েছে। তার পর আস্তাবলে শুয়ে চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নি। তার পর এক পা বাড়িয়ে দু-একবার রগড়ে দি তার গা। এর বেশি ঘোড়াটার পরিচর্যা কখনো করি না। বেশি করে লাভটা কী? কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটা আমার পক্ষে খুব পরিশ্রমের।"

তিন নম্বর কুঁড়ে বলল, "অত কাজের ঝামেলা নাও কেন? তাতে

গ্রিম—২-১১

তোমার কোনো লাভ নেই। রোদে শুয়ে আমি ঘুমোই। বৃষ্টি পড়লে ওঠার দরকার কী? বৃষ্টিকে আমি তো বলি—যত পারিস পড় গে যা। একবার ভীষণ এক ঝড় আমার সব চুল উঠিয়ে নিয়ে যায়, ফুটো করে দেয় মাথার খুলিটা। ফুটোটার ওপর একটা প্লাস্টার সেঁটে দিই—ব্যাস্। এ ধরনের দুর্ঘটনা আমার প্রায়ই ঘটে।"

চার নম্বর কুঁড়ে বলল, "কোনো কাজ করতে হলে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে আগে ঘণ্টাখানেক গড়িমসি করে নি। তার পর কাজ শুরু করি খুব ধীরে সুস্থে। সব সময়েই জিগেস করি—আমাকে সাহায্য করার কেউ আছে কি না। কেউ সাহায্য করতে এলে তাকে দিয়েই করিয়ে নি সব চেয়ে পরিশ্রমের অংশটা। কিন্তু বাকি যেটা থাকে সেটাও আমার পক্ষে খুবই বেশি।"

পাঁচ নম্বর কুঁড়ে বলল, "আমার কথাটা একবার ভাব। আস্তাবল থেকে সার বয়ে এনে গাড়িতে করে নিয়ে যেতে হয়। খুব ধীরে-ধীরে কাজটা করি। কোদাল দিয়ে খানিকটা সার তুলে গাড়িতে ফেলার আগে মিনিট পনেরো আমি বিশ্রাম করি। সারাদিন এক গাড়ি সার নিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট, খেটে-খেটে মরবার আমার ইচ্ছে নেই।"

ছ নম্বর কুঁড়ে বলল, "নিজেদের জন্যে তোমাদের লজ্জা করে না? কাজ করতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু প্রায়ই পোশাক-টোশাক না খুলে হপ্তা তিনেক আমি শুয়ে থাকি। জুতোয় ফিতে বাঁধার কী দরকার? আমি তো আমার বুটজোড়ায় ফিতে-টিতে বাঁধি না। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় এক পায়ের পেছনে অন্য পা-টাকে আমি টেনে আনি খুব ধীরে-ধীরে। প্রথম ধাপে থেকে আমি গুণে নি কতগুলো ধাপ আছে। তাতে হিসেব করতে সুবিধে হয়—কোন ধাপে বসে বিশ্রাম করব।"

সাত নম্বর কুঁড়ে বলল, "তোমাদের মতো কাজ করলে আমার চলে না। কারণ আমার মনিব আমার কাজের ওপর নজর রাখেন। কিন্তু কপাল ভালো—প্রায় সব সময়েই তিনি থাকেন বাইরে। কিন্তু তাতেও কোনো কাজে ফাঁকি দিই না। কেউ দেখলে প্রায়ই এমনভাবে ছুটোছুটি করি—যেন কাজ থেকে আমাকে টেনে সরাতে হলে জনা চারেক জোয়ান লোকের দরকার। কাউকে ঘুমোতে দেখলে আমিও শুয়ে পড়ে ঘুমোই। আর ঘুম থেকে আমায় জাগায় কার সাধ্যি। আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হলে নিয়ে যেতে হয় কাঁধে করে।"

আট নম্বর কুঁড়ে বলল, "দেখছি তোমাদের মধ্যে আমিই সব চেয়ে কাজের। আমার সামনে কোনো পাথর পড়ে থাকলে সেটা ডিঙোবার জন্যে পা আমি ওঠাই না। তার পর যদি পড়ে যাই, পোশাক যদি সপ্‌সপে হয়ে ভিজে কাদা-মাখামাখি হয়ে যায়—আমি শুয়েই থাকি, যতক্ষণ-না রোদে সেটা শুকোয়। বড়ো জোর এক পাশ ফিরে অন্য পাশটা শুকিয়ে নি।"

ন নম্বর কুঁড়ে বলল, "তোমাদের চেয়ে আমি অনেক বেশি কুঁড়ে। আজ আমার সামনে রুটি ছিল। কিন্তু এমন কুঁড়েমি লাগল যে হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে পারি নি। তার পাশে ছিল এক জগ্‌ জল। কিন্তু এতই বড়ো আর ভারী যে আমার পক্ষে সেটা তোলার প্রশ্নই ওঠে না। তাই তেষ্টা চেপে আছি। পাশ ফেরাটাও ভারি ঝকমারির কাজ। তাই সারাদিন মড়ার মতো শুয়ে কাটিয়েছি।"

দশ নম্বর কুঁড়ে বলল, "কুঁড়েমির জন্যে আজ আমি আহত হয়েছি। পথের মধ্যে তিনজন আমরা শুয়েছিলাম। একটা পা আমার বাড়ানো ছিল। একটা গাড়ির চাকা আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। পা-টা নিশ্চয়ই আমি সরিয়ে নিতাম। কিন্তু গাড়ি আসার শব্দ আমি শুনতে পাই নি। ডাঁশ মশাগুলো আমার কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ করছিল—কতকগুলো ঢুকছিল আমার নাকে মুখে। মশাগুলো তাড়াবার ঝামেলা কে পোয়াবে বল? আমার পায়ের গাঁট ভেঙে গেছে, পায়ের ডিম ফুলে উঠেছে।"

এগারো নম্বর কুঁড়ে বলল, "গতকাল আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। মোটা-মোটা ভারী ভারী বই বয়ে বয়ে আনতে আর ইচ্ছে করছিল না। বইগুলোর যেন শেষ নেই। সত্যি কথা বলতে কি মনিব আমাকে আগেই নোটিশ দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর পোশাক-আশাক আমি ধুলোর মধ্যে রেখেছিলাম। সেগুলো পোকায় কেটে দিয়েছিল। চাকরি যাওয়ায় আমি খুব খুশি।"

বারো নম্বর কুঁড়ে বলল, "আজ সকালে মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা মালগাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল। খড়ের একটা বিছানা বানিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমার হাত থেকে লাগামগুলো খসে পড়ে। ঘুম ভাঙতে দেখি টানা-হেঁচড়া করে ঘোড়াটা নিজেকে প্রায় খুলে ফেলেছে। ঘোড়ার সাজ—স্ট্র্যাপ্‌, কলার, লাগাম—কিছুই নেই।

কোনো লোক পাশ দিয়ে যাবার সময় নিশ্চয়ই সেগুলো খুলে নিয়ে পালিয়েছিল। তার ওপর একটা চাকা গর্তে পড়ে কাদায় শক্ত হয়ে গিয়েছিল আটকে। গাড়ি যেমন ছিল তেমনি থাকে। আবার আমি খড়ের বিছানায় গা ঢেলে দি। শেষটায় মনিব এসে নিজেই ঠেলে গাড়িটা তোলেন। তিনি না এলে এখনো সেখানে শুয়ে শান্তিতে নাক ডাকিয়ে ঘুমতাম—এখানে আসতাম না।"

শজারু হান্‌স্‌

এক সময় এক চাষীর প্রচুর টাকাকাড়ি আর জমিজমা ছিল। কিন্তু তার মনে সুখ ছিল না। কারণ তার স্ত্রীর ছেলেপুলে হয় নি। অন্য চাষীদের সঙ্গে সে যখন শহরে যেত প্রায়ই তারা বিদ্রূপ করে তাকে প্রশ্ন করত—কেন তার সন্তান নেই। তাদের ঠাট্টা-তামাশায় ভীষণ চটে এক রাতে বাড়ি ফিরে সে বলল, "যেমন করে হোক আমার একটি সন্তান চাই। সে শজারু হলেও সই।"

কিছুদিন পরেই তার স্ত্রীর কোলে এক শিশু এল। অর্ধেকটা তার মানুষের চেহারা, অর্ধেকটা শজারুর। শিশুকে দেখে আঁতকে উঠে তার বউ চীৎকার করে উঠল, "দেখ কী করেছ। এটা তোমারই দোষ। আমাদের কেউ তুক্‌ করেছে।"

চাষী বলল, "এর ধর্মপিতা কেউ না হলেও ছেলের নামকরণ করতেই হবে।"

তার বউ বলল, "এর একমাত্র নাম দেওয়া যায়—'শজারু হান্‌স্‌'।"

নামকরণ অনুষ্ঠানের পর যাজক বললেন, "গায়ের কাঁটার জন্যে শিশুকে সাধারণ বিছানায় শোয়ানো অসম্ভব।" তাই উনুনের পিছনে

খড়ের বিছানা করে তার উপর শোয়ানো হল শজারু হান্‌স্‌কে। মায়ের কোলে সে উঠতে পারত না। কারণ উঠতে গেলেই চাষীর বউয়ের গায়ে কাঁটা ফুটে যেত। তাই আট বছর ধরে সে শুয়ে রইল উনুনের পিছনে। চাষী তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠল। মনে-মনে সে কামনা করত—ছেলেটা যেন মরে। কিন্তু শজারু হান্‌স্‌ মরল না।

সেবার শহরে মস্ত মেলা বসেছিল। চাষী তার বউকে প্রশ্ন করল, "মেলা থেকে তোমার জন্যে কী আনব?"

তার বউ বলল, "খানিকটা ভালো মাংস আর দুটো রুটি।"

তার পর দাসীকে সে প্রশ্ন করল, তার জন্য কী আনবে। দাসী বলল, "কিছু টফি আর একজোড়া সুতির মোজা।"

তার পর শজারু হান্‌স্‌-এর দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল, "কি রে শজারু, তোর জন্যে কী আনব?"

সে বলল, "বাবা, আমার জন্যে ব্যাগপাইপ এনো।"

[ব্যাগপাইপ—থলি লাগানো এক ধরনের বাঁশি]

মেলা থেকে ফিরে চাষী তার বউকে দিল মাংস আর রুটি, দাসীকে দিল টফি আর মোজা। তার পর উনুনের পিছনে গিয়ে হান্‌স্‌কে দিল ব্যাগপাইপ।

ছেলে বলল, "ধন্যবাদ বাবা। এবার কামারকে গিয়ে বল আমার পোষা মোরগের পায়ে লোহার নাল লাগিয়ে দিতে। তার পিঠে চড়ে আমি চলে যাব। আর কখনো ফিরব না।"

তার কথা শুনে বেজায় খুশি হয়ে মোরগের পায়ে লোহার নাল লাগিয়ে আনল চাষী আর তার পিঠে চড়ে চলে গেল শজারু হান্‌স্‌। হান্‌স্‌-এর পিছন পিছন গেল শুয়োর আর গাধার দল। তার ইচ্ছে ছিল বনে তাদের রাখে।

বনে পৌঁছবার পর মোরগ তাকে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের মগডালে। সেখানে বসে সে নজর রাখত তার শুয়োর আর গাধার পালের উপর। সেই মগডালে বসে তার অনেক বছর কেটে গেল। চাষী তার কোনো খবর পেল না। ব্যাগপাইপে সে বাজাত নানা আশ্চর্য সুর। একদিন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে রাজা সেই অদ্ভুত সুর শুনতে পেলেন। সুরটা কোথা থেকে আসছে কিছুতেই রাজা হদিশ করতে পারলেন না। তাই অনুচরদের তিনি পাঠালেন খোঁজ নিতে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা দেখে—গাছের মগডালে পোষা মোরগের মতো একটা জন্তু আর তার পিঠে শজারুর মতো দেখতে একটা জীব বসে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে।

রাজা তখন তাঁর অনুচরদের বললেন শজারু হান্‌স্‌কে জিগেস করতে—কেন সে গাছে বসে আর তাঁর দেশে ফেরার পথ সে দেখিয়ে দিতে পারবে কি না, কারণ তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

গাছ থেকে নেমে এসে হান্‌স্‌ বলল, "হ্যাঁ, পথটা আমি দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু রাজাকে নিজের নাম সই করে লিখে দিতে হবে—কেল্লায় ফেরার পর আঙিনায় যার সঙ্গে প্রথম তাঁর দেখা হবে তাকেই দিতে হবে আমাকে।"

রাজা ভাবলেন, 'এটা তো খুবই সহজ কাজ। আমি কি লিখি না লিখি একটা শজারু নিশ্চয়ই সেটা বুঝবে না।' তাই তিনি কাগজ-কলম নিয়ে ঘস্‌ঘস্‌ করে লিখে দিলেন আর হান্‌স্‌ও তাঁকে পথটা দেখিয়ে দিল।

নিরাপদে রাজা দেশে ফিরলেন। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখেছিল তাঁর মেয়ে। তাই সে ছুটে এল তাঁকে চুমু খেতে। সঙ্গে-সঙ্গে রাজার মনে পড়ল শজারু হান্‌স্‌-এর কথা। মেয়েকে তিনি বললেন, "বাছা, একটা অদ্ভুত জীবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। একটা মোরগের পিঠে বসে ব্যাগপাইপে আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর সুর বাজাচ্ছিল সে। আমি পথ হারিয়েছিলাম। সে বলেছিল, কেল্লায় ফিরে আঙিনায় যার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হবে তাকেই দিয়ে দেব বলে লিখে দিলে পথটা সে দেখিয়ে দেবে। আমি একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু ভাবিস না। কারণ আমি লিখেছিলাম, "হান্‌স্‌ কিচ্ছু পাবে না। জানতাম সে পড়তে পারে না।"

রাজকন্যের দুর্ভাবনা কেটে গেল। সে বলল, "কিছুতেই একটা শজারুর কাছে যেতে পারতাম না।"

এদিকে আগের মতোই শজারু হান্‌স্‌ গাছে বসে মনের আনন্দে বাজিয়ে চলল তার ব্যাগপাইপ।

কিছুদিন পরে অন্য এক রাজা চাকর-বাকর নিয়ে এলেন সেই পথে। কারণ তিনিও বনের মধ্যে পথ হারিয়েছিলেন। বাঁশির চমৎকার সুর শুনে ছোকরা চাকরকে তিনি বললেন, "দেখে আয় তো কী ব্যাপার।"

গাছটার কাছে গিয়ে ছোকরা চাকর দেখল মগডালে মোরগের পিঠে হান্‌স্ বসে আছে। সে প্রশ্ন করল, "মগডালে বসে বসে কী করছ ?"

"আমার গাধা আর শুয়োরের পালের ওপর নজর রাখছি। তুমি কী চাও ?"

"আমরা পথ হারিয়েছি। তুমি না দেখিয়ে দিলে সেটা খুঁজে পাব না।"

মোরগের সঙ্গে হান্‌স্ গাছ থেকে নেমে এল। তার পর বুড়ো রাজাকে বলল, "মহারাজ, কেল্লায় ফিরে আঙিনায় যার সঙ্গে প্রথম আপনার দেখা হবে তাকে আমায় দিয়ে দেবেন বলে লিখে দিলে পথটা আপনাকে দেখিয়ে দেব।"

সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে কাগজে সই করে দিলেন রাজা।

হান্‌স্ তার মোরগ-ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে গিয়ে পথটা দেখিয়ে দিল।

নিরাপদে নিজের কেল্লায় তিনি ফিরলেন। আর আঙিনায় যেমনি আসা অমনি তাঁর রূপসী একমাত্র মেয়ে ছুটে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে বলল, বাবাকে ফিরতে দেখে সে খুব খুশি হয়েছে।

রাজকন্যে তার পর জানতে চাইল রাজার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। সব ঘটনার কথা জানিয়ে বুড়ো রাজা তাঁর মেয়েকে বললেন, "শজারুকে লিখে দিয়েছি, আঙিনায় যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে তাকে দিয়ে দেব। তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হল। তোকে দিয়ে দিতে হবে ভেবে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে!"

রাজকন্যে বলল, "তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যে যদি আমায় যেতেই হয় তা হলে নিশ্চয়ই আমি যাব।"

এদিকে সংখ্যায় বাড়তে-বাড়তে হান্‌স্-এর শুয়োরের পালে পুরো বন ভরে গেল। শজারু হান্‌স্-এর তখন মনে হল বন ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে। বাবাকে সে খবর পাঠাল গ্রামের সমস্ত আস্তাবল, গোয়াল আর খোঁয়াড় ভাড়া করতে। কারণ অসংখ্য শুয়োরের পাল নিয়ে সে ফিরছে।

খবর পেয়ে চাষী বেজায় বিরক্ত হল। কারণ সে ধরে নিয়েছিল হান্‌স্ অনেক আগেই মরেছে।

তার পর হৈ-হৈ করে জন্তুর পাল নিয়ে হান্‌স্ ফিরল নিজের গ্রামে। সেখানে সেরকম হট্টগোল আগে কখনো শোনা যায় নি।

কিছুকাল কাটার পর হান্‌স্‌ আবার বলল, "বাবা, কামারকে দিয়ে আমার মোরগের পায়ে আবার লোহার নাল পরিয়ে আনো। আমি তার পিঠে চড়ে চলে যাব। আর কখনো ফিরব না।"

চাষী সঙ্গে-সঙ্গে মোরগের পায়ে লোহার নাল পরিয়ে আনল। ছেলে কখনো আসবে না ভেবে হল বেজায় খুশি।

শজারু হান্‌স্‌ তার মোরগে চেপে সোজা গেল প্রথম রাজার রাজত্বে। রাজা আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তার মতো কোনো জীব মোরগে চেপে ব্যাগপাইপ বাজাতে-বাজাতে কখনো হাজির হলে সঙ্গে-সঙ্গে তীরন্দাজরা যেন হাজার তীর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলে। তাই হান্‌স্‌ সেখানে পৌঁছতেই তীরন্দাজরা তুলল তাদের ধনুক। কিন্তু কেল্লার সিংহদ্বারের অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে মোরগ তাকে নিয়ে এল রাজার জানলায়। হান্‌স্‌ তখন চেঁচিয়ে রাজাকে বলল, তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে। নইলে রাজা আর রাজকন্যেকে সে মেরে ফেলবে।

রাজা তাই তাঁর মেয়েকে বললেন, তাঁদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য হান্‌স্‌-এর সঙ্গে তাকে যেতে। রাজকন্যে পরল সাদা পোশাক। রাজা মেয়েকে দিলেন ছয় ঘোড়ায়-টানা একটা জুড়িগাড়ি, জমকালো উর্দি-পরা চাপরাসি, অনেক মোহর আর হীরে-জহরত। তার মোরগ আর ব্যাগ-পাইপ নিয়ে হান্‌স্‌ উঠল জুড়িগাড়িতে। রাজকন্যে বসল তার পাশে। রাজা ভাবলেন, মেয়েকে জীবনে আর দেখতে পাবেন না।

কিন্তু রাজা যা ভেবেছিলেন মোটেই সেরকমটা ঘটল না। কারণ শহর ছেড়ে খানিকটা যাবার পর শজারু হান্‌স্‌ তার কাঁটা দিয়ে রাজকন্যের পোশাক কুটিকুটি করে কাঁটাগুলো তার শরীরে বিঁধিয়ে রক্ত বার করে ফেলল। তার পর রাজকন্যেকে বলল, "তোমার গর্ব আর তোমার বাবার মিথ্যে কথা বলার এই হচ্ছে পুরস্কার। দূর হও! তোমাকে আমি চাই না।" এই-না বলে রাজকন্যেকে গাড়ি করে সে বাড়ি পৌঁছে দিল। সেখানে বাকি জীবন রাজকন্যের কাটল লজ্জায় আর অপমানে।

তার পর ব্যাগপাইপ নিয়ে মোরগে চেপে হান্‌স্‌ গেল দ্বিতীয় রাজার রাজত্বে। তিনি আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, শজারু হান্‌স্‌-এর মতো চেহারার কেউ এলে প্রহরীরা যেন সসম্মানে নিয়ে আসে তাকে কেল্লার মধ্যে। রূপসী রাজকন্যে তার অদ্ভুত চেহারা দেখে ভীষণ ভয় পেল, কিন্তু মুখে তার ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল না।

হান্‌স্‌কে সে সাদর সম্ভাষণ জানাল আর তার পর তাদের হল বিয়ে। রাতে শুতে গিয়ে হান্‌স্‌-এর কাঁটাগুলোর কথা ভেবে সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। কিন্তু হান্‌স্‌ তাকে বলল, "ভয় পেয়ো না। তোমার কোনো ক্ষতি করব না।" তার পর বুড়ো রাজাকে বলল, "মহারাজ, শোবার ঘরের পাশের ছোটো ঘরে চারজন প্রহরীকে বলবেন, গন্‌গনে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে। শোবার ঘরে যাবার আগে শজারুর খোলস ছেড়ে আমি বেরিয়ে আসব। সঙ্গে-সঙ্গে তারা যেন সেটা পুড়িয়ে ফেলে।"

রাত এগারোটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শোবার ঘরে যাবার আগে হান্‌স্‌ তার কাঁটার খোলস গা থেকে ঝেড়ে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রহরীরা ছুটে এসে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আগুনে পোড়াল। মানুষের চেহারায় হান্‌স্‌ গিয়ে শুলো বিছানায়। কিন্তু তার গায়ের রঙ হয়ে রইল কয়লার মতো কুচ্‌কুচে কালো। রাজা রাজবদ্যিদের ডেকে পাঠালেন। হান্‌স্‌কে তারা ভালো করে স্নান করিয়ে নানা প্রলেপ মাখাল। শেষটায় তার রঙ হয়ে উঠল ফরসা, আর চেহারা হল তরুণ রাজপুত্রের মতো। তার চেহারা পালটে যেতে রাজকন্যে হল ভীষণ খুশি। তার পরদিন রাজা আয়োজন করলেন বিরাট এক ভোজসভার। আর বুড়ো রাজার মৃত্যুর পর শজারু হান্‌স্‌ই হল সে-দেশের রাজা।

অনেক বছর বাদে বউকে নিয়ে হান্‌স্‌ গেল তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বুড়ো চাষী প্রথমে বিশ্বাস করতেই চাইল না—সে তার ছেলে। বলল, তার ছেলে জন্মেছিল শজারুর কাঁটা নিয়ে। কিন্তু সব কথা শোনার পর শেষটায় তার সন্দেহ কেটে গেল আর ছেলের সঙ্গে তার রাজত্বে বুড়ো চাষী যখন ফিরল তখন তার গর্ব আর আনন্দ আর ধরে না।

ডাকাত বর

এক সময় এক জাঁতাওয়ালার ছিল খুব সুন্দরী এক মেয়ে। মেয়েটি বড়ো হতে তার বাবা ভাবল ভালো ঘরে তার বিয়ে দেবে। আপন মনে সে বলল, 'ভদ্রগোছের কেউ এসে বিয়ে করতে চাইলে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব।'

কিছুদিন পরে একজন এল মেয়েটিকে বিয়ে করতে। দেখে মনে হল তার অবস্থা খুবই ভালো। জাঁতাওয়ালা তার কোনো খুঁত দেখতে পেল না। তাই তাকে সে কথা দিল, মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। মেয়েটির কিন্তু মোটেই তাকে মনে ধরল না। তাকে পারল না একেবারেই বিশ্বাস করতে। তার মুখের দিকে তাকালেই মেয়েটির বুক বিতৃষ্ণায় ভরে যেত। একদিন লোকটি তাকে বলল, "তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক, তবু কখনো আমার বাড়িতে তুমি আস নি।"

মেয়েটি বলল, "তোমার বাড়ি যে কোথায় তা তো জানি না।"

তার ভাবী স্বামী বলল, "আমার বাড়ি বনের গহনে।"

মেয়েটি ভাব দেখাতে লাগল—বাড়ি যাবার পথ সে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তার ভাবী বর জোর দিয়ে বলল—সামনের রবিবার তাকে আসতেই হবে। বলল, "তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে অনেককে আমি নেমন্তন্ন করেছি। পথ যাতে না হারাও তার জন্যে পথটায় আমি ছাই ছড়িয়ে রাখব।"

রবিবার এলে পর মেয়েটি যাত্রা করল। কিন্তু কেন জানে না, ভয়ে দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল তার বুক। পথে চিহ্ন রাখার জন্যে পকেটে

সে ভরে নিল মসুর আর মটরদানা। বনের মুখে সে দেখল ছাই ছড়ানো রয়েছে। সেই ছাই-এর চিহ্ন ধরে সে চলল এগিয়ে। কিন্তু এক পা করে সে যায়, আর ডাইনে-বাঁয়ে ছড়াতে থাকে মুঠো-মুঠো মটরদানা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটার পর বনের এমন একটা জায়গায় পৌঁছল, যেখানটা সব চেয়ে ঘন আর অন্ধকার। সেখানে দেখে একটামাত্র বাড়ি। বাড়িটা দেখে মোটেই তার ভালো লাগল না। কেমন যেন একটা গা-ছম্‌ছম্‌-করা ভাব সেখানে। বাড়ির মধ্যে গিয়ে সে দেখে সেটা খালি—কোনোখানে কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল :

"নেইকো তোমার জানা
এটা কসাইখানা?
পালাও কনে পালাও।"

মেয়েটি উপর দিকে তাকিয়ে দেখে দেয়ালে ঝোলানো বেতের একটা খাঁচা থেকে একটা পাখি চেঁচাচ্ছে। পাখিটা আবার চেঁচিয়ে উঠল :

"নেইকো তোমার জানা
এটা কসাইখানা?—
পালাও কনে পালাও।"

মেয়েটি তখন একের পর এক ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কিন্তু কোথাও কারুর দেখা পেল না। ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় সে পৌঁছল মাটির নীচের ঘরে। দেখে, সেখানে এক থুন্‌থুনে বুড়ি বসে, বাতে তার মাথাটা ঢক্‌ঢক্‌ করে নড়ছে।

মেয়েটি তাকে প্রশ্ন করল, "আমার ভাবী বর কি এখানে থাকে?"

বুড়ি বললে, "বাছা, তুমি ফাঁদে পড়েছ। এটা খুনেদের আস্তানা। ভাবছ, শিগ্‌গিরই বুঝি তোমার বিয়ের ভোজ খাবে। আসলে বিয়ে-টিয়ে নয়। তোমাকে এরা খুন করবে। ঐ ভারী কেত্‌লিতে আমি জল ফুটতে দিয়েছি। তোমাকে বাগে পাবার সঙ্গে-সঙ্গে কেটেকুটে ওরা খেয়ে ফেলবে। ওদের মায়া-দয়া নেই। ওরা মানুষখেকো। আমি না বাঁচালে তোমার কোনো আশাই নেই।" এই-না বলে, একটা মস্ত পিপের পিছনে বুড়ি তাকে লুকিয়ে ফেলল।

তার পর বলল, "ইঁদুরের মতো একেবারে চুপচাপ থাকো। একটা

চুলও নড়বে না। নড়লে-চড়লেই তোমার দফা শেষ। আর রাতে ডাকাতরা ঘুমিয়ে পড়লে দুজন আমরা পালাব। অনেকদিন ধরে পালাবার সুযোগ আমি খুঁজছিলাম।"

তার কথাগুলো মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই নিষ্ঠুর ডাকাতের দল ফিরল। তারা ধরে এনেছিল আর-একটি মেয়েকে। এমনই তখন তাদের মাতাল অবস্থা যে মেয়েটির কান্নাকাটি বা কাকুতি-মিনতিতে একেবারেই তারা কান দিচ্ছিল না। মেয়েটিকে তারা খাওয়াল এক গেলাস সাদা, এক গেলাস লাল আর এক গেলাস হলদে সুরা। আর তার পরেই মেয়েটির কল্‌জে গেল ফেটে। তখন তারা তার চমৎকার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, তাকে একটা টেবিলে শুইয়ে তার সুন্দর দেহটা টুকরো-টুকরো করে কেটে তার উপর নুন ছড়িয়ে দিল। তাই-না দেখে পিপের পিছনে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল সেই বিয়ের কনের সর্বাঙ্গ। বুঝল, ডাকাতদের হাতে তাকেও এইভাবে মরতে হবে। যে মেয়েটি খুন হল তার কড়ে আঙুলে একটা সোনার আংটি নজরে পড়ল এক ডাকাতের। আংটিটা সে টেনে-হিঁচড়ে খুলতে পারল না। তাই একটা কাটারি দিয়ে আঙুলটা সে ফেলল কেটে। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল পিপের ওপাশে বিয়ের কনের কোলে। একটা বাতি নিয়ে সেটা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল সেই ডাকাত। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না।

আর-একজন ডাকাত তাকে বলল, "পিপের পেছনটা দেখেছিস?"

তাই-না শুনে বুড়ি বলে উঠল, "এবার খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। কাল খুঁজলেই চলবে। আঙুলটা পালিয়ে যাবে না।"

ডাকাতরা বলল, "বুড়ির কথাই ঠিক।" এই-না বলে, খোঁজাখুঁজি ছেড়ে তারা বসল গিয়ে রাতের ভোজ খেতে।

তাদের সুরার সঙ্গে বুড়ি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। তাই খানিক পরেই ডাকাতরা শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করে দিল। তাদের নাক ডাকতে শুনে পিপের পিছন থেকে বেরিয়ে এল বিয়ের কনে। কিন্তু মেঝের উপর এমন গাদাগাদি করে ডাকাতরা শুয়েছিল যে, মেয়েটির ভয় হল ডিঙিয়ে যাবার সময় ডাকাতদের কেউ জেগে উঠতে পারে। কিন্তু ভগবান মেয়েটির সহায় ছিলেন। বুড়ি এসে তাকে দরজার কাছে নিয়ে গেল। তার পর তারা দুজনে পালাল খুনেদের

আস্তানা থেকে। বাতাসে পথ থেকে ছাই উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মসুর আর মটরদানা থেকে চারা উঠেছিল গজিয়ে। জ্যোৎস্নায় সেগুলো তারা স্পষ্ট দেখতে পেল। সারারাত তারা হাঁটল। পরদিন সকালে পৌঁছল জাঁতাকলে। তার পর মেয়েটি তার বাবাকে জানাল সব ঘটনার কথা।

যেদিন বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল, সেদিন পৌঁছল ডাকাত বর। জাঁতাওয়ালাও নেমন্তন্ন করেছিল তার আত্মীয়দের। খাবার টেবিল ঘিরে সবাই বসার পর স্থির হল প্রত্যেককে একটা করে গল্প বলতে হবে।

বিয়ের কনে স্থির হয়ে বসে রইল। একটি কথাও বলল না। ডাকাত বর তাকে বলল, "হ্যাঁগা, আমাদের বলার মতো একটা গল্পও জান না?"

মেয়েটি বলল, "একটা স্বপ্নের কথা তোমাদের বলি। একটা বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে শেষটায় পৌঁছই একটা বাড়িতে। বাড়িটা খালি, মানুষজন কেউ কোথাও নেই। কিন্তু দেয়ালে টাঙানো ছিল একটা খাঁচা। তাতে বসে বসে একটা পাখি গাইছিল :

'নেইকো তোমার জানা,
এটা কসাইখানা?
পালাও কনে পালাও।'

"মানিক আমার! এটা শুধু স্বপ্নই দেখেছিলাম। তার পর সব ঘরগুলোয় আমি ঘুরে বেড়াই। ঘরগুলো সব খালি। আমার গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। শেষটায় যাই মাটির তলাকার ঘরে! সেখানে দেখি এক থুন্‌থুনে বুড়ি বসে। বাতে তার মাথাটা চক্‌চক্‌ করে নড়ছে। আমি তাকে জিগেস করি—আমার ভাবী বর সেখানে থাকে কি না। সে বলে, 'বাছা, তুমি ফাঁদে পড়েছ। এটা খুনেদের আস্তানা। এখানে তোমার ভাবী বর থাকে। সে কিন্তু তোমায় কেটেকুটে রেঁধে খেয়ে ফেলবে।' মানিক আমার! এটা শুধুই আমার দেখা একটা স্বপ্ন। বুড়ি আমাকে একটা পিপের পেছনে লুকিয়ে রাখে। আর আমি লুকিয়ে পড়তে-না-পড়তেই ডাকাতরা বাড়ি ফেরে। টানতে-টানতে নিয়ে আসে তারা এক মেয়েকে। তার পর তাকে তিনরকম সুরা খেতে দেয়—সাদা, লাল আর হলদে। ফলে মেয়েটির কল্‌জে যায়

ফেটে। মানিক আমার! এটা শুধুই আমার দেখা একটা স্বপ্ন। তখন তারা তার চমৎকার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, তাকে একটা টেবিলে শুইয়ে তার সুন্দর দেহটা টুকরো টুকরো করে কেটে তার ওপর নুন ছড়িয়ে দেয়। মানিক আমার! এটা শুধুই আমার দেখা একটা স্বপ্ন! যে-মেয়েটি খুন হয়, তার কড়ে আঙুলে ছিল সোনার একটা আংটি। সেটা নজরে পড়ে এক ডাকাতের। আংটিটা সে টেনে-হিঁচড়ে খুলতে না পেরে একটা কাটারি দিয়ে আঙুলটা ফেলে কেটে। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে পিপের ওপাশে আমার কোলের মধ্যে। কথাগুলো বলে সেই কাটা কড়ে-আঙুলটা বার করে মেয়েটি দেখাল সবাইকে। বলল, "ওটার ওপর ঐ দেখো সেই আংটিটা।"

মেয়েটি যখন গল্পটা বলছিল তখন ক্রমশ সেই ডাকাতের মুখ খড়ির মতো সাদা হয়ে উঠতে থাকে। গল্প শেষ হলে সে চেষ্টা করল দৌড়ে পালাতে। কিন্তু অতিথিরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল। তার দলবলও ধরা পড়ল। আর তার পর বিচারে সবাইকারই ফাঁসির আদেশ হল।

কুঁড়ে হেইন্‌জ্‌

হেইন্‌জ্‌ ছিল কুঁড়ের বাদশা। মাঠে রোজ ছাগল চরাতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ তার ছিল না। তবু সন্ধেয় বাড়ি ফিরে সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য সে গোঙাত আর বলত :

"বছরের পর বছর মাঠে মাঠে ছাগল চরানো চাট্টিখানি কথা নয়। তার বদলে শুয়ে শুয়ে যদি ঘুমনো যেত। কিন্তু ঘুম আসবে কী করে? সারাদিন তো দু চোখ খুলে লক্ষ্য রাখতে হয় হতভাগাটা যাতে কচি কচি চারাগুলো না মুড়িয়ে ফেলে কিংবা বেড়া ভেঙে সেঁধিয়ে যায় লোকের বাগানে। ভারি ঝকমারির কাজ। লোকে হাত-পা মেলে খানিক আয়েস করবে কী করে?"

একবার সারা রাত ধরে সে ভাবল কী করে এই ঝকমারির কাজ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। হঠাৎ একটা উপায়ের কথা মনে আসতে সে চেঁচিয়ে উঠল :

"ঠিক হয়েছে। বুঝেছি কী করতে হবে—মুট্‌কি ট্রাইনকে বিয়ে করব। তারও একটা ছাগল আছে। নিজেরটার সঙ্গে আমার ছাগলটাও মাঠে সে চরাতে নিয়ে যেতে পারবে—ঝামেলা থেকে বাঁচব।"

এই-না ভেবে উঠে পড়ে ক্লান্ত শরীরটা কোনোমতে টেনে-টুনে সে রাস্তা পার হল। কারণ রাস্তার ওপারেই থাকত ট্রাইনের বাবা-মা।

এই বিয়ের প্রস্তাবে মনস্থির করতে তাদের দেরি হল না। তারা বলাবলি করল, "ছেলেমেয়ে দুটোই এক গোয়ালের গোরু।" এই-না বলে বিয়েতে তারা মত দিল।

অল্পদিনের মধ্যেই মুটকি ট্রাইন হেইন্‌জ্-এর বউ হয়ে মাঠে যেতে লাগল তাদের দুটো ছাগল নিয়ে। ভারি আরামে হেইন্‌জ্-এর দিন কাটতে লাগল। নিজের আলসেমি ছাড়া ক্লান্ত করার মতো কিছুই আর তার রইল না। মাঝে-মাঝে ট্রাইনের সঙ্গে মাঠে সে যেত। কারণ, তার কথায়, "কাজ করা যে কী বস্তু সে কথা বেমালুম ভুলে গেলে লোকে অবসর সময় ভালো করে উপভোগ করতে পারে না।" আসলে কিন্তু সে যেত ট্রাইনের কাজের খবরদারি করতে। কারণ আসলে ট্রাইন ছিল তারই মতো কুঁড়ে।

একদিন ট্রাইন বলল, "হেইন্‌জ্, আমাদের এখন ভরা যৌবন। মিছিমিছি ঝামেলা পুইয়ে সময় নষ্ট করে কী লাভ? ছাগলদুটো ব্যা-ব্যা করে রোজ ভোরে আমাদের ঘুম ভাঙায়। আমাদের পড়শি মৌমাছি পোষে। তার মৌচাকের সঙ্গে ছাগলদুটো বদলা-বদলি করে নিলে কেমন হয়? বাড়ির পেছনে রোদের জায়গায় মৌচাকটা রেখে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। মৌমাছিদের দেখাশুনো করার দরকার নেই। মাঠেও তাদের চরাতে নিয়ে যেতে হয় না। নিজেরাই তারা উড়ে যায়, নিজেরাই বাড়ি ফেরে আর মধু বানায়।"

হেইন্‌জ্ বলল, "বউ, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। এক্ষুনি তোমার কথামতো কাজটা সেরে ফেলা যাক। ছাগল-দুধের চেয়ে মধুর স্বাদ অনেক ভালো। টেঁকেও অনেক বেশি দিন।"

দুটো ছাগলের বদলে মৌচাকটা খুব খুশি হয়েই দিল তাদের পড়শি। মৌমাছিগুলো ঝাঁক বেঁধে বেরোয়, ঝাঁক বেঁধে ফেরে। পরিশ্রমে তাদের ক্লান্তি নেই। তারা বানিয়ে চলে উৎকৃষ্ট মধু। শরৎকালে হেইন্‌জ্ তাই সংগ্রহ করতে পারল এক বোয়েম-ভর্তি মধু।

তাদের বিছানার উপরকার একটা তাকে বোয়েমটা তারা রাখল। হেজেলগাছের শক্ত একটা ডাল এনে ট্রাইন রাখল বিছানার পাশে, যাতে শুয়ে-শুয়েই চোর বা ইঁদুরদের তাড়াতে পারে।

দুপুরের আগে বিছানা ছেড়ে আলসে হেইন্‌জ্ উঠত না। বলত, "ভোরে উঠে মুখ্যুরাই শরীর নষ্ট করে।" একদিন সকালের রোদ যখন চড়্‌চড়ে হয়ে উঠতে শুরু করেছে, সারা রাত ঘুমোবার পর পালকের বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে বউকে সে বলল, "মেয়েরা মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে। তোমাকে তো প্রায়ই মধুটা চাখতে দেখি।

তাই মনে হয় মধুর বোয়েমের বদলে একটা হাঁস আর হাঁসের ছানা আনাই ভালো।"

ট্রাইন জবাব দিল, "সেগুলোর তদারক করার জন্যে যতদিন-না আমাদের ছেলেপুলে হয় ততদিন স্ ুর কর। হাঁস চরিয়ে চরিয়ে জীবনটা খোয়াতে রাজি নই।"

হেইন্‌জ্‌ বলল, "আমাদের ছেলে হলে সে হাঁস চরাতে যাবে বলে ভেবেছ নাকি? আজকালকার ছেলেমেয়েরা বাপ মায়ের কথা থোড়াই কেয়ার করে। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কাজ করে তারা বেড়ায়। ভাবে, বড়োদের চেয়ে অনেক বেশি তারা চালাক।"

রেগে ট্রাইন চেঁচিয়ে উঠল, "আমার ছেলে বেয়াড়ামো করলে কী করে তাকে শায়েস্তা করতে হয় জানি। একটা লাঠি দিয়ে তার গায়ের ছাল চামড়া তুলে দেব। ঠিক এইরকম করে।" এই-না বলে হেজেলগাছের ডালটা সে বাতাসের মধ্যে শপাং শপাং করে চালাতে শুরু করল। আর সেটার ধাক্কায় মধুর বোয়েমটা তাক থেকে পড়ে দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে হয়ে গেল খান্ খান্। উৎকৃষ্ট মধুর সবটা বিছানায় ঝরে গড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝেতে।

তাই দেখে হেইন্‌জ্‌ বলল, "যাক, হাস, আর হাঁসের ছানা, হাঁস চরাবার লোক নিয়ে মাথা ঘামাবার আর দরকার নেই। কী ভাগ্যি, বোয়েমটা আমার মাথায় পড়ে নি।" তার পর খানিকটা মধু খাটের একটা ফাটলে জমে থাকতে দেখে মুখ বাড়িয়ে চুক্‌চক্‌ করে সেটা চেটে নিয়ে পরম তৃপ্তির সুরে সে বলল, "বউ তলানি যেটুকু পড়ে আছে সেটুকু খেয়ে চুপচাপ শুয়ে থেকে এই প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কাটা কাটিয়ে নেওয়া যাক। সাধারণত যে সময় উঠি তার চেয়ে দেরি করে উঠলেও ক্ষতি নেই। গোটা দিনটাই তো পড়ে আছে।"

তার সঙ্গে একমত হয়ে ট্রাইন বলল, "তা যা বলেছ। ধীরে-সুস্থেই সব কাজ করা ভালো। মনে আছে তো সেই শামুকটার কথা, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে যেটা পৌঁচেছিল বর-কনের ছেলের অন্নপ্রাসনের সময়? তাদের বাড়িতে পৌঁছে একটা ঝোপে হোঁচট খেয়ে শামুক বলেছিল 'কখনো তাড়াহুড়ো করবে না। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই বিপদ'।"

ভালুক চামড়া-পরা লোক

এক সময় এক তরুণ সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধে সে খুব বীরত্ব দেখায়। কিন্তু লড়াই শেষ হবার পর তার চাকরি গেল। তার মা-বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন। নিজের বাড়ি তার ছিল না। ভাইদের তাই সে বলল, যতদিন-না আবার লড়াই বাধে ততদিন তাকে আশ্রয় দিতে। কিন্তু তার ভাইরা ছিল খুব নিষ্ঠুর। তারা বলল, "আমাদের বাড়িতে তোর জায়গা হবে না। তুই একেবারে অপদার্থ। নিজের ব্যবস্থা নিজেই কর গে যা।" সে বেচারার থাকার মধ্যে ছিল শুধু একটা বন্দুক। বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে তাই সে বেরিয়ে পড়ল।

যেতে যেতে সে পৌঁছল বিরাট একটা ফাঁকা জায়গায়। সেখানে গাছতলায় বসে সে ভাবতে লাগল, 'আমার টাকাকড়ি নেই। লড়াই

করা ছাড়া আর কিছু শিখি নি। এখন লড়াই শেষ হয়েছে। তাই আমাকে উপোস করে মরতে হবে দেখছি।'

ঠিক তখনই তার কানে এল একটা শব্দ। চোখ তুলে সে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অচেনা লোক। পরনে তার সুন্দর সবুজ পোশাক। কিন্তু পায়ে বীভৎস ঘোড়ার ক্ষুর।

সে বলল, "আমি জানি টাকাকড়ি তুমি চাও। যত বইতে পারবে তত টাকা তোমায় দেব। কিন্তু তার আগে প্রমাণ করতে হবে তুমি ভীরু নও। কারণ কাপুরুষকে আমি কিছু দিই না।"

তরুণ বলল, "সৈনিক আর কাপুরুষ—এই দুটো কথা খাপ খায় না। তুমি আমাকে যাচাই করে দেখতে পার।"

অচেনা লোকটি বলল, "তা হলে পেছনে তাকিয়ে দেখো।"

সৈনিক পিছন ফিরে দেখে প্রকাণ্ড এক ভালুক গর্‌গর্‌ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

সে বলল, "আয়, আয়। তোর নাকে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে গর্‌গরানি বন্ধ করছি।" এই-না বলে বন্দুক তুলে এক গুলিতে সে মেরে ফেলল ভালুকটাকে।

অচেনা লোকটি বলল, "তোমার সাহসের অভাব নেই দেখছি। কিন্তু আরো কতকগুলো কড়ার আছে।"

সৈনিক বুঝল তাকে শয়তানের সঙ্গে রফা করতে হবে। তাই বলল, "আমার আত্মাকে বন্ধক রাখা ছাড়া আর যে-কোনো কাজেই রাজি।"

অচেনা লোকটি বলল, "নিজেই সেটা তুমি বিচার করে দেখো। সাত বছর তুমি স্নান করতে, নখ কাটতে, চুল-দাড়ি আঁচড়াতে পারবে না। তোমাকে একটা কোট আর আলখাল্লা দেব। সাত বছর সেগুলো পরে থাকতে হবে, একবারও খুলতে পাবে না। তার মধ্যে তোমার মৃত্যু হলে তোমার আত্মা আমার হয়ে যাবে। সাত বছরের বেশি বাঁচলে তুমি মুক্তি পাবে আজীবন থাকবে ধনী হয়ে।"

সৈনিক দরিদ্র অবস্থার কথা ভাবল। অতীতে বহুবার তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। তাই ভয় না পেয়ে তার কড়ারে রাজি হয়ে গেল।

সবুজ পোশাক-পরা লোকটি নিজের কোট খুলে তাকে দিয়ে বলল,

"এ-কোট যতদিন পরে থাকবে পকেটে হাত দিলেই পাবে মুঠো-মুঠো মোহর।" তার পর ভালুকটার চামড়া ছাড়িয়ে বলল, "এটাই তোমার আলখাল্লা আর বিছানা। এই পোশাকের জন্যে লোকে তোমায় ডাকবে 'ভালুক-চর্ম' বলে।" কথাগুলো বলে শয়তান অদৃশ্য হল।

কোটটা পরে পকেটে হাত দিয়ে সৈনিক দেখল শয়তান তাকে ঠকায় নি। সঙ্গে-সঙ্গে ভালুকের চামড়াটা পিঠে চড়িয়ে সে শুরু করল দেশে-দেশে ঘুরতে। সব সময়েই তার ছুটি। ভালো-ভালো খাবার-দাবার খেয়ে সে হয়ে উঠল হৃষ্টপুষ্ট। প্রথম বছর তার চেহারা বিশেষ বদলাল না। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে তার চেহারা হয়ে উঠল ভয়াবহ। মাথার চুলে তার মুখের সবটাই প্রায় ঢেকে গেল। দাড়ি পাকিয়ে হয়ে গেল জটা। মুখে এমন ধুলোবালি জমল যে, সেখানে ঘাসের বীজ ছড়ালে ঘাস গজিয়ে উঠত। যে তাকে দেখে সে-ই আঁতকে পালায়। কিন্তু দীন-দুঃখীকে সে টাকাকড়ি দিত আর বলত তারা যেন প্রার্থনা করে—সাত বছরের মধ্যে সে যেন না মরে। লোকে তাই তাকে সৎ লোক বলে মনে করত—আশ্রয়ের অভাব তার হত-না।

চতুর্থ বছরে সে পেঁছিল এক সরাইখানায়। ঘোড়ারা তাকে দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারে বলে সরাইখানার মালিক আস্তাবলেও তাকে থাকতে দিতে রাজি হল না। কিন্তু 'ভালুক-চর্ম' পকেট থেকে এক মুঠো মোহর বার করে দিলে সরাইখানার মালিক তাকে পিছনকার একটা ঘরে থাকতে দিতে রাজি হল। কিন্তু কড়ার করিয়ে নিল লোকজনের সামনে সে বেরুতে পাবে না। কারণ তাকে দেখলে সরাইখানার বদনাম হয়ে যেতে পারে।

এক সন্ধেয় তার ঘরে বসে 'ভালুক-চর্ম' ভাবছে—সাতটা বছর কাটলে বাঁচি। এমন সময় সে শুনল পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে। দরজা খুলে সে দেখে এক বুড়ো মাথায় হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। 'ভালুক-চর্ম'কে আসতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বুড়ো সেখান থেকে পালাতে গেল। কিন্তু তাকে মানুষের ভাষায় কথা বলতে শুনে সে আশ্বস্ত হল। তার মিষ্টি কথা শুনে বুড়ো তাকে জানাল তার দুঃখের কারণ। বলল, "আমার পুঁজিপাটা শেষ হয়ে গেছে। সরাইখানার মালিককে টাকা দিতে পারছি না। তাই আমাকে আর আমার মেয়েদের হাজতে দেওয়া হবে।"

'ভালুক-চর্ম' বলল, "এই জন্যে কাঁদছ? কেঁদো না। টাকা-কড়ির অভাব আমার নেই। এই বিপদ থেকে তোমায় উদ্ধার করছি।" সরাইখানার মালিককে ডেকে বুড়োর দেনা সে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিল আর তার পর গরিব বুড়োকে দিল আরো অনেক মোহর।

কী করে কৃতজ্ঞতা দেখাবে বুড়ো ভেবে পেল না। শেষটায় বলল, আমার মেয়েদের দেখবে এসো। তারা সবাই খুব রূপসী। তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ হবে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। আমাকে কী ভাবে সাহায্য করেছ শুনলে সে আপত্তি করবে না। তোমাকে দেখতে যে কিম্ভূতকিমাকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্পদিনেই বউ তোমার ভোল পালটে দেবে।"

'ভালুক-চর্ম' গেল বুড়োর সঙ্গে। কিন্তু তার বীভৎস মূর্তি দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করতে করতে বড়ো মেয়ে দৌড় দিল। মেজো মেয়ে পালাল না বটে, কিন্তু তার আপাদ-মস্তক দেখে বলল, "মানুষের মতো যার মুখ নয় তাকে কী করে বিয়ে করি? একদিন হাটে একটা লোম-কামানো ভালুক দেখেছিলাম। সেটার পরনে ছিল অশ্বারোহী সৈনিকের লম্বা জামা, হাতে সাদা দস্তানা। এর চেয়ে সেটাকেও বিয়ে করতে আমি রাজি। সেটা কুৎসিত হতে পারে, কিন্তু এর মতো বীভৎস নয়। সময় গেলে কুৎসিত মানুষও সহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এরকম বীভৎস লোককে কোনোদিন বরদাস্ত করতে পারব না।"

কিন্তু ছোটো মেয়ে বলল, "বাবা, ইনি আমাদের সাহায্য করেছেন। তাই মনে হয় নিশ্চয়ই ইনি ভালো লোক। তুমি এঁকে কথা দিয়েছ আমাদের একজনের সঙ্গে এঁর বিয়ে দেবে। কথার খেলাপ কোরো না।"

'ভালুক চর্মে'র এক মুখ নোংরা দাড়ি। নইলে মেয়েটির কথা শুনে আনন্দে তার মুখ কীরকম জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল সেটা দেখা যেত। আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে ভেঙে দু টুকরো করে আধখানা মেয়েটিকে দিয়ে তাকে সে বলল সাবধানে রাখতে। মেয়েটিকে যে-টুকরো দিল তাতে সে লিখল নিজের নাম। নিজের কাছে যে-টুকরো রাখল তাতে লিখল মেয়েটির। তার পর মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে বলল, "তিন বছরের জন্যে তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে। আমি যদি ফিরে আসি তা হলে তোমাকে বিয়ে করব। আর যদি

না ফিরি তা হলে বুঝো আমি মরে গেছি। তুমি তখন অন্য যে-কোনো লোককে বিয়ে করতে পার। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কোরো—আমি যেন বেঁচে থাকি।"

তার কথা শুনে মেয়েটির ভারি কষ্ট হল। দু চোখ তার ভরে উঠল জলে। কিন্তু বোনেরা তাকে নিয়ে করে চলল অনেক নিষ্ঠুর ঠাট্টা-তামাশা।

বড়ো বোন বলল, "সাবধান। থাবা দিয়ে ও তোর হাতে আঁচড়ে দিতে পারে।"

মেজো বোন বলল, "সাবধান। মুখরোচক খাবার খেতে ভালুকরা খুব ভালোবাসে। ও তোকে খেয়ে ফেলতে পারে।"

বড়ো বোন আবার বলল, "ওর খেয়াল-খুশিমতো সব সময় তোকে কাজ করতে হবে। নইলে রেগে ও উঠবে গর্জন করে।"

মেজো বোন বলল, "বিয়ের নাচটা ভালোই জমবে। কারণ ভালুক সুন্দর নাচতে পারে।"

বুড়োর ছোটো মেয়ে বোনেদের ঠাট্টা-তামাশা মুখ বুজে সয়ে গেল। চটে উঠল না।

এদিকে 'ভালুক-চর্ম' ঘুরে বেড়াতে লাগল দেশে দেশে। যখনি পারে লোকের উপকার করে। গরিবদের দেয় মুঠো-মুঠো টাকা আর তাদের বলে তার জন্য প্রার্থনা করতে।

শেষটায় সাত বছর পূর্ণ হবার দিন সে ফিরে এল সেই বিরাট ফাঁকা জায়গায়। সঙ্গে-সঙ্গে উঠল ভীষণ ঝড় আর ভীষণ রেগে হাজির হল শয়তান। সৈনিকের দিকে পুরনো পোশাকটা ছুঁড়ে দিয়ে তাকে সে বলল, "আমার সবুজ কোট ফিরিয়ে দাও।"

'ভালুক-চর্ম' বলল, "তার আগে আমাকে পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করে দাও।"

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান বাধ্য হল জল এনে তাকে স্নান করাতে আর তার নখ কেটে, দাড়ি কামিয়ে, চুল আঁচড়ে দিতে। সঙ্গে-সঙ্গে আগেকার চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠল সাহসী সৈনিকের চেহারা।

শয়তান আর তাকে শাস্তি না দিয়ে চলে যেতে তার বুক থেকে খুব ভারী একটা বোঝা যেন নেমে গেল। শহরে ফিরে, মখমলের চমৎকার একটা কোট পরে, চারটে সাদা-ঘোড়ায়-টানা জুড়ি গাড়িতে

চড়ে সেই ছোটো মেয়েটির বাড়ি সে গেল। তাকে দেখে কেউ চিনতে পারল না। মেয়েটির বুড়ো বাবা ভাবল, সে মস্ত বড়ো এক অফিসার। যে-ঘরে তার মেয়েরা বসেছিল সে-ঘরে তাকে সে পাঠাল। বড়ো দুই বোন তাকে বসাল নিজেদের মাঝখানে, তার সামনে নানা মুখরোচক খাবার রেখে তারা বলল—অমন সুন্দর চেহারার সৈনিক জীবনে তারা দেখে নি। কালো পোশাক পরে ছোটো বোন বসেছিল তার উলটো দিকে। সে চোখ নিচু করে রইল, একটি কথাও বলল না। শেষটায় তাদের বুড়ো বাবা এসে প্রশ্ন করল—তার কোনো মেয়েকে সে বিয়ে করবে কি না। সাজগোজ করার জন্য বড়ো দুই বোন ছুটে গেল নিজের-নিজের ঘরে। তারা ভেবেছিল তাদের দুজনের মধ্যে একজনকে সৈনিকের নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

ঘর থেকে আর সবাই চলে যেতে পকেট থেকে আংটির সেই অর্ধেক টুকরো বার করে এক গেলাস সরবতের মধ্যে ফেলে সৈনিক সেটা দিল ছোটো বোনকে খেতে। সরবৎ শেষ হতে ছোটো বোন দেখল আংটির টুকরোটাকে তলায় পড়ে থাকতে। সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দে নেচে উঠল তার বুক। তার গলার হার থেকে আংটির অন্য টুকরোটা ঝুলছিল। ছোটো বোন সেই টুকরো দুটো জোড়া দিতে একেবারে মিলে গেল। সৈনিক তখন তাকে বলল, "আমিই তোমার বর। আমাকেই দেখেছিলে ভালুকের চামড়া পরে থাকতে। ভগবানের দয়ায় আবার মানুষের চেহারা ফিরে পেয়েছি। আমার শরীরের সমস্ত নোংরা মুছে গেছে।" কথাগুলো বলে মেয়েটিকে সে চুমু খেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দারুণ সাজগোজ করে বড়ো দুই বোন ফিরে এল সেই ঘরে। কিন্তু যখন তারা দেখল সুন্দর চেহারার তরুণ তাদের ছোটো বোনকে পছন্দ করেছে তখন তারা হিংসেয় জ্বলেপুড়ে সেখান থেকে দৌড়ে চলে গেল। বড়ো বোন মরল কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে, মেজো বোন দিল গলায় দড়ি।

সেদিন সন্ধেয় দরজায় টোকা শুনে সৈনিক গিয়ে দরজা খুলে দেখে শয়তান দাঁড়িয়ে। তার পায়ে ঘোড়ার ক্ষুর। পরনে সবুজ কোট। সে বলল, "তুমি আমার কাছ থেকে পার পেয়ে গেছো। কিন্তু তোমার বদলে আজ অন্য দুজনকে পেয়েছি।"

দুই ভবঘুরে

একদিন এক ভবঘুরে মুচির সঙ্গে এক ভবঘুরে দর্জির দেখা হয়ে গেল। দর্জি ছোট্টোখাট্টো মানুষ, চেহারাটা সুন্দর, সব সময় হাসিখুশি। মুচির চামড়া কাটার সরঞ্জাম দেখে সে বুঝতে পারল তার কী পেশা। দর্জি তাই একটা ঠাট্টার গান জুড়ে দিল :

"ছুঁচ আর সুতো,
লাস্‌টাকে ধর ;
মোম মাখিয়ে নিয়ে
পেটাও যত পার।"

ঠাট্টা-তামাশা মুচির ধাতে সয় না। তাই গানটা শুনে এমন মুখ-ভঙ্গি করল, যেন চিরতার জল গিলেছে। দর্জিকে সে বলল, তার ঘাড় ধরে উত্তম-মধ্যম দেবে।

দর্জি হো-হো করে হেসে তার আঙুর-রসের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমি তোমায় অপমান করতে চাই নি, ভায়া। বোতলে টান দাও, সেইসঙ্গে তোমার রাগটাকেও গিলে ফেল।"

বোতলে টান দেবার পর মুচির মুখের থম্‌থমে ভাব কেটে গেল। দর্জিকে বোতলটা ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, "তেষ্টা পেয়েছিল বলেই চটেছিলাম। চলো, একসঙ্গে এগুনো যাক।"

দর্জি বলল, "খুব ভালো কথা। আমি চলেছি বড়ো একটা শহরে। সেখানে নিশ্চয়ই কাজ পাওয়া যাবে।"

মুচি বলল, "আমারও তাই ইচ্ছে। গাঁয়ে ঘুরে লাভ নেই। লোকে সেখানে খালি-পায়ে হাঁটে।"

তাই তারা শুরু করল একসঙ্গে হাঁটতে। অনেকদিন তাদের কপালে বিশেষ খাবার-দাবার জুটল না। শেষটায় একটা শহরে পৌঁছে তারা গেল নানা দোকানদারের কাছে। ছোট্টোখাট্টো হাসিখুশি দর্জির গোলাপী গাল দেখে সবাই খুশি হয়ে তাকে কাজ দিল। উৎসাহ দেবার জন্য শহরের প্রধান দর্জির মেয়েরা তাকে চুমু খেল।

মুচির কাছে সে যখন ফিরল তার ঝুলিতে তখন অনেক জিনিসপত্র। মুখ বেজার করে মুচি বলল, "যে যত পাজি, তার কপাল তত ভালো।"

দর্জি তার কথায় মোটেই চটল না। একমুখ হেসে বন্ধুর সঙ্গে তার জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে নিল।

তার পর আবার হাঁটতে-হাঁটতে তারা পৌঁছল এক গহন বনে। সেটার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে রাজধানীতে যাবার পথ। আসলে পথ ছিল দুটো। একটা পথ দিয়ে গেলে দুদিনে রাজধানীতে পৌঁছনো যায়, অন্যটায় লাগে সাতদিন। কিন্তু তাদের কেউই জানত না কোন পথটা ছোটো।

দুই ভবঘুরে একটা ওক্‌গাছের তলায় বসে পরামর্শ করতে লাগল, কোন্ পথটা ধরবে আর সঙ্গে নেবে কদিনের জন্য রুটি। মুচি বলল, "ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। আমি সাতদিনের মতো রুটি সঙ্গে নেব।"

দর্জি বলল, "কী বললে! গাধার মতো সাতদিনের রুটির বোঝা বইবে? আমাকে খাওয়াবার ভার আমি ভগবানের ওপর ছেড়ে দেব। গ্রীষ্মে কিংবা শীতে পকেটের টাকাকড়ির হেরফের হয় না। কিন্তু গরমে রুটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। ছোটো পথটা কেনই-বা আমরা খুঁজে পাব না? আমি কিনব দুদিনের মতো রুটি। তার বেশি নয়।" তার পর নিজের নিজের রুটি কিনে তারা ঢুকল বনের মধ্যে।

গির্জের ভিতরকার মতো বনটা চুপচাপ। একটু বাতাস নেই। নেই ঝরনার কলকল, পাখির গান। ঘন ডালপালার মধ্যে দিয়ে এক চিল্‌তে রোদও সেখানে পৌঁছয় না।

মুচির মুখে রা নেই। রুটির ভারী বোঝায় তার পিঠ উঠল কন্‌কনিয়ে। তার বেজার মুখ দিয়ে ঝরতে লাগল ঘাম।

দর্জি কিন্তু চলল মহা ফুর্তিতে। কখনো লাফায়, কখনো শিস্ দেয়, কখনো ধরে গানের একটা কলি। মনে-মনে সে ভাবল, "আমাকে এত খুশি দেখে ভগবান নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন।"

এইভাবে দুদিন কাটল। তৃতীয় দিনেও বনটা শেষ হল না, কিন্তু দর্জির রুটি হল শেষ। তাই সে খানিকটা দমে গেল। কিন্তু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল না। ভগবান আর নিজের সৌভাগ্যের উপর বিশ্বাস তার আগের মতোই রইল। তৃতীয় রাতে ঘুমোবার জন্য সে যখন শুলো তখন ক্ষিদেয় তার পেট চুঁইচুঁই করছে। আর পরদিন ভোরে যখন তার ঘুম ভাঙল ক্ষিদেটা তখন আরো শানিয়ে উঠেছে। চতুর্থ দিনটা তার ক্ষিদে নিয়ে কাটল।

একটা গাছের গুঁড়িতে বসে মুচি তার রুটি খেল আর দর্জি রইল জুল্‌জুল্‌ করে তাকিয়ে। মুচির কাছে এক টুকরো রুটি চাইতে অবজ্ঞার হাসি হেসে দর্জিকে সে বলল, "সব সময়েই তো মনের ফুর্তিতে থাক। এখন বোঝ ফুর্তি না থাকলে কেমন লাগে।—সকালে যে-পাখি গান গায় সন্ধেয় প্রায়ই তারা ফাঁদে পড়ে।" এক কথায়—মুচির মনে দয়ামায়ার বালাই ছিল না।

পঞ্চম দিনে অবসাদে দর্জির পক্ষে উঠে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে উঠল। তখন সে এমন দুর্বল যে, মুখ দিয়ে কথাই সরে না। গাল তার ফ্যাকাশে, চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল।

মুচি তখন বলল, "তোমার ডান চোখ কানা করে দিতে দিলে এক টুকরো রুটি দেব।"

বেচারা দর্জি বাঁচতে চেয়েছিল। অন্য কোনো উপায় না দেখে মুচির কথাতে সে রাজি হল। শেষবারের মতো দুচোখের জল ঝরিয়ে সে কাঁদল। তার পর পাষাণ-হৃদয় মুচি একটা ধারাল ছুরি দিয়ে উপড়ে নিল তার ডান চোখ।

তার মায়ের একটা কথা দর্জির মনে পড়ল। ভালো-ভালো খাবার সে খাবার পর মা তাকে বলতেন, "যত পারিস খেয়ে নে, ভোগান্তির কথা পরে।"

চোখের মতো চড়া-দর দিয়ে কেনা রুটিটা খাবার পর আবার সে উঠে দাঁড়াতে পারল। তার পর কষ্টের কথা ভুলে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিল—'এখনো তো একটা চোখে দেখতে পাচ্ছি!' কিন্তু দু

দিনের দিন তার খিদের জ্বালা হয়ে উঠল আরো তীক্ষ্ণ। রাত হতে সে পড়ে গেল এক গাছতলায়। আর পরদিন সকালে দারুণ অবসাদে সে উঠে দাঁড়াতে পারল না। বুঝল মৃত্যু তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুচি বলল, "তোমার অন্য চোখটা ওপড়াতে দিলে আরো এক টুকরো রুটি দেব।"

দর্জি তখন বুঝতে পারল কী রকম অসারতার মধ্যে সারা জীবন সে কাটিয়েছে। তাই ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে মুচিকে সে বলল, "আমাকে নিয়ে যা খুশি কর। কিন্তু মনে রেখো স্বর্গ থেকে ভগবান সব-কিছু দেখেন, সব-কিছুর বিচার করেন। একদিন এই নিষ্ঠুরতার জন্যে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তোমার হাতে এই যন্ত্রণা

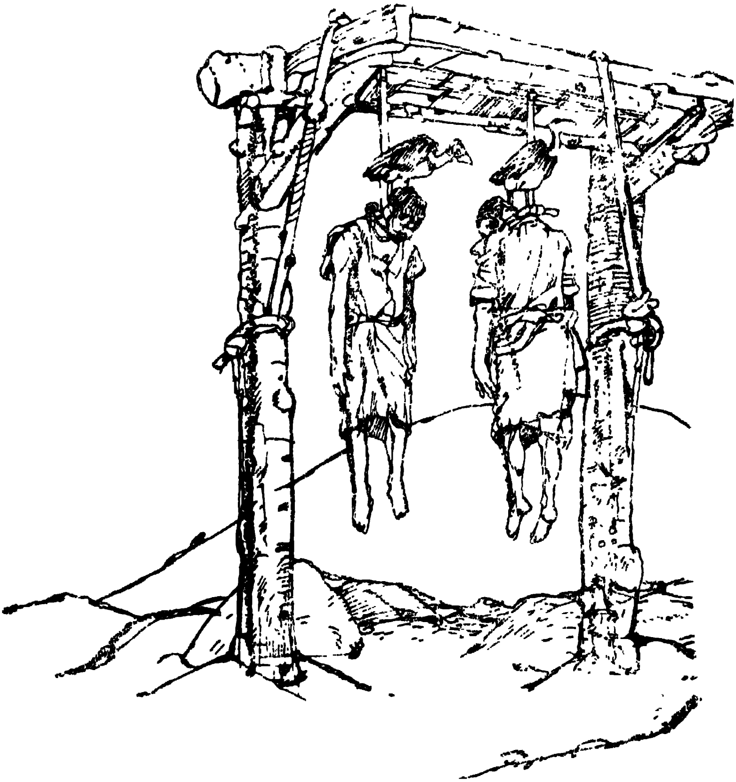

আমার প্রাপ্য নয়। আমার যখন সুদিন ছিল তোমার সঙ্গে সব-কিছু ভাগাভাগি করে নিতাম। আমার যেটা পেশা তাতে চোখের দরকার। অন্ধ হলে কাপড়ে একটা ফোঁড়ও দিতে পারব না। আমাকে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। তাই তোমার কাছে অনুরোধ—অন্ধ করার পর আমাকে একলা মরণের মুখে ফেলে চলে যেয়ো না।"

মুচির মনে দয়া-মায়া ছিল না। তাই ছুরি বার করে সঙ্গীর অন্য চোখটা উপড়ে দিয়ে তাকে দিল এক টুকরো রুটি। তার পর দর্জির হাতে একটা লাঠি ধরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে চলল নিজের পিছন-পিছন।

সূর্য অস্ত যাবার পর বন থেকে বেরিয়ে তারা পৌঁছল একটা মাঠে। সেখানে ছিল একটা ফাঁসিকাঠ। অন্ধ দর্জিকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে মুচি চলে গেল।

বেচারা দর্জি খিদেয়, যন্ত্রণায়, ক্লান্তিতে কাতর হয়ে সেখানে ঘুমিয়ে কাটাল সারা রাত। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর সে বুঝতে পারল না, কোথায় আছে। ফাঁসিকাঠে লটকে ছিল দুজন অপরাধী। তাদের প্রত্যেকের মাথায় বসেছিল একটা করে শকুন।

হঠাৎ একটা মড়া বলে উঠল, "ভায়া, জেগে আছো?"

অন্যটা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, জেগে আছি।"

প্রথমটা বলল, "তা হলে একটা কথা তোমায় বলি। গত রাতে যে-শিশির এই ফাঁসিকাঠে পড়েছে সেটা চোখে মাখালে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। কথাটা জানলে কত অন্ধ লোকই-না দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত!"

কথাটা শোনা মাত্র রুমাল বার করে সেখানকার শিশিরে ভিজিয়ে নিয়ে দর্জি তার চোখের শূন্য কোটরগুলো ধু'লো। আর দেখা গেল ফাঁসিকাঠের মড়া যে কথা বলেছিল সেটা সত্যি—দেখতে দেখতে এক-জোড়া নতুন সুস্থ সবল চোখ গজিয়ে উঠল তার শূন্য কোটরে। সে দেখতে পেল: পাহাড়ের পিছন থেকে সূর্য উঠছে; সামনের উপত্যকায় রয়েছে বিরাট রাজধানী। দেখতে পেল রাজধানীর অসংখ্য সোনার গম্বজ আর মিনার রোদে ঝক্‌মক্‌ করছে। দেখতে পেল গাছের প্রত্যেকটি পাতা। দেখতে পেল আকাশের পাখি আর বাতাসে উড়ন্ত ডাঁশ-মশা। পকেট থেকে একটা ছুঁচ বার করে সে দেখল তাতে সহজেই সুতো পরাতে পারছে। তখন তার আনন্দ আর ধরে না। নতজানু হয়ে বসে দয়ালু ভগবানকে সে জানাল ধন্যবাদ। যে-দুটো মড়া ফাঁসিকাঠে ঝুলছিল তাদের কথা সে ভুলল না। তাদের জন্যও সে প্রার্থনা করল। তার পর পুঁটলিটা পিঠে ঝুলিয়ে, অতীতের দুঃখ-কষ্ট ভুলে শিস্‌ দিতে দিতে গান গাইতে গাইতে সে চলল এগিয়ে।

যেতে যেতে প্রথমে তার নজরে পড়ল মাঠের মধ্যে বাদামী রঙের একটা ঘোড়ার বাচ্ছাকে লাফিয়ে বেড়াতে! তার কেশর মুঠোয় চেপে সেটাকে সে ধরল। ভেবেছিল তার পিঠে লাফিয়ে উঠে সে যাবে শহরে কিন্তু ঘোড়ার বাচ্ছাটা মিনতি করে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও আমার বয়েস খুব কম। তোমার মতো হালকা মানুষও আমার পিঠে চড়লে পিঠ আমার ভেঙে যাবে। আমাকে যেতে দাও। একদিন হয়তো তার জন্যে তোমায় উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারব।"

দর্জি তাকে ছপ্‌টির এক ঘা দিয়ে বলল, "যা—পালা।" মনের আনন্দে ঘোড়ার বাচ্ছা লাফিয়ে ঝোপঝাড় খানা-খন্দর পেরিয়ে চলে গেল পাশের মাঠে।

আগের রাত থেকে দর্জির পেটে কিছুই পড়ে নি। সে বলে উঠল, "রোদে আমার চোখ ভরে গেছে, কিন্তু মুখে আমার রুটি নেই। খাবার মতো প্রথম যাকে দেখব তাকেই আমি মারব।" যেতে যেতে সে দেখল মাঠের উপর দিয়ে তার দিকে উড়ে আসছে একটা সারস। সেটার

একটা পা চেপে ধরে দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "থাম। জানি না তোকে খেতে ভালো কি না। কিন্তু এমন ক্ষিদে পেয়েছে যে, বাছ-বিচার করার সময় নেই। তোকে মেরে আমি আগুনে ঝলসাব।"

মিনতি করে সারস বলল, "আমাকে মেরো না। আমি ধার্মিক পাখি। কোনোদিন কোনো পাপ করি নি। মানুষের অনেক উপকার করেছি। আমাকে বাঁচতে দাও। একদিন তার জন্যে উপযুক্ত পুরস্কার দেব!"

"উড়ে পালা, লম্বা-ঠ্যাং", বলে দর্জি তাকে ছেড়ে দিল। আর সারস তার লম্বা পা ঝুলিয়ে উড়ে পালাল।

দর্জি ভাবল, 'কি করা যায়? যত সময় যাচ্ছে তত আমার ক্ষিদে বাড়ছে আর পেট খালি হয়ে যাচ্ছে। এদিকে সব সুযোগই হাতছাড়া করছি!' আর তক্ষুনি সে দেখল একটা পুকুরে কতকগুলো হাঁস সাঁতরাচ্ছে। 'কী আশ্চর্য। যেন জাদুমন্ত্রে এগুলো হাজির হয়েছে," এই-না ভেবে একটা হাঁসকে সে ধরল। সেটার ঘাড় সে মটকাতে যাবে এমন সময় বেণু-বাঁশের ঝোপ থেকে একটা বুড়ি-হাঁস করুণ সুরে ডাকতে ডাকতে তাড়াতাড়ি জল ভেঙে তার কাছে এসে মিনতি করে বলল, "আমার বাছাকে ছেড়ে দাও। ভাব একবার তোমার মায়ের কথা। তাঁর কোল থেকে কেউ তোমায় চুরি করে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেললে তাঁর কী অবস্থা হত।"

ভালোমানুষ দর্জি বলল, "কেঁদো না। তোমার বাছাকে ছেড়ে দিচ্ছি।" এই-না বলে হাঁসটাকে জলে ছেড়ে দিল। তার পর পিছন ফিরে সে দেখে একটা গাছের ফোকরে মৌমাছিরা ঢুকছে আর সেখান থেকে উড়ে বেরুচ্ছে। দর্জি বলে উঠল, "এই আমার সদয় ব্যবহারের পুরস্কার। মধু খেয়ে বাঁচব।"

কিন্তু মক্ষিরানী বেরিয়ে এসে ধমকে বলল, "আমার প্রজাদের ওপর যদি অত্যাচার কর আর মৌচাক ভাঙো তা হলে গন্‌গনে গরম ছুঁচের মতো আমাদের হাজার হাজার হুল তোমার শরীরে ফুটবে। আমাদের বিরক্ত কোরো না। যেদিকে যাবার যাও। আর এক সময় তোমার কাজে আমরা লাগব।"

দর্জি দেখল সেখানেও সুবিধে হবে না। আপন মনে সে বলে উঠল, 'প্রথমে তিনটি খালি ডিশ্‌, আর চতুর্থটাও ফাঁকা—এটাকে খুব ভালো

ভোজ খাওয়া বলে না।' কী আর সে করে। দুপুরবেলায় খালি পেটে কোনোরকমে পৌঁছল সে রাজধানীতে। সেখানে এক সরাইখানায় গিয়ে পেট ভরে খেয়ে সে বেরুল কাজের খোঁজে। কাজ খুঁজে পাওয়া তার কঠিন হল না। কারণ দর্জির সবরকম কাজ খুব ভালোই সে জানত। অল্পদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সবাই চায় সে দর্জিকে দিয়ে কোট বানাতে। যতদিন যেতে লাগল ততই বাড়তে লাগল তার খ্যাতি। শেষটায় রাজা তাঁকে করলেন রাজসভার দর্জি।

কিন্তু জীবন কি বিচিত্র! সেইদিনই তার আগেকার সঙ্গী মুচিও নিযুক্ত হল রাজসভার মুচি হিসেবে। দর্জির অক্ষত চোখ দুটো দেখে সে মনে মনে বলল, 'দর্জি আমার ওপর শোধ তোলার আগে তার জন্যে কবর আমায় খুঁড়তেই হবে।' কিন্তু অপরের জন্য যারা কবর খোঁড়ে প্রায়ই সেই কবরে তারা পড়ে নিজেরাই। সন্ধেবেলা চুপি চুপি রাজার কাছে গিয়ে মুচি বলল, "মহারাজ, দর্জি খুব সাহসী। বড়াই করে বলে বেড়াচ্ছে—যে সোনার মুকুট হাজার বছর আগে হারিয়ে গেছে সেটাকে সে খুঁজে বার করবে।"

রাজা বললেন, "তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলাম। পরদিন সকালে দর্জিকে ডেকে তিনি বললেন, "মুকুটটা এক্ষুনি নিয়ে এসো। নয়তো চিরকালের জন্যে আমার রাজত্ব থেকে বিদেয় হও।"

দর্জি মনে মনে বলল, 'বদমাইসরাই পারে নিজের যা আছে তার চেয়ে বেশি দিতে। তা ছাড়া বোকা রাজা যদি ভেবে থাকেন মানুষের অসাধ্য কাজ আমি করতে পারব তা হলে সকাল পর্যন্তও অপেক্ষা করব না। স্বেচ্ছায় এক্ষুনি তাঁর রাজত্ব ছেড়ে যাব।' তাই নিজের পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু যে-শহরে সুখে-সম্পদে এত কাল সে কাটিয়েছে সে-শহরের সিংহদ্বার দিয়ে বেরুবার সময় তার মন খারাপ হয়ে গেল।

যেতে যেতে সেই পুকুরপাড়ে সে পৌঁছল যেখানে হাঁসেদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। যে বুড়ি-হাঁসের বাচ্চাকে সে ছেড়ে দিয়েছিল সে তখন তীরে বসে নিজের পালক পরিষ্কার করছিল। সঙ্গে-সঙ্গে দর্জিকে চিনতে পেরে সে প্রশ্ন করল, "তোমার মুখ অমন শুকনো কেন?"

দর্জি তাকে সব কথা বলল।

বুড়ি-হাঁস বলল, "মুকুটটা রয়েছে পুকুরের তলায়। সেটা তোমায়

এনে দিচ্ছি। পুকুরপাড়ে তোমার রুমালটা বিছিয়ে দাও।" এই-না বলে বারোটা বাচ্ছা নিয়ে বুড়ি হাঁস জলে ডুব দিল আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সবাই মিলে মুকুটটা নিয়ে ভেসে উঠল জলের উপর। তার পর সাঁতরে এসে ডাঙায় উঠে মুকুটটা তারা রাখল দর্জির রুমালের উপর। সেটা এমন আশ্চর্য সুন্দর যে কল্পনাই করা যায় না। রোদে হাজার চুনি-পান্নার মতো সেটা উঠল ঝল্‌মল্‌ করে। দর্জি সেটা রুমালে জড়িয়ে রাজার কাছে নিয়ে যেতে তিনি বেজায় খুশি হলেন। সোনার একটা হার তিনি পরিয়ে দিলেন দর্জির গলায়।

মুচি যখন দেখল তার ফন্দি ব্যর্থ হয়েছে তখন আর-একটা ফন্দি আঁটল সে। রাজাকে গিয়ে বলল, "মহারাজ, দর্জির চাল বেজায় বেড়ে গেছে। সে বলে বেড়াচ্ছে—গোটা রাজপ্রাসাদের মডেল মোম দিয়ে বানাতে পারে। তাতে থাকবে প্রাসাদের ভেতরের আর বাইরের সব-কিছু।"

দর্জিকে ডেকে সেরকম একেবারে নিখুঁত মোমের মডেল বানাবার আদেশ রাজা দিলেন। বললেন, "দেয়ালের একটা পেরেকও বাদ পড়লে আজীবন তোমায় থাকতে হবে মাটির তলার অন্ধকার হাজতে।"

দর্জি মনে মনে বলল, 'এ দেখছি আগের চেয়েও কঠিন কাজ। কোনো মানুষ এটা বানাতে পারে না।' তাই আবার তার পোঁটলা-পুঁটলি পিঠে ফেলে শহর থেকে সে বেরিয়ে পড়ল।

গাছের সেই ফোকরটার কাছে আসতে মক্ষিরানী বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "মাথা নিচু করে রয়েছ কেন? ঘাড়ে ব্যথা?"

দর্জি তাকে সব কথা জানাল।

মক্ষিরানী বলল, "বাড়ি ফিরে যাও। কাল ঠিক এই সময় এসো। সঙ্গে এনো বড়ো একটা চাদর। দুর্ভাবনা কোরো না।"

দর্জি বাড়ি ফিরল আর ঝাঁকে-ঝাঁকে মৌমাছি খোলা জানলা দিয়ে রাজপ্রাসাদে সেঁধিয়ে সেখানকার সব-কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিজেদের চাকে ফিরে মোম দিয়ে চট্‌পট্‌ বানাতে লাগল একটা মডেল। সন্ধের মধ্যে সেটা শেষ হল। পরদিন সকালে দর্জি এসে দেখে রাজপ্রাসাদের আশ্চর্য সুন্দর আর নিখুঁত মোমের মডেল সেখানে রয়েছে, দেয়ালের একটা পেরেকও বাদ পড়ে নি। আর সেই তুষার-ধবল মডেল থেকে বেরুচ্ছে মধুর মিষ্টি গন্ধ। দর্জি সেটা খুব সাবধানে তার চাদর

জড়িয়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মডেলটিকে রাখলেন ভোজসভার ঘরে আর দর্জিকে উপহার দিলেন থাকবার জন্য পাথরের একটা বাড়ি।

মুচি কিন্তু দমে গেল না। তৃতীয়বার রাজার কাছে গিয়ে সে বলল, "মহারাজ, দর্জি শুনেছে রাজপ্রাসাদের আঙিনায় কোনো ফোয়ারায় জল ওঠে না। সে বলে বেড়াচ্ছে সেখানে এমন একটা ফোয়ারা বানাতে পারে যেটা দিয়ে বেরুবে মানুষের মতো উঁচু স্ফটিক-স্বচ্ছ জল।"

দর্জিকে ডেকে পাঠিয়ে রাজা বললেন, "যেমন বলেছ ঠিক তেমনি একটা ফোয়ারা কালকের মধ্যে আমার আঙিনায় বানিয়ে দিতে হবে। না পারলে আমার জল্লাদ তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে।"

মনের দুঃখে শহর থেকে যেতে-যেতে দর্জির সঙ্গে দেখা হল সেই ঘোড়ার বাচ্চাটার। এখন আর সেটা ছোট্টো নয়—হয়ে উঠেছে চমৎকার তাগড়া বাদামী রঙের ঘোড়া। ঘোড়া বলল, "সেদিন আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে বলে এবার তার প্রতিদান দেব। সব কথা আমি জানি। বিপদ থেকে শিগ্‌গিরই তোমায় উদ্ধার করছি। আমার পিঠে ওঠো। তোমার মতো দুজনকে এখন আমি পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।"

দর্জি তার পিঠে উঠলে টগ্‌বগ্‌ করে ছুটে তাকে নিয়ে ঘোড়া সোজা চলে এল রাজপ্রাসাদের আঙিনায়। আর তার পর সেখানে দারুণ জোরে গোল হয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ শোনা গেল একটা বিস্ফোরণের শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়ল ঘোড়াটা আর সেখানকার মাটি ফেটে মানুষের চেয়েও উঁচু হয়ে তোড়ে বেরুতে লাগল জল। স্ফটিক-স্বচ্ছ সেই জল। সূর্যরশ্মি ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল তার উপর। অবাক হয়ে রাজা সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। আর তার পর ছুটে গিয়ে সবাইকার সামনে জড়িয়ে ধরলেন দর্জিকে।

কিন্তু দর্জির এই সুখও বেশি দিন টিঁকল না। রাজার অনেক মেয়ে ছিল। কিন্তু কোনো ছেলে ছিল না। তাই পাজি মুচি চতুর্থবার রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, দর্জি বড়াই করে বলে বেড়াচ্ছে আকাশ থেকে আপনার জন্যে ছেলে নিয়ে আসতে পারে।"

দর্জিকে ডেকে পাঠিয়ে রাজা বললেন, "ন দিনের মধ্যে আমাকে

ছেলে এনে দিতে পারলে বড়ো মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

দর্জি মনে মনে বলল, 'এটা যে মস্ত পুরস্কার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফলটা ভারি উঁচুতে ফলেছে। সেটা পাড়বার জন্য উঠতে গেলে ডাল নিশ্চয়ই ভাঙবে।' বাড়ি ফিরে তার কাজের টেবিলের সামনে বসে মাথায় হাত দিয়ে সে ভাবতে লাগল—কী করবে। শেষটায় দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে আপন মনে বলে উঠল, 'না—আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। এখানে কোনোদিন শান্তিতে থাকতে পারব না।'

পোঁটলা-পুঁটলি পিঠে ফেলে শহর ছেড়ে আবার সে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে সেই মাঠে পেঁছে দেখে তার পুরনো বন্ধু সারসকে। একটা ব্যাঙের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো। শেষটায় টপ্‌ করে সে গিলে ফেলল ব্যাঙটাকে।

তার পর এগিয়ে এসে দর্জিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, "দেখছি পিঠে তোমার ঝোলাটা রয়েছে। শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন?"

দর্জি তাকে রাজার অসম্ভব আদেশের কথা জানাল।

সব কথা শুনে সারস বলল, "এর জন্যে দুশ্চিন্তা করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলো না। তোমাকে বিপদ থেকে আমি উদ্ধার করব। বহুকাল ধরে শহরে শিশু আনতে আমি অভ্যস্ত। কুয়ো থেকে অনায়াসে ছোট্টো এক রাজপুত্তুরকে নিয়ে আসতে পারব। শান্ত মনে বাড়ি ফিরে যাও। ন দিন পরে যেয়ো রাজপ্রাসাদে। সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

দর্জি বাড়ি ফিরে এল। আর ন দিন পরে গেল রাজপ্রাসাদে।

তার খানিক বাদেই সারস উড়ে এসে জানলায় দিল টোকা।

দর্জি জানলা খুলতে গম্ভীর মুখে সাবধানে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ভারিক্কি চালে শ্বেতপাথরের মেঝের উপর দিয়ে সারস হেঁটে এল। তার ঠোঁটে ছিল দেবদূতের মতো ফুটফুটে এক শিশু। রানীর দিকে সে বাড়িয়ে দিল তার ছোটো-ছোটো দুটি হাত। রানীর কোলে শিশুকে সারস নামিয়ে দিল আর আনন্দে অধীর হয়ে চুমোয় চুমোয় তিনি ভরিয়ে দিলেন তার দুই গাল। কাঁধ থেকে একটা ঝুলি নামিয়ে রানীকে দিয়ে সারস চলে গেল। সেই ঝুলিতে ছিল খেজুর, আখরোট, কিসমিস আর হরেক ধরনের লজেন্স। সেগুলো ছোটো-ছোটো

রাজকন্যেদের ভাগ করে দেওয়া হল। কিন্তু বড়ো রাজকন্যের কপালে সেগুলো জুটল না। কারণ তার ভাগে পড়েছিল হাসিখুশি ছোট্টো-খাট্টো সেই দর্জি।

দর্জি বলল, "আমার মায়ের কথাগুলো সত্যি বলে প্রমাণ হল। তিনি সব সময় বলতেন—ভগবানে বিশ্বাস রেখো, মন কখনো খারাপ কোরো না। তা হলেই শেষটায় আসবে পরম সুখ।"

বিয়ের সময় যে জুতো পরে দর্জি নাচল সেগুলো বানাতে হয়েছিল মুচিকে। তার পর মুচিকে দূর করে দেওয়া হল শহর থেকে। যেখানে ফাঁসিকাঠ ছিল মুচি ধরল সেই পথ। সারাদিন হেঁটে ঘেমে নেয়ে রাগে আর হিংসেয় জ্বলেপুড়ে বেজায় ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য মুচি শুয়ে পড়ল। আর সে চোখ বুজতেই ফাঁসিকাঠ থেকে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে দুটো শকুন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উপড়ে নিল তার চোখদুটো। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সে ছুটে গেল বনের মধ্যে। সেখানেই নিশ্চয় সে মরেছিল। কারণ তাকে দেখা বা তার কথা শোনা আর যায় নি।

কাঁটা-ঝোপের সুদখোর

এক সময় এক ধনী লোকের এক চাকর ছিল। খুব ভালো করে প্রভুর সেবা-যত্ন করত সে। ভোরে সবাইকার আগে সে উঠত আর রাতে সব শেষে যেত ঘুমোতে। যে-কঠিন কাজ কেউ করতে চাইত না সেটা করার জন্য সব সময় সে আসত এগিয়ে। কখনো সে বিরক্ত হত না। সব সময় তার মুখে হাসি লেগে থাকত। তার চাকরির মেয়াদ ফুরলে পর প্রভু তাকে কোনো বেতন দিল না। প্রভু ভাবল, 'এটাই সব চেয়ে ভালো ফন্দি। এতে আমার টাকা বাঁচবে। লোকটাও যাবে না। মুখ বুজে আমার কাজ করবে।'

চাকর কোনো কথা বলল না। প্রথম বছর যেভাবে কাজ করেছিল দ্বিতীয় বছরেও সেভাবে কাজ করে গেল। দ্বিতীয় বছর শেষ হবার পরেও সে বেতন পেল না। তবু মুখ বুজে কাজ করে চলল।

তৃতীয় বছর শেষ হবার পরেও কোনো বেতন না পেতে সে বলল, "কত্তা, তিন বছর বিশ্বস্তভাবে আপনার সেবা করেছি। দয়া করে আমার ন্যায্য বেতন চুকিয়ে দিন। নিজের ভাগ্য-পরীক্ষা করার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই।"

তার কৃপণ প্রভু বলল, "সে কথা সত্যি—তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। উপযুক্ত পুরস্কার তোমার পাওয়া উচিত।"

এই-না বলে পকেট থেকে তিনটে পয়সা বার করে গুণে-গুণে চাকরকে দিয়ে সে বলল, "এই নাও—এক-এক বছরের জন্যে এক-এক পয়সা। এতটা বেতন খুব কম লোকেই তোমায় দেবে।"

চাকরটি ভালো মানুষ। টাকা-পয়সার দাম সে জানত না। তিনটে পয়সা নিয়ে সে ভাবল, 'অনেক জমেছে। কেন তবে আর পরিশ্রমের কাজ করি?'

এই-না ভেবে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সে চলল, নানা পাহাড় পেরিয়ে, নানা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। একদিন হল কি—এক ঝোপের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক বামন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বলল, "কোথায় চলেছ ভায়া? দেখে মনে হচ্ছে তোমার মনে খুব স্ফূর্তি।"

চাকর বলল, "মন খারাপ করে থাকব কেন? আমার প্রচুর টাকা পয়সা। তিন বছরের বেতন আমার পকেটে ঝন্‌ঝন্ করছে।"

বামন প্রশ্ন করল, "তোমার ধন-দৌলত কতটা শুনি?"

"কত?—পুরো তিন-তিনটে পয়সা।"

বামন বলল, "শোনো—আমি গরিব অভাবী লোক। ঐ তিনটে পয়সা আমায় দাও। আমি আর খাটতে পারি না। তোমার বয়েস কম। অনায়াসে তুমি রোজগার করতে পারবে।"

চাকর ছিল ভারি দয়ালু। বামনের কথা শুনে তার খুব করুণা হল। তিনটে পয়সা তাকে দিয়ে সে বলল, "এই নাও। পয়সাগুলো না থাকলেও আমি চালিয়ে নিতে পারব।"

বামন তখন বলল, "তোমার দয়া-মায়া দেখে খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে তিনটে বর দেব—এক-একটা পয়সার জন্যে এক-একটা বর।"

চাকর বলল, "তাই নাকি? দেখছি তুমি জাদুকর। তা হলে আমার এই তিনটে ইচ্ছে পূরণ কর। আমার প্রথম ইচ্ছে এমন একটা গুলতির যেটা দিয়ে যেকোনো জিনিস মারতে পারব। আমার দ্বিতীয় ইচ্ছে এমন একটা বেহালার যেটা বাজালে যে শুনবে সেই নাচতে থাকবে। আমার তৃতীয় ইচ্ছে—কারুর কাছে কোনো জিনিস চাইলে সেটা আমাকে না দিয়ে সে পারবে না।"

বামন বলল, "তোমার তিনটে ইচ্ছেই পূর্ণ হবে।" এই-না বলে ঝোপের মধ্যে সে হাত চালাল। আর অবাক কাণ্ড—সেখান থেকে বেরিয়ে এল একটা গুলতি আর বেহালা! চাকরকে সে দুটো দিয়ে বামন বলল, "যার কাছে যা চাইবে সেটাই পাবে।"

চাকর মনে মনে বলল 'আর আমার অভাব কিসের?' তার পর

আগের চেয়েও ফূর্তিতে সে লাগল হাঁটতে।

যেতে যেতে তার সঙ্গে দেখা হল এক সুদখোরের সঙ্গে। লম্বা তার দাড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনছিল একটা পাখির গান। পাখিটা বসেছিল একটা গাছের মগডালে। সুদখোর বলে উঠল, "অবাক কাণ্ড। ছোট্টো পাখিটার অমন জোরাল গলা কী করে হল? পাখিটাকে কেউ যদি আমায় দিতে পারত!"

চাকর বলল "এই কথা! এক্ষুনি পাখিটা দিচ্ছি!" এই-না বলে সে গুলতি ছুঁড়ল আর সঙ্গে-সঙ্গে ডানা ঝট্‌পট্ করে পাখিটা এসে পড়ল এক কাঁটা ঝোপে। সুদখোরকে চাকর বলল, "ওরে বদমাশ, ঝোপ থেকে পাখিটা নিয়ে আয়।"

সুদখোর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল কাঁটা ঝোপে। সুদখোর যখন ঝোপের মাঝখানে পৌঁচেছে ফূর্তিবাজ চাকরের কী খেয়াল হল—সে বাজাতে শুরু করে দিল তার বেহালা। সঙ্গে-সঙ্গে সুদখোর শূন্যে পা তুলে তুলে নাচতে লাগল। যত সে দ্রুত বাজায় তত দ্রুত ওঠা নামা করতে থাকে সুদখোরের পা। দেখতে-দেখতে কাঁটায় ছিঁড়ে গেল তার ময়লা কোট, দাড়ি লাগল ফর্‌ফর্ করে উড়তে আর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ। ত্রাহি-ত্রাহি রব ছেড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই তোমার! বেহালা থামাও। আর নাচতে চাই না।"

চাকর কিন্তু বেহালা বাজানো বন্ধ করল না। ভাবল, 'বহু লোককে এ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছে। কাঁটার জ্বলুনি এখন খানিক ভোগ করুক।' তাই সে বেহালাটা বাজিয়েই চলল আর সেইসঙ্গে সুদখোর চলল নেচে। তার কোটের টুকরোগুলো ঝুলতে লাগল ঝোপের কাঁটায়।

সুদখোর চেঁচাতে লাগল, "দোহাই তোমার! থামাও থামাও! তোমায় এক থলি মোহর দেব।"

চাকর বলল, "তুমি দেখছি ভারি উদার! থামলাম। কিন্তু একটা কথা বলি—নাচে তোমার জুড়ি নেই!" এই-না বলে থলি ভরা মোহর নিয়ে সে চলে গেল।

সুদখোর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। চাকর চোখের আড়াল হলে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে মাটিতে পা ঠুকে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে হতভাগা! তোকে একবার বাগে পেলে মজা দেখাব। খুঁজে তোকে বার করবই!" তার পর রাগ খানিক

পড়তে শহরে হাকিমের কাছে ছুটে গিয়ে সে বলল, "হুজুর! ধর্মাবতার! রাজপথে এক বদমাশ আমার যথাসর্বস্ব ডাকাতি করে নিয়ে আমায় মারধর করে পালিয়েছে। আমি বিচার চাই। ডাকাতটাকে হাজতে ভরুন।"

হাকিম প্রশ্ন করলেন, "লোকটা কি সৈনিক? তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে কি তোমায় ওরকম ক্ষত-বিক্ষত করেছে?"

সুদখোর বলল, "না হুজুর! তার কাছে তরোয়াল-টরোয়াল ছিল

না। তার কাঁধে ঝোলানো ছিল একটা গুলতি আর গলায় একটা বেহালা। সেগুলো দেখলেই বদমাশটাকে চেনা যাবে।"

তাকে খুঁজতে হাকিম তাঁর কর্মচারীদের পাঠালেন। চাকর ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছিল। তাই বেশি দূরে যায় নি। সহজেই হাকিমের কর্মচারীরা তার দেখা পেল। দেখল তার সঙ্গে রয়েছে এক থলি মোহর। আদালতে হাজির হয়ে সে বলল, "সুদখোরকে আমি ছুঁই নি। তার মোহরগুলোও নিই নি। নিজে থেকেই আমায় সে দিয়েছে—যাতে

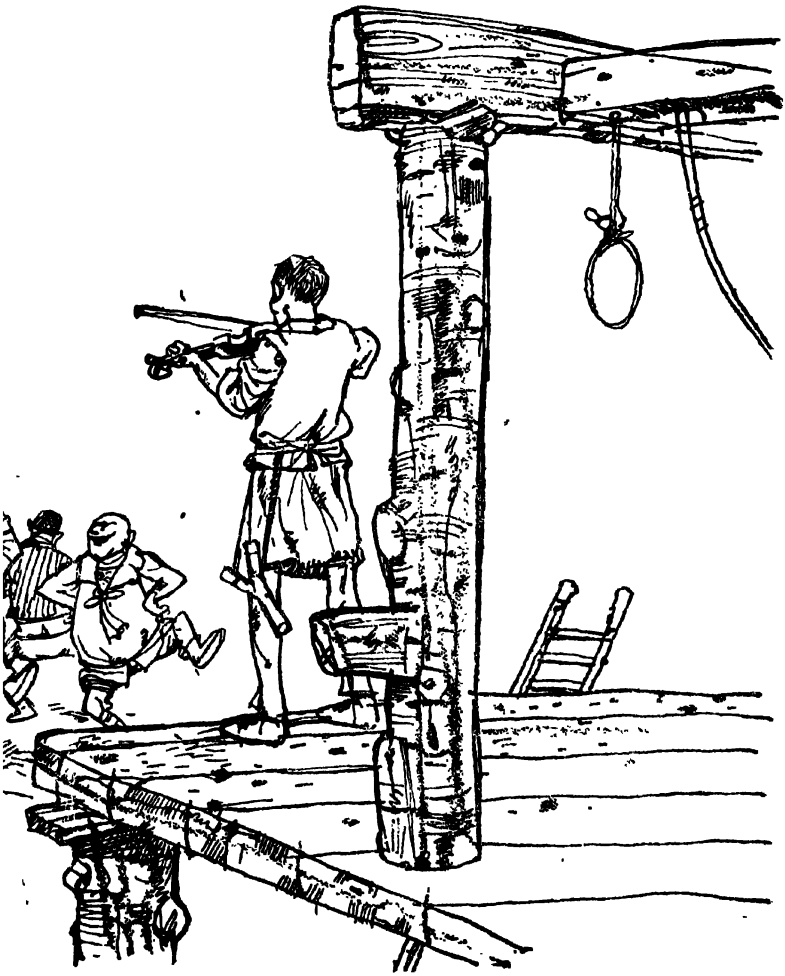

আমি বেহালা বাজানো থামাই। কারণ গান-বাজনা তার ধাতে সয় না।"

সুদখোর বলল, "তাহা মিথ্যে কথা।"

হাকিম তার কথা বিশ্বাস না করে বললেন, "কোনো সুদখোর কাউকে কখনো মোহর দেয় না।" রাজপথে ডাকাতি করার জন্য চাকরের ফাঁসির হুকুম তিনি দিলেন।

ফাঁসিতে লটকাবার জন্য তাকে নিয়ে যাবার সময় সুদখোর চেঁচিয়ে উঠল, "পাজি, বদমাশ! এইবার তোর কাজের উপযুক্ত পুরস্কার পাবি।"

জল্লাদের সঙ্গে চুপচাপ মই বেয়ে চাকর উঠল ফাঁসির মঞ্চে। মই-এর শেষ ধাপে পৌঁছে হাকিমের দিকে ফিরে সে বলল, "মরার আগে আমার শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করুন।"

হাকিম বললেন, "নিজের প্রাণভিক্ষে ছাড়া তোমার যেকোনো ইচ্ছে পূর্ণ করব।"

চাকর বলল, "আমি প্রাণভিক্ষে চাইছি না। আমি শুধু চাইছি শেষবারের মতো আমার বেহালাটা বাজাতে।"

তার কথা শুনে দারুণ আতঙ্কে কাঁদতে কাঁদতে সুদখোর বলল, "দোহাই ধর্মাবতার! ওকে বাজাতে দেবেন না! ওকে বাজাতে দেবেন না!"

কিন্তু হাকিম বললেন, "এই সামান্য আনন্দ থেকে কেন ওকে বঞ্চিত করব? ওর শেষ ইচ্ছে পূর্ণ হবে।" হাকিম তার ইচ্ছে পূর্ণ না করে পারলেন না। কারণ চাকরকে বামন বর দিয়েছিল—যার কাছে যা চাইবে তাই পাবে।"

সুদখোর তখন চেঁচাতে শুরু করল, "হায় হায়! হায় হায়! আমাকে বেঁধে রাখ! আমাকে বেঁধে রাখ!"

চাকর তখন তার বেহালাটা তুলে নিল। ছড়ের প্রথম টানে সবাই হয়ে উঠল চঞ্চল—হাকিম, মুন্‌শি, আদালতের কর্মচারী এবং আর সবাই। সুদখোরকে যে বাঁধতে যাচ্ছিল তার হাত থেকে খসে পড়ল দড়িটা। চাকর দ্বিতীয়বার ছড়ে টান দিতে নাচবার জন্য সবাইকার পায়ের ডগা উঠল সুড়্‌সুড়িয়ে। চাকরকে ছেড়ে দিয়ে জল্লাদ নাচের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। আর ছড়ের তৃতীয় টানে সবাই লাফিয়ে উঠে

শুরু করে দিল নাচতে। সামনের সারিতে ছিলেন হাকিম স্বয়ং আর সেই সুদখোর। এঁরা দুজনেই সব চেয়ে বেশি লাফাতে লাগলেন। হাটের খোলা মাঠে ফাঁসি দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে বহু লোক এসেছিল—বুড়ো আর তরুণ, মোটা আর রোগা। সবাই তারা একসঙ্গে শুরু করে দিল নাচতে। পথের কুকুরগুলোও পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সবাইকার সঙ্গে নাচিয়েদের দলে যোগ দিল। চাকর যত বাজায় তত বেশি লাফিয়ে লাফিয়ে সবাই থাকে নাচতে। ফলে লোকেদের মাথা ঠোকাঠুকি হতে লাগল, যন্ত্রণায় তারা আর্তনাদ করতে লাগল। কিন্তু নাচ থামাতে পারল না।

শেষটায় হাকিম প্রায় খাবি খেতে-খেতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তোমার ফাঁসি রদ করে দিচ্ছি! দোহাই তোমার—বেহালা বাজানো বন্ধ কর।"

চাকর তখন বেহালাটা তার গলায় ঝুলিয়ে মই বেয়ে নেমে এল। সুদখোর তখন মাটিতে শুয়ে হাঁপাচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে বলল, "কবুল কর কোথা থেকে মোহরগুলো পেয়েছিলে। নইলে আবার বেহালা বাজাতে শুরু করব।"

সুদখোর কাতরাতে কাতরাতে বলল, "আমি চুরি করেছিলাম। চুরি করেছিলাম। কিন্তু সব মোহর সৎ উপায়ে তুমি রোজগার করেছিলে।"

হাকিম তখন চুরি করেছিল বলে সুদখোরকে ফাঁসিতে লটকাতে আদেশ দিলেন।

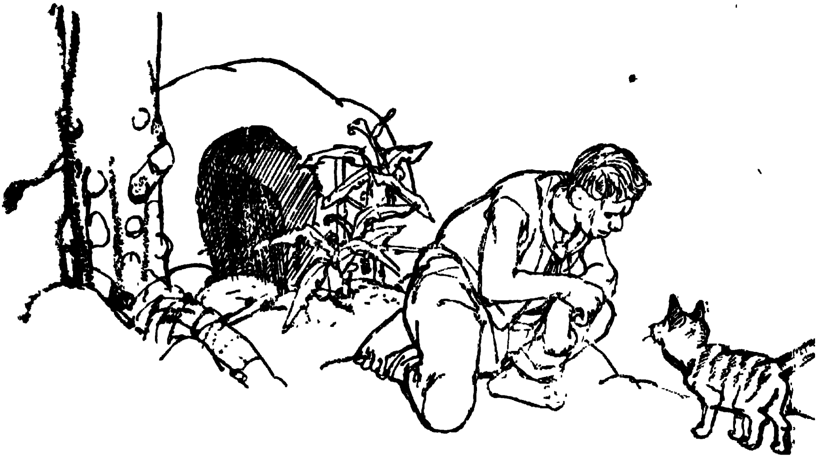

বেড়াল-ছানা আর জাঁতাওয়ালার চাকর

এক জাঁতাকলে থাকত বুড়ো এক জাঁতাওয়ালা। তার না ছিল বউ, না ছিল ছেলেপুলে। তার অধীনে কাজ করত তিনজন শিক্ষানবিস। কয়েক বছর সেখানে কাজ করার পর জাঁতাওয়ালা একদিন তাদের বলল, "আমি বুড়ো হয়েছি। এখন আমি উনুন-তাতে বসে থাকতে চাই। তোমরা বেরিয়ে পড়। আমার জন্যে সব চেয়ে ভালো ঘোড়া যে নিয়ে আসবে তাকেই দেব আমার জাঁতাকল। তার বদলে যতদিন না মরি তাকে আমার দেখাশোনা করতে হবে।"

শিক্ষানবিসদের মধ্যে যে তৃতীয়জন তার নাম হান্‌স্‌। সে ছিল ফাইফরমাশ খাটার চাকর। অন্য দুজন শিক্ষানবিস মনে করত ছেলেটা একটা গবেট।

জাঁতাওয়ালার কথা শুনে তারা তিনজনেই পড়ল বেরিয়ে। যেতে-যেতে একটা গ্রামের কাছে পৌঁছে বোকা হান্‌স্‌কে অন্য দুজন বলল, "তুই এখানে থেকে যা। জীবনে কোনো ঘোড়া তুই জোগাড় করতে পারবি না।" হান্‌স্‌ কিন্তু তাদের সঙ্গ ছাড়ল না। রাত হতে একটা গর্তে পৌঁছে ঘুমুবার জন্য সেটার মধ্যে তারা শুয়ে পড়ল। যতক্ষণ-না

হান্‌স্‌ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ চালাক দুজন অপেক্ষা করে রইল। তার পর হান্‌স্‌কে সেখানে ফেলে তারা চলে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে হান্‌স্‌ দেখে সে শুয়ে রয়েছে গভীর একটা গর্তের মধ্যে। চার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "কী কাণ্ড। কোথায় এলাম ?" তার পর হামাগুড়ি দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে বনে গিয়ে সে মনে-মনে বলল, 'আমাকে একলা ফেলে ওরা চলে গেছে। কী করে একটা ঘোড়া এখন জোগাড় করি ?'

এই-সব ভাবতে-ভাবতে সে চলেছে এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডোরা-কাটা বাদামী রঙের একটা বেড়াল ছানার।

মিষ্টি গলায় সে প্রশ্ন করল, "হান্‌স্‌, চলেছে কোথায় ?"

হান্‌স্‌ বলল, "তুমি আমায় সাহায্য করতে পারবে না।"

বেড়াল ছানা বলল, "জানি কী চাও—একটা সুন্দর ঘোড়া। সাত বছর আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য হয়ে থাকলে এমন একটা ঘোড়া তোমায় দেব যেটার মতো চমৎকার ঘোড়া জীবনে দেখ নি।"

হান্‌স্‌ ভাবল, 'এযে দেখছি আশ্চর্য বেড়াল। চেষ্টা করে দেখা যাক এ সত্যি কথা বলছে কি না।'

বেড়াল ছানা তাকে নিয়ে গেল তার জাদুর কেল্লায়। সেখানে কয়েকটা বেড়াল তার পরিচর্যা করত। তুড়ুক্‌-তুড়ুক্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে তারা ওঠানামা করে। তাদের স্বভাব ভারি মিষ্টি আর ভারি তারা ফুর্তিবাজ। সন্ধেয় হান্‌স্‌ আর বেড়াল ছানা খেতে বসলে দুটো বেড়াল তাদের গান-বাজনা শোনাল। তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে টেবিলটা তারা পরিষ্কার করে ফেলল। বেড়াল ছানা তার পর বলল, "হান্‌স্‌, এবার আমার সঙ্গে নাচতে এসো।"

হান্‌স্‌ বলল, "না, পুসি বেড়ালের সঙ্গে আমি নাচি না—জীবনে তাদের সঙ্গে নাচি নি।"

বেড়াল ছানা অন্য বেড়ালদের বলল, "তা হলে ওকে তোমরা শুইয়ে দিয়ে এসো।" একটা বেড়াল তখন বাতি দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেল শোবার ঘরে, একটা বেড়াল খুলে দিল তার জুতো, একটা বেড়াল ছাড়িয়ে দিল তার মোজা আর একটা বেড়াল ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বাতিটা।

পরদিন সকালে তারা এসে বিছানা থেকে হান্‌স্‌কে উঠতে সাহায্য করল। একজন তাকে পরিয়ে দিল মোজা, একজন পরিয়ে দিলে জুতো,

একজন ধুইয়ে দিল মুখ আর একজন লেজ দিয়ে তার মখ দিল মুছে।

তাদের ব্যবহারে খুব খুশি হল হান্‌স্। কিন্তু বেড়াল ছানার নানা ফাইফরমাশ তাকে খাটতে হত। আর প্রতিদিন কাটতে হত কাঠ। তার জন্যে তাকে দেওয়া হয়েছিল তামার ফলাওলা রুপোর একটা কুড়ুল, রুপোর গোঁজ আর রুপোর করাত। এইভাবে সে কাঠ কাটে, বাড়িতে থাকে আর ভালো খাওয়া-দাওয়া করে। কিন্তু সেই পুসি বেড়াল আর তার চাকর-বাকর ছাড়া আর কারুরই দেখা সে পায় না।

একদিন বেড়াল ছানা তাকে বলল, "আমার ক্ষেতের ঘাস কেটে শুকিয়ে রেখো।" তাকে সে দিল রুপোর একটা কাস্তে আর সেটা শানাবার শান-পাথর হিসেবে এক তাল সোনা। সেগুলো দিয়ে সে বলল, "এগুলো ফিরিয়ে দিতে ভুলো না যেন।"

ক্ষেতে গিয়ে বেড়াল ছানার কথামত কাজগুলো সে করল। কাজ শেষ হবার পর রুপোর কাস্তে, সোনার তাল আর খড়ের আঁটি বাড়িতে বয়ে এনে বেড়াল ছানাকে সে বলল, "এবার আমার বেতন চুকিয়ে দেবে?"

বেড়াল ছানা বলল, "আমার আর-একটা কাজ তোমায় করতে হবে। রুপোর পাটা আর রুপোর যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমার আছে। সেগুলো দিয়ে আমার জন্যে ছোট্টো একটা বাড়ি বানিয়ে দাও।"

ছোট্টো বাড়িটা বানিয়ে দিয়ে হান্‌স্ বলল, "তোমার সব হুকুম তামিল করেছি। এখনো কিন্তু ঘোড়াটা পেলাম না। এদিকে সাতটা বছর কেটে গেছে।"

বেড়াল ছানা বলল, "আমার ঘোড়াগুলো দেখবে?"

হান্‌স্ বলল, "দেখব।"

বেড়াল ছানা তখন তার ছোট্টো বাড়ির দরজাগুলো খুলে দিল আর হান্‌স্ দেখল সেখানে রয়েছে এমন চমৎকার বারোটা ঘোড়া যে দেখলেই মন খুশি হয়ে ওঠে।

বেড়াল ছানা তার পর তাকে ভালো-ভালো খাবার-দাবার খাইয়ে বলল, "তুমি বাড়ি ফিরে যাও। এখনো তোমার ঘোড়াটা দেব না। তিনদিনের মধ্যে সেটা আমি সঙ্গে নিয়ে আসব।"

হান্‌স্‌কে বেড়াল ছানা দেখিয়ে দিল জাঁতাকলে যাবার পথটা। তাকে কিন্তু কোনো নতুন পোশাক বেড়াল ছানা দেয় নি। যে-পুরনো

ধুলধুলে আলখাল্লাটা সঙ্গে এনেছিল সেটাই পরতে বাধ্য হল হান্‌স্। এই সাত বছরে সেটা বেজায় ছোটোও হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি গিয়ে দেখে অন্য দুজন গরিব শিক্ষানবিস আগেই ফিরেছে। দুজনেই তারা ঘোড়া এনেছিল বটে—কিন্তু একটা ঘোড়া কানা, অন্যটা খোঁড়া। তারা প্রশ্ন করল, "তোর ঘোড়া কোথায় ?"

হান্‌স্ বলল, "তিনদিনের মধ্যে আসবে।"

তারা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "তাই নাকি হান্‌স্ ? ঘোড়াটা পাবি কোত্থেকে ?"

হান্‌স্ গেল বসার ঘরে। জাঁতাওয়ালা তাকে বলল, "খাবার টেবিলে খেতে বসবি না। তোর পোশাক-আশাক ময়লা, ছেঁড়া ধুলধুলে। অন্য কেউ এলে আমরা লজ্জায় পড়ব।"

বাড়ির বাইরে তাকে তারা সামান্য খাবার দিল। রাতে অন্য দুই শিক্ষানবিস তাকে শোবার বিছানা দিল না। তাই হাঁসদের ছাউনির মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে খড়খড়ে খড়ের উপর সে শুয়ে পড়ল।

এইভাবে তিনদিন কাটার পর ভোর হলে ছটা চোখ-ধাঁধানো ঘোড়ায় টানা একটা জুড়িগাড়ি সেখানে এসে পৌঁছল। আর সেইসঙ্গে আর-একটা চমৎকার ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে এল এক চাপরাসি। সে-ঘোড়াটা জাঁতাওয়ালার গরিব শিক্ষানবিস হান্‌স্-এর।

সেই জুড়িগাড়ি থেকে অপরূপ রূপসী এক রাজকন্যে নেমে গেল জাঁতা কারখানার মধ্যে। এই রাজকন্যেই সেই ছোট্টো পুসি বেড়াল ছানা, যার কাছে হান্‌স্ সাত বছর কাজ করেছিল। জাঁতাওয়ালাকে রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "তোমার ফাইফরমাশ খাটার সেই ছোকরা চাকর কোথায় ?"

জাঁতাওয়ালা বলল, "জাঁতা কারখানায় তাকে আমরা ঢুকতে দিই নি। তার পোশাক-আশাক কুট্‌কুটে ময়লা আর ধুলধুলে ছেঁড়া। সে আছে হাঁসদের ছাউনির মধ্যে।"

রাজকন্যে বলল, "এক্ষুনি তাকে নিয়ে এসো।" সেই ছোট্টো আল-খাল্লাটা কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে হান্‌স্ সেখানে হাজির হল। চাপরাসি তখন তাকে স্নান-টান করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বাক্স থেকে একটা চমৎকার পোশাক বার করে পরাল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সে দেখতে হয়ে উঠল যে-কোনো রাজার চেয়েও সুন্দর। রাজকন্যে

তখন দেখতে চাইল অন্য দুটো ঘোড়া, যেগুলো এনেছিল অন্য দুই শিক্ষনবিস। তাদের একটা কানা, অন্যটা খোঁড়া। সে দুটো দেখে রাজকন্যে চাপরাসিকে বলল তার সপ্তম ঘোড়াটা আনতে। সেটা দেখে জাঁতাওয়ালা স্বীকার করল, অমন চমৎকার ঘোড়া তার আঙিনায় কখনো আসে নি।

রাজকন্যে বলল, "এটা তোমার তৃতীয় শিক্ষানবিসের।"

জাঁতাওয়ালা বলল, "এই জাঁতাকল তা হলে তারই প্রাপ্য।"

রাজকন্যে বলল, "এই জাঁতাকল আর এই ঘোড়া তোমারই রইল।" এই-না বলে তার বিশ্বস্ত হান্স্-এর হাত ধরে সে গিয়ে উঠল তার জুড়িগাড়িতে। প্রথমে তারা গেল সেই ছোট্টো রুপোর বাড়িতে, রুপোর যন্ত্রপাতি দিয়ে হান্স্ যেটা বানিয়েছিল। সেটা তখন হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ আর তার ভিতরকার সব-কিছু সোনা রুপো দিয়ে তৈরি। সেই প্রাসাদে রাজকন্যে বিয়ে করল হান্স্কে। হান্স্ তখন এমন ধনী হয়ে উঠল যে, আজীবন অভাব বলে তার কিছু রইল না। অতএব এ কথা কখনো কারুর বলা উচিত নয়—বোকা লোকের কখনো ভালো হয় না।

কাঁচের কফিন

কখনো বোলো না—গরিব দর্জি মানী লোক হতে পারে না। ঠিকমতো কাজ করলে আর ভাগ্য প্রসন্ন হলে নিশ্চয়ই সে মানী লোক হয়ে উঠতে পারে।

এক সময় তরুণ এক দর্জি ঘুরতে-ঘুরতে গহন এক বনে পথ হারিয়ে ফেলল। দেখতে-দেখতে রাত হয়ে গেল। জায়গাটা এমন চুপচাপ যে বুক দুর্‌দুর্‌ করে ওঠে। নরম শ্যাওলার বিছানায় শুয়ে পড়া ছাড়া তার আর করার কিছু ছিল না। কিন্তু বুনো জন্তুর ভয়ে দু চোখের পাতা সে এক করতে পারল না। শেষটায় স্থির করল একটা গাছে চড়বে। তাই সব চেয়ে উঁচু একটা ওকগাছের মগডালে সে উঠে পড়ল। সঙ্গে তার লোহার ইস্ত্রিটা ছিল। নইলে বাতাসের ঝাপটায় সে উড়ে যেত।

অন্ধকারের মধ্যে গাছের ডালে বসে ভয়ে সে কাঁপতে লাগল। এইভাবে ঘণ্টা কয়েক কাটার পর তার চোখে পড়ল খানিকটা দূরে একটা আলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আলো দেখে তার মনে হল নিশ্চয়ই সেটা কোনো বাড়িতে জ্বলছে। ভাবল সেখানে গেলে গাছের এই মগডালের চেয়ে ভালো আশ্রয় জুটবে। তাই সাবধানে গাছ থেকে নেমে যেদিক দিয়ে আলো আসছিল সেদিকে সে চলল। খানিক যেতেই সে পৌঁছল ছোট্টো একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটা বেণু-বাঁশ আর নল-খাগড়া দিয়ে তৈরি। সাহস করে সে টোকা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। দর্জি দেখে ভিতরে রয়েছে বুড়ো একটা বামন।

কর্কশ গলায় বামন প্রশ্ন করল, "কে তুমি ? কী চাও ?"

সে বলল, "আমি গরিব দর্জি। এই বনে রাতে পথ হারিয়ে ফেলেছি। রাত কাটাবার জন্যে তোমার বাড়িতে আশ্রয় চাই।"

বুড়ো বামন বলল, "এখান থেকে ভেগে পড়। ভবঘুরেদের আমি আশ্রয় দিই না। অন্য জায়গায় আশ্রয় খোঁজো গে।"

এই-না বলে বামন তার বাড়িতে ঢুকতে গেল। কিন্তু দর্জি তার কোটের পিছন দিক ধরে এমন কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যে, শেষপর্যন্ত রাজি না হয়ে সে পারল না। আসলে প্রথমে বামনকে যতটা খারাপ বলে মনে হয়েছিল ততটা খারাপ সে নয়। দর্জিকে ঘরের এক কোণে থাকতে দিয়ে সে তাকে খাবার-দাবার দিল।

ক্লান্ত দর্জি সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল তার পরদিন ভোরে। এমনিতে তখন ঘুম তার ভাঙত না। ঘুম ভেঙেছিল ভয়ানক হৈচৈ চেঁচামেচি শুনে। অমন চেঁচামেচি জীবনে সে শোনে নি। সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে, চট্‌পট্ পোশাক পরে কী ব্যাপার দেখার জন্য সে ছুটে বেরুল: বেরিয়ে দেখে বাড়িটার কাছে প্রকাণ্ড একটা কালো ষাঁড় আর সুন্দর একটা হরিণ সাংঘাতিক মারামারি করছে। তাদের চীৎকারে আর তাদের ক্ষুরের চাপে আকাশ-বাতাস-মাটি উঠছে থর্‌থর্ করে কেঁপে। বহুক্ষণ বোঝা গেল না কে জিতবে। শেষটায় ষাঁড়ের পেটে হরিণ শিঙ বিঁধিয়ে দিতে বিকট গর্জন করে ষাঁড়টা পড়ে গেল। তার পরে হরিণের শিঙের আরো কয়েকটা গুঁতোয় সেটা গেল মরে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দর্জি তাদের লড়াই দেখছিল। হঠাৎ হরিণটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তেড়ে এসে আঁকাবাঁকা শিঙ দিয়ে তাকে গুঁতিয়ে তুলে নিয়ে ছুটে চলল পাহাড়-ঝরনা-উপত্যকার উপর দিয়ে। দর্জির মনে হল সে যেন উড়ে চলেছে। শেষটায় প্রকাণ্ড একটা পাথরের সামনে থেমে ধীরে ধীরে দর্জিকে সে নামিয়ে দিল। জ্ঞান ফিরতে দর্জি দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে পাথরের গায়ে একটা দরজায় হরিণটা ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে। তার শিঙের ধাক্কায় আগুন জ্বলে উঠল, ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। শেষটায় দড়াম্ করে দরজাটা খুলে যেতে হরিণ হল অদৃশ্য।

দর্জি ভেবে পেল না কোন পথ ধরে সভ্য সমাজে ফিরে যাবে। এমন সময় পাথরটার মধ্যে থেকে একটা স্বর তাকে বলল, "নির্ভয়ে

ভেতরে চলে এসো। তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না।" কথাগুলো শুনে ভয়ে শিউরে উঠল দর্জি। কিন্তু আদেশটা অমান্য করতে পারল না। লোহার দরজার মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে পৌঁছল প্রকাণ্ড এক হল-ঘরে। সেটার ছাত, মেঝে, দেয়াল চৌকো চৌকো পাথর দিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটা পাথরের উপরেই খোদাই করা অদ্ভুত একটা নক্‌শা। মুগ্ধ হয়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বেরুবার জন্য সে যখন ফিরতে যাচ্ছে সেই স্বর আবার বলল, "হলঘরের মাঝখানের পাথরটার ওপর গিয়ে

দাঁড়াও। তা হলেই তোমার কপাল ফিরে যাবে।" দর্জির মনে তখন খানিকটা সাহস ফিরে এসেছিল। তাই বিনা দ্বিধায় সেখানে গিয়ে সে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে পাথরটা নীচে নেমে থামল একই আয়তনের আর-একটা হলঘরে। সেখানে ছিল অনেক অদ্ভুত সুন্দর জিনিস। ঘরের দেয়ালগুলোর মধ্যে ছিল অনেক কুলুঙ্গি আর সেই কুলুঙ্গিতে কাঁচের বোয়েমের মধ্যে নানা রঙের মদ আর নীল ধোঁয়া। হলঘরের মেঝেয় পাশাপাশি কাঁচের দুটি আধার দেখে

কৌতূহলী হয়ে সেগুলোর মধ্যে কী আছে দেখার জন্যে সে এগিয়ে গেল। একটি আধারে ছিল আস্তাবল, খামার আর বারবাড়ি সমেত ছোট্টো একটা কেল্লার নিখুঁত মডেল। দেখে মনে হয় সেটা কোনো সুদক্ষ কারিগরের বানানো।

অবাক হয়ে মডেলটা সে দেখছে এমন সময় সেই স্বর আবার তাকে বলল অন্য আধারটা দেখতে।

অবাক হয়ে দর্জি দেখল তার মধ্যে রয়েছে অপরূপ রূপসী একটি মেয়ে। দেখে মনে হয় যেন ঘুমচ্ছে। মাথায় তার হালকা রঙের দীর্ঘ চুল। চোখদুটি বোজা। উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে একটা ফিতেকে দুলতে দেখে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় মেয়েটি বেঁচে। অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দুরুদুরু বুকে তার দিকে দর্জি তাকিয়ে আছে এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি চোখ মেলে তাকাল আর তাকে দেখে ভারি খুশি হয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল: "ভগবানের কী দয়া! আমার উদ্ধারকর্তা এসে গেছে। চট্‌পট্‌ বন্দীদশা থেকে আমাকে মুক্ত করো। কাঁচের এই কফিনের ছিট্‌কিনিটা খুললেই আমি মুক্তি পাব।"

বিনা দ্বিধায় দর্জি তার কথামতো কাজ করতেই মেয়েটি কাঁচের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে এল। তার পর দৌড়ে হলঘরের এক কোণে গিয়ে লম্বা একটা আঙরাখা গায়ে জড়িয়ে পাথরের একটা বেঞ্চিতে বসে দর্জিকে বলল তার পাশে বসতে। দর্জি গিয়ে তার পাশে বসতে তার ঠোঁটে চুমু খেয়ে মেয়েটি বলল, অনেকদিন ধরে তোমার অপেক্ষায় আছি। শেষপর্যন্ত ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার সব দুঃখ ঘোচাতে। যেদিন আমার দুঃখ ঘুচবে সেদিন থেকে শুরু হবে তোমার সুখের সময়। কারণ তুমিই আমার বর। ভালো-ভালো সব-কিছু তুমি পাবে। জীবনে অভাব বলতে কিছু তোমার থাকবে না। আমার অতীতের কাহিনী এবার শোনাই:

"আমি এক ধনী জমিদারের মেয়ে। খুব ছেলেবেলায় আমার বাবা-মা মারা যান। মারা যাবার সময় আমার ভার তাঁরা দিয়ে যান বড়ো ভাইয়ের ওপর। বড়ো ভাই আমাকে মানুষ করে। আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসতাম। সব দিক দিয়েই আমাদের মনের এমন মিল ছিল যে, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কেউই কখনো বিয়ে করব না—জীবনের

শেষদিন পর্যন্ত থাকব একসঙ্গে। আমাদের বাড়িতে প্রতিবেশী আর বন্ধুরা সব সময় আসত। সবাইকেই আমরা আদর-যত্ন করতাম। এক রাতে হল কি—ঘোড়ায় চড়ে এক বিদেশী লোক আমাদের কেল্লায় এসে বলল, পরের গ্রামে পৌঁছতে খুব রাত হয়ে যাবে, তাই সে আশ্রয় চায়। তাকে আমরা আদর-অভ্যর্থনা করে থাকতে দি। রাতে খেতে বসে অনেক মজার-মজার গল্প বলে সে আমাদের জমিয়ে রাখে। তাকে আমার ভাইয়ের খুব পছন্দ হয়ে যায়। তাই তাকে সে অনুরোধ করে আমাদের সঙ্গে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে। খানিক ইতস্তত করে থাকতে সে রাজি হয়। খাবার টেবিল ছেড়ে আমরা যখন উঠি তখন অনেক রাত। বিদেশী লোকটিকে তার ঘর দেখিয়ে দিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে আমি গিয়ে শুই আমার পালকের বিছানায়। সবে তখন তন্দ্রা এসেছে—এমন সময় নিচু গলায় খুব মিষ্টি গানের সুরে আমি জেগে উঠি। গানটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে না পেরে ভেবেছিলাম দাসীকে ডাকব। সে শুতো পোশাক-পরার ঘরে। কিন্তু উঠতে গিয়ে আঁতকে উঠে দেখি আমার বুকে যেন একটা পাহাড় চেপে বসেছে। না পারি কোনো শব্দ করতে, না পারি হাত-পা নাড়াতে। এইরকম অসাড় হয়ে যখন শুয়ে আছি, তখন, রাতে ঘরে যে বাতি জ্বলে তার আলোয় দেখি আমার ঘরের জোড়া-দরজার ভেতর দিয়ে সেই বিদেশী লোককে আসতে। আমার কাছে এসে সে বলে, জাদুর মন্ত্রে সে আদেশ দিয়েছে ঐ মিষ্টি গান গেয়ে আমাকে জাগাতে আর সে এসেছে আমাকে তার ভালোবাসা জানিয়ে বিয়ে করতে। লোকটা জাদুকর জানতে পেরে ঘেন্নায় আমার মন ভরে ওঠে। তাই তার কথার কোনো উত্তর দিই নি। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বোধ হয় আশা করে তাকে বিয়ে করতে আমি রাজি হব। কিন্তু আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভীষণ রেগে সে বলে প্রতিশোধ নেবে। তার পর ঘর থেকে সে চলে যায়। বাকি রাত দারুণ আতঙ্কে আমি জেগে থাকি। সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে ভাইয়ের ঘরে যাই সব কথা জানাতে। কিন্তু সে তখন ঘরে ছিল না। তার চাকর বলে খুব ভোরে ঘোড়ায় চড়ে সেই বিদেশীর সঙ্গে সে বেরিয়েছে শিকারে। একটা অশুভ আশঙ্কায় আমার বুক দুর্‌দুর্ করে ওঠে। চট্‌পট্ পোশাক পরে মাত্র একজন চাকর নিয়ে

ঘোড়ায় চড়ে আমি যাই বনে। পথে চাকরের ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে খোঁড়া হয়ে যায়। ফলে একলাই যেতে হয় আমাকে। মিনিট কয়েক পরে দেখি সেই বিদেশী সুন্দর একটা হরিণের গলায় দড়ি বেঁধে আনছে। আমার কাছে সে আসতে আমি প্রশ্ন করি, আমার ভাই কোথায় আর সুন্দর হরিণটা কোথায় সে পেয়েছে। হরিণের করুণ চোখ দিয়ে তখন টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ছিল। আমার কথার জবাব না দিয়ে লোকটা হো-হো করে হেসে ওঠে। তার হাসি দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে একটা পিস্তল বার করে তাকে আমি গুলি করি। একটা গুলি তার বুক থেকে ছিট্‌কে এসে আমার ঘোড়ার মাথায় বেঁধে। আমি মাটিতে পড়ে যেতেই বিদেশী লোকটা বিড়্‌বিড়্‌ করে কী সব বলে। সঙ্গে-সঙ্গে আমি জ্ঞান হারাই। জ্ঞান হতে দেখি মাটির তলার এই হলঘরে একটা কাঁচের কফিনের মধ্যে শুয়ে আছি। শয়তানটা আর-এক বার এসে বলে আমার ভাইকে সে হরিণ করে দিয়েছে; আমাদের কেল্লা আর সেটার আশপাশের সব জিনিসকে খুব ছোট্টো করে ফেলে সে রেখেছে আর একটা আধারে; কাঁচের বোয়েমগুলোর মধ্যে ধোঁয়ার আকারে রয়েছে আমাদের সব দাসদাসীরা। সে আরো জানায় তার প্রস্তাবে রাজি হলে সঙ্গে-সঙ্গে সবাইকে মুক্তি দিয়ে আগেকার মতো করে দেবে। প্রথমবারের মতোই আমি থাকি চুপ করে। সে তখন অদৃশ্য হয়ে যায় আর আমি পড়ি অঘোরে ঘুমিয়ে। তার পর অদ্ভুত একটা স্বপ্নে দেখি এক তরুণ আসছে আমাকে মুক্তি দিতে। আর আজ জেগে উঠে তোমাকে দেখে বুঝি স্বপ্নটা সফল হয়েছে। এখন বাকি কাজগুলো করতে আমায় সাহায্য কর। যে-চওড়া পাথরের ওপর কাঁচের কফিনের মধ্যে আমাদের কেল্লাটা রয়েছে প্রথমে সেই কফিনটা তোল।"

কাঁচের কফিনটার দুদিক দুজনে ধরে সেই পাথরটার উপর তারা দাঁড়াতে সেটা ধীরে ধীরে উপরে উঠে ছাতের একটা ফোকর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। মেয়েটি ঢাকনা খুলতেই সেই কেল্লা আর বাড়িগুলো ক্রমশ বড়ো হতে হতে স্বাভাবিক আকার ফিরে পেল। আবার মেয়েটির সঙ্গে তলার সেই ঘরে গিয়ে কাঁচের বোয়েমগুলো দজি নিয়ে এল। মেয়েটি সেগুলোর ঢাকনা খুলে দিল আর সঙ্গে-সঙ্গে নীল ধোঁয়া হয়ে গেল অনেক লোকজন। মেয়েটি চিনতে পারল তাদের বাড়ির

বাইরের দাসদাসীকে। তার ভাই কালো ষাঁড়ের বেশধারী জাদুকরকে মেরে ফেলেছিল। মানুষের বেশে ভাইকে ফিরতে দেখে মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না।

সেদিনই দর্জিকে ভালোবেসে রূপসী মেয়েটি তাকে বিয়ে করল।

ঝোপ-রাজা

বহুকাল আগে প্রত্যেক শব্দেরই একটা করে মানে ছিল। কামারের হাতুড়ির বাড়ি বলত, "আমাকে পেটাও। আমাকে পেটাও।" ছুতোরের করাত ঘ্যাষ্-ঘ্যাষ্ করে বলত, "ঠিক ধরেছ।" মিলের চাকা বলত, "বাঁচাও, প্রভু, বাঁচাও।" মিলমালিক অসাবধান হলে বা মিল থেকে চলে গেলে সেগুলো বলত, "কে যায়? কে যায়?" তার পরেই উত্তর দিত, "মালিক। মালিক।"

তখনকার দিনে পাখিদের ভাষা সবাই বুঝত। এখন তো পাখির ডাককে মনে হয় শুধুই কিচির্-মিচির্ শব্দ কিম্বা ভাষাহীন গান।

তখন পাখিরা একদিন স্থির করে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে

তারা রাজা নির্বাচন করবে। এই প্রস্তাবে শুধু আপত্তি জানাল তিতির। আজীবন সে স্বাধীনভাবে বেঁচেছিল। তাই বলল স্বাধীন থেকেই সে মরবে। মনের দুঃখে এদিক-ওদিক উড়তে উড়তে সে চেঁচাতে লাগল, "হা কপাল! হা কপাল!" তার পর সে চলে গেল বহুদূরের এক জলা জায়গায়। অন্য পাখিদের মধ্যে তাকে আর দেখা গেল না।

রাজা নির্বাচনের প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য মে মাসের ঝক্‌ঝকে এক সকালে বন আর মাঠের সর্বত্র থেকে সভায় জমায়েত হল পাখির দল—ঈগল আর ফিঙে, পেঁচা আর কাক, ভরত-পাখি আর চড়ুই, আরো কত যে পাখি কি করে সবাইকার নাম করি? কোকিল আর বুনো হাঁসের দলও এল আর সেইসঙ্গে এল ছোট্টো একটা পাখি। তখনো তার নামকরণ হয় নি। সভার কথা কোনো কারণে মুরগি শোনে নি। তাই ভীড় দেখে সে খুব অবাক হয়ে উঠল।

উত্তেজিত হয়ে সে চেঁচাতে লাগল, "এ-সবের মানে কী? মানে কী? মানে কী?"

মোরগ তাকে শান্ত করে বলল, "পরে বুঝিয়ে বলব।"

সভায় স্থির হল—যে পাখি সব চেয়ে উঁচুতে উঠতে পারবে সে-ই হবে রাজা।

ঝোপের মধ্যে সবুজ একটা ব্যাঙ বসেছিল। সাবধান করে দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, না।" বরং সে ভেবেছিল এতে হাঙ্গামা বাধবে, অনেক চোখের জল ঝরবে।

কাক কিন্তু বলল, "কা-কা—সব-কিছুরই শান্তিপুর্ণভাবে নিষ্পত্তি হবে।"

পাখিরা সবাই স্থির করল সেই ঝক্‌ঝকে সকালেই সবাইকে ওড়বার পরীক্ষা দিতে হবে যাতে কেউ না পরে বলতে পারে, "সকালে অনেক উঁচুতে উড়তে পারতাম, কিন্তু সন্ধেয় হয়ে পড়েছিলাম বেজায় ক্লান্ত।"

নির্দিষ্ট সংকেত পাবার সঙ্গে-সঙ্গে পাখির ঝাঁক উড়ল আকাশে। মাঠ থেকে উঠল ধুলোর মেঘ। ঝট্‌পট্‌ শব্দে কানে তালা ধরার জোগাড়। পাখির ঝাঁক দেখে মনে হতে লাগল যেন প্রকাণ্ড কালো একটা মেঘ আকাশে উড়ে চলেছে। খানিক পরে ছোটো-ছোটো পাখিরা হাল ছেড়ে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে মাটিতে পড়ে গেল। বড়ো-বড়ো পাখিরা অবশ্য সাহসে ভর দিয়ে উড়তে লাগল। কিন্তু কেউই ঈগলের সঙ্গে

পাল্লা দিতে পারল না। ঈগল এমন উঁচুতে উঠল যে মনে হয় ইচ্ছে করলে সূর্যের চোখও সে গেলে দিতে পারে। সে যখন দেখে অন্য পাখিরা তার অনেক মাইল নীচে তখন ভাবল, 'আরো উঁচুতে উড়ে লাভ কী? আমি যে রাজা হব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' এই-না ভেবে ধীরে ধীরে সে নামতে শুরু করল।

নীচেকার সব পাখি জয়ধ্বনি করে উঠল, "তুমিই আমাদের রাজা হলে। তুমি যত উঁচুতে উঠেছিলে আমাদের কেউ তার অর্ধেকও উঠতে পারব না।"

কিন্তু যে-ছোট্টো পাখিটার নাম নেই সে লুকিয়েছিল ঈগলের বুকের মধ্যে। সে তখন চেঁচিয়ে উঠল, "একমাত্র আমি ছাড়া।" মোটেই সে ক্লান্ত হয় নি। তাই ক্রমশ এমন উঁচুতে সে উঠতে লাগল যে, স্বর্গের দেবদূতদের সে ছুঁতে পারত। তার পর ডানা গুটিয়ে মাটিতে নেমে এসে তীক্ষ্ণ সরু গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, "আমিই রাজা। আমিই রাজা।"

অন্য পাখিরা বেজায় রেগে বলে উঠল, "তুমি আমাদের রাজা না হাতি! ঠকিয়ে, ফাঁকি দিয়ে জিতেছ।" তার পর তারা আর-একটা প্রস্তাব করল—পৃথিবীর সব চেয়ে নীচে যে উড়ে যেতে পারবে সে-ই হবে রাজা। প্রস্তাব শুনে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগল হাঁস। মুরগি মাটিতে চট্‌পট্‌ একটা গর্ত করে ফেলল। পাতিহাঁস নড়্‌বড়্‌ করতে-করতে ছুটে গেল কাছের পুকুরে। ক্ষুদে নামহীন পাখিটা কিন্তু একটা ইঁদুরের গর্তে সেঁধিয়ে সরু তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাতে লাগল, "আমিই রাজা! আমিই রাজা!"

অন্য পাখিরা ঘেন্নায় মুখ বেঁকিয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, "তুমি আমাদের রাজা না হাতি! ঠকিয়ে জিতেছ।" তাই তারা স্থির করল সেই ইঁদুর-গর্তে তাকে বন্দী করে উপোস করিয়ে মারবে। গর্তটার সামনে প্রহরী মোতায়েন করা হল প্যাঁচাকে। তাকে বলা হল হতভাগা পুঁচকে পাখিটা পালালে তার গর্দান যাবে। সন্ধেয় পাখির দল সারা দিনের খাটা-খাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে গেল ঘুমোতে। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে ইঁদুর-গর্তটা একা পাহারা দিতে লাগল প্যাঁচা। কিন্তু সেও ক্লান্ত হয়ে ভাবল, এক চোখ বুজে আর এক চোখ খুলে থাকলে ক্ষতি নেই। হতভাগা পুঁচকে পাখিটা পালাতে পারবে না। এই-না ভেবে এক চোখ

বুজে অন্য চোখ খুলে সে পাহারা দিতে লাগল। আর ছোট্টো পাখিটা পালাবার জন্য মাঝে মাঝে গর্ত থেকে মাথা বার করে তাকাতে লাগল। কিন্তু তাকে বন্দী করার জন্য প্যাঁচা ছিল সব সময় সজাগ। শেষটায় যে চোখ মেলে পাহারা দিচ্ছিল সেটা বুজে অন্য চোখটা প্যাঁচা খুলল। ভেবেছিল এইভাবে সারা রাত কাটিয়ে দেবে। কিন্তু একবার ক্লান্ত চোখটা বুজে অন্যটা খুলতে সে ভুলে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে পড়ল ঘুমিয়ে। ছোট্টো পাখিটা সেই সুযোগে চুপিসাড়ে সরে পড়ল।

তখন থেকে দিনেরবেলায় প্যাঁচাকে আর বেরুতে দেওয়া হয় না। অন্য পাখিরা তার পিঠের ছাল-চামড়া তুলে নেবে। অন্য পাখিরা যখন ঘুমোয় তখনই শুধু সে ওড়ে। ওরকম বিশ্রী গর্ত বানায় বলে ইঁদুরের উপর তার ভারি রাগ। তাই ইঁদুর দেখলেই মারে। তার পর থেকে সেই নামহীন ছোট্টো পাখিটাও বেরুতে বিশেষ ভরসা পায় না। তার ভয়—অন্য পাখিরা ধরে তাকে চাবকাবে। তাই ঝোপের মধ্যে সে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। আর নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করলে মাঝে মাঝে এখনো সে চেঁচায়, "আমিই রাজা!" তাই অন্য পাখিরা ঠাট্টা করে তার নাম দিয়েছে, "ঝোপ-রাজা।" তার আর-এক নাম "রেন্" (wren—এক ধরনের ছোট্টো গায়ক-পাখি)। তার ঠোঁট বাঁকা, ডানাগুলো খুব ছোট্টো আর গোলচে, লেজ খাটো, পা দুটো লম্বা আর সরু-সরু। এই ঝোপ-রাজার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হয় নি বলে সব চেয়ে খুশি হয়েছে ভরতপাখি, যে উড়তে পারে অনেক উঁচুতে।

মাস্টার ফ্রিয়েম

মাস্টার ফ্রিয়েম মানুষটি রোগা, ছোট্টাখাট্টো আর ছটফটে। কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। মুখে তার বসন্তের দাগ, নাকটা লম্বা আর চোখা, চুলগুলো পাকা আর খোঁচা-খোঁচা, চোখদুটো ক্ষুদে-ক্ষুদে আর সব সময়েই চঞ্চল। কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না,

সবাইকারই সে খুঁত ধরে। তার ধারণা, সবাইকার চেয়ে জ্ঞান তার বেশি আর কখনো তার ভুল হয় না। পথে বেরুলে জোরে-জোরে সে হাত দোলায়। একবার একটি মেয়ে জল নিয়ে যাচ্ছিল। ভুল করে তার হাত মেয়েটির গায়ে ধাক্কা লাগলে জলের বালতিটা পড়ে যায়। ফলে জল ছিটিয়ে পড়ে মেয়েটির সর্বাঙ্গে আর তার নিজের গায়েও। নিজের গা ঝাঁকিয়ে জল ঝাড়তে-ঝাড়তে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "হাঁদা কোথাকার! তোমার পেছন-পেছন আসছিলাম, দেখতে পাও নি?" সে ছিল মুচি। কাজের সময় সে তার ছুঁচ আর সুতো এমন জোরে-জোরে টানত যে, কাছাকাছি কেউ থাকলে তার মুখে মাস্টার ফ্রিয়েমের ঘুঁষি গিয়ে পড়ত। কোনো শিক্ষানবিস তার কাছে এক মাসের বেশি টিঁকতে পারত না। কারণ, যত নিখুঁত কাজই হোক-না কেন সব সময়ে সে খুঁত ধরত। বলত—হয় সেলাইয়ের ফোঁড়গুলো সমান হয় নি, জুতোর একটা পাটি অন্যটার চেয়ে লম্বা, নয়তো একটার গোড়ালি অন্যটার চেয়ে উঁচু। শিক্ষানবিসদের সে বলত, "এক মিনিট সবুর কর, পিটিয়ে চামড়া কী করে লম্বা করতে হয় তোমায় দেখাচ্ছি।" এই-না বলে শিক্ষানবিসদের পিঠে বার কয়েক সে চাবুক কষাত। তাদের প্রত্যেককেই সে বলত কুঁড়ে আর সম্পূর্ণ অকেজো। এক মিনিটও স্থির হয়ে থাকতে পারত না বলে নিজে বিশেষ কোনো কাজ সে করতে পারত না। তার বউ ভোরে উঠে রান্না ঘরের উনুনে আঁচ দিলে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে খালি পায়ে দৌড়ে সেখানে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে সে বলত, "বাড়িতে আগুন লাগাবে নাকি? যে-আগুন জ্বালিয়েছ তাতে গোটা একটা ষাঁড় ঝলসানো যায়। তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখে মনে হচ্ছে কাঠ কিনতে পয়সা লাগে না।" কাপড়কাচার দিন চাকরানীরা টবের চার পাশে হেসে-হেসে গল্প-গুজব করলে তাদের ধমকে সে বলত, "একদল বোকা হাঁস প্যাঁক্‌প্যাক্‌ করছে, কাজের কথা ভুলে করছে গাল-গল্প। অত সাবান খরচা করছ কেন? এত সাবান নষ্ট করা পাপ। আলসেমির জন্যে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। হাত গুটিয়ে সবাই দেখছি কাজ করছে। ভালো করে রগড়াবার নাম নেই!" এই-না বলে ভীষণ বিরক্ত হয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে তার পায়ের ধাক্কায় বালতি উলটে যেত। ফলে জলে ভেসে যেত মেঝে।

একদিন তার বাড়ির উলটো দিকে নতুন একটা বাড়ি তৈরি হবার

সময় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে-দেখতে গজ্ গজ্ করে সে বলল, "আবার দেখছি ওরা লাল বেলে-পাথর ব্যবহার করছে। ওটা কখনো ভালো করে শুকোয় না। বাড়িটায় যে থাকবে সে-ই অসুখে পড়বে। আর ছোঁড়াগুলো কী বিশ্রীভাবেই-না পাথর বসাচ্ছে! মাল-মসলাও একেবারে বাজে। চুনের সঙ্গে বালি না মিশিয়ে পাথরকুচি মেশানো উচিত ছিল। বাড়িটা একদিন-না-একদিন বাসিন্দাদের মাথায় নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে।"

তার পর নিজের কাজে বসে কয়েক ফোঁড় দিয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে চামড়ার এপ্রনটা খুলে ফেলে সে চেঁচিয়ে উঠল, "এক্ষুনি ওখানে গিয়ে মজুরদের বাৎলে দিচ্ছি, ভালো করে কাজ করা কাকে বলে।"

ছুতোরদের কাছে পৌঁছে সে চেঁচিয়ে উঠল, "এ-সবের মানে কী? লাইন বরাবর করাত দিয়ে তোমরা কাটছ না। পাটাগুলো মোটেই সোজা হবে না।"

এক ছুতোরের হাত থেকে কুড়ুলটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সে দেখাতে যাবে ঠিকমতো কী করে সেটা চালাতে হয়, এমন সময় এক গাড়ি মাটি নিয়ে এক চাষীকে যেতে দেখে কুড়ুলটা ছুঁড়ে ফেলে চাষীর কাছে ছুটে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার কি মাথা খারাপ? এমন ভারী বোঝা ভরা গাড়িতে অমন বাচ্ছা ঘোড়াদের কখনো জুততে হয়? এক্ষুনি যে ওরা তোমার পায়ের সামনে মরে পড়বে!"

গাড়োয়ান কোনো জবাব না দিতে ভীষণ চটে ফ্রিয়েম ছুটে ফিরে গেল তার কাজের ঘরে।

কাজের জায়গায় যখন বসতে যাবে, এক শিক্ষানবিস তার হাতে একপাটি জুতো তুলে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করে তাকে সে বলল, "ওটা আবার কী? হাজারবার বলি নি, অমন সরু করে কাটতে নেই? ওরকম জুতো কে কিনবে? আমি চাই আমার নির্দেশ যেন অক্ষরে-অক্ষরে মানা হয়।"

শিক্ষানবিস জবাব দিল, "কর্তা, জুতোর গড়ন নিয়ে আপনার আপত্তি হয়তো সত্যি। কিন্তু এ-জুতোটা নিজেই আপনি কেটেছিলেন। এটা নিয়ে কাজ করতে-করতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আপনি বাইরে যান। আমি শুধু জুতোটা আপনার হাতে কুড়িয়ে দিয়েছি।"

এক রাতে মাস্টার ফ্রিয়েম স্বপ্ন দেখলে, মরে গিয়ে সে স্বর্গে চলেছে।

স্বর্গে পৌঁছে সেখানকার সিংহদ্বারে জোরে-জোরে ধাক্কা দিয়ে সে বলে উঠল, "ফটকটায় কোনো ঘণ্টা নেই দেখে অবাক হচ্ছি। এভাবে ধাক্কা দিতে হলে যে আঙুলের গাঁটের ছাল-চামড়া খসে পড়বে!"

ভিতরে আসার জন্য কে অমন অধৈর্যের মতো ধাক্কা দিচ্ছে দেখার জন্য সিংহদ্বার খুলে সেন্ট পিটার বলে উঠলেন, "আরে, মাস্টার ফ্রিয়েম তুমি? তোমাকে আসতে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, সব-কিছুর খুঁত ধরার অভ্যেসটা তোমায় ছাড়তে হবে। স্বর্গে ওটা চলবে না।"

ফ্রিয়েম উত্তর দিল, "কষ্ট করে আমাকে সাবধান না করলেও পারতেন। কী করা উচিত-অনুচিত সে কথা ভালো করেই আমার জানা আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখানকার সব-কিছুই নিখুঁত। পৃথিবীর মতো খুঁত ধরার কোনো জিনিসই এখানে নেই।"

স্বর্গের বড়ো-বড়ো হলঘরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের অভ্যেসমতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে আপন মনে সে বিড়্‌বিড়্‌ করে উঠল।

তার পর সে দেখে দুজন দেবদূত একটা কড়িকাঠ খাড়াখাড়ি ভাবে কাঁধে নিয়ে চলেছে।

মাস্টার ফ্রিয়েম ভাবল, 'এরকমভাবে কড়িকাঠ বইতে হয় নাকি? হাস্যকর ব্যাপার! যাক গে যাক, দেখছি কোনো-কিছুতে ওটা ধাক্কা খাবে না। সেটাই বাঁচোয়া।'

খানিক পরে সে দেখে এক ঝরনায় দুজন দেবদূত বালতিতে জল ভরছে। বালতিতে ফুটো থাকায় চার দিকে ছিটিয়ে পড়ছে জল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "কী কাণ্ড!" কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবল, 'নিশ্চয়ই ওরা ঠাট্টাচ্ছলে এটা করছে। স্বর্গে এভাবে খেলাধুলো করলে ক্ষতি নেই—কারণ, এখানে তো দেখছি লোকদের কাজ-টাজ নেই।'

খানিক যেতে-যেতে সে দেখে পথের গর্তে একটা গাড়ির চাকা আটকে গেছে। গাড়ির পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল ফ্রিয়েম তাকে বলল, 'গাড়িতে বেজায় মাল ঠেসেছ। তাই ফ্যাসাদে যে পড়বে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গাড়িতে কী আছে?"

লোকটি উত্তর দিল, "নানা সাধু-সংকল্প। সিধে পথে এগুলো আনতে পারি নি। কিন্তু এখানে চিরকাল আটকে থাকতে দেবদূতরা

আমায় দেবে না।" তার কথা শেষ হতে-না-হতেই বাস্তবিকই এক দেবদূত এসে গাড়িতে দুটো ঘোড়া জুতে দিল।

ফ্রিয়েম বলল, "খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু এটা দুটো ঘোড়ার কর্ম নয়। চারটে ঘোড়া দরকার।"

আরো দুটো ঘোড়া নিয়ে আরো একজন দেবদূত হাজির হল। কিন্তু ঘোড়াদুটোকে গাড়ির সামনে না জুতে, জুতলো পিছনে।

মাস্টার ফ্রিয়েমের আর সহ্য হল না। সে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, করছটা কী? জীবনে কখনো কাউকে দেখি নি পেছন থেকে গাড়ি ওপর দিকে টানতে। কিন্তু তোমাদের বেজায় হামবড়া ভাব! তাই ভাবছ আমার চেয়ে তোমাদের অনেক বেশি বুদ্ধি—তাই-না?"

সে আরো অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু স্বর্গের এক বাসিন্দা তার জামার কলার ধরে সজোরে তাকে ছুঁড়ে ফেলল সিংহদ্বারের বাইরে।

আর একবার গাড়িটা দেখার জন্যে ঘাড় ফিরে তাকাতে মাস্টার ফ্রিয়েম দেখল চারটে পক্ষীরাজ ঘোড়া সেটাকে টেনে তুলছে একটা পাহাড়ে।

সেই মুহূর্তে মাস্টার ফ্রিয়েমের ঘুম ভেঙে গেল। সে ভাবতে লাগল, 'স্বর্গের অবস্থাও মোটামুটি এখানকারই মতো। সেখানকার অনেক কিছু অবশ্য ক্ষমা করা যায়। কিন্তু তাই বলে একটা গাড়ির সামনে আর পেছনে ঘোড়া জোতা! ঘোড়াগুলোর ডানা ছিল, সত্যি। কিন্তু কে সে কথা জানত? তা ছাড়া ঘোড়ার যখন চার-চারটে পা, তার ওপর তাকে আরো এক জোড়া ডানা দেবার কোনো মানে হয়? কিন্তু এক্ষুনি আমায় উঠতে হয়। নইলে সবাই মিলে বাড়িটাকে নয়-ছয় করে দেবে। সুখের কথা—বাস্তবিকই আমি মরি নি।'

স্যাল্যাড়-গাধা

এক সময় তরুণ এক শিকারী বনে গিয়েছিল শিকার করতে। সে ছিল খুব হাসিখুশি আর ফুর্তিবাজ। হাঁটতে-হাঁটতে একটা পাতার উপর সে শিস্ দিয়ে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে কদাকার এক বুড়ি হাজির হয়ে বলল, "শুভদিন, শিকারী! দেখে মনে হচ্ছে তোমার মনে খুব ফুর্তি, কোনোরকম দুর্ভাবনা নেই। আমার খুব ক্ষিদে-তেষ্টা পেয়েছে। আমায় কিছু ভিক্ষে দাও।"

বুড়ির কথা শুনে শিকারীর করুণা হল। পকেট থেকে কিছু টাকাকড়ি বার করে বুড়িকে সে দিল। তার পর যেই-না সে এগুতে যাবে বুড়ি তার জামা চেপে ধরে বলল, "শিকারী, শোনো। তুমি ভারি দয়ালু। তাই তোমায় একটা উপহার দেব। যেদিকে যাচ্ছ, যাও। খানিক বাদে একটা গাছের কাছে পৌঁছবে। তাতে সাতটা পাখি বসে। পায়ের নখ দিয়ে তারা একটা ওড়না ধরে আছে। তোমার বন্দুক তুলে তাদের মাঝখানে গুলি ছুঁড়ো। ওড়নাটা তারা ফেলে দেবে। সেই-সঙ্গে গুলি খেয়ে মরে একটা পাখি পড়বে মাটিতে। ওড়নাটা সঙ্গে নিয়ো। কারণ সেটায় আছে জাদুর গুণ। সেটা কাঁধে ফেলে যেখানে যেতে চাইবে সঙ্গে-সঙ্গে পৌঁছে যাবে সেখানে। আর মরা পাখির বুক থেকে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে সবটা গিলে ফেলো। তা হলে রোজ সকালে জেগে উঠে দেখবে তোমার বালিশের নীচে রয়েছে একটা করে মোহর।"

বুড়িকে ধন্যবাদ জানাল শিকারী। কিন্তু মনে-মনে ভাবল, 'ভালো-

ভালো জিনিস দেবার কথা তো বলল। সেটা সত্যি কিনা কে জানে।' কিন্তু একশো পা হাঁটার পরেই সে শুনতে পেল ডালপালার মধ্যে খুব জোর কিচির্-মিচির্ শব্দ। উপর দিকে তাকিয়ে সে দেখে কতকগুলো পাখি একটা কাপড় এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে যেতে-যেতে নখ আর ঠোঁট দিয়ে সেটা ছিঁড়ছে। কে সেটা নেবে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা করছে ঝগড়া-মারামারি। শিকারী চেঁচিয়ে উঠল, "বাস্তবিকই, আশ্চর্য তো! বুড়ির কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে ফলে যাচ্ছে দেখছি।" এই-না বলে বন্দুক তুলে তাদের দিকে সে গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে পাখির পালকে ভরে গেল আকাশ। পাখির ঝাঁক উড়ে পালাল। কিন্তু একটা পাখি মরে পড়ল তার পায়ের কাছে আর সেইসঙ্গে ওড়নাটাও। বুড়ির কথামতো পাখিটার বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বার করে সে গিলে ফেলল। তার পর ওড়নাটা কাঁধে ফেলে ফিরল বাড়িতে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে বুড়ির কথাগুলো শিকারীর মনে পড়ল। বালিশ তুলে সে দেখে বাস্তবিকই ঝক্‌ঝক্ করছে সোনার একটা মোহর। পরদিন দেখে আর-একটা। তার পরদিন আর-একটা। এইভাবে তার জমে উঠল অনেক মোহর। শেষটায় সে ভাবল, 'আমি যদি বাড়িতেই বসে থাকি তা হলে এত মোহর নিয়ে লাভ কী? এগুলো খরচ করে পৃথিবীটা দেখে আসা যাক।'

এই-না ভেবে বাবা-মা'র কাছে বিদায় নিয়ে কাঁধে শিকারীর ঝুলি আর বন্দুক ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। যেতে-যেতে একদিন সে পৌঁছল গহন এক বনে। বনের অন্য প্রান্তে উপত্যকার মধ্যে ছিল চমৎকার একটা কেল্লা। কেল্লার এক জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল এক বুড়ি আর রূপসী একটি মেয়ে।

বুড়িটা ছিল ডাইনি। মেয়েটিকে সে বলল, "বাছা, ঐ দ্যাখ একটা লোক আসছে। ওর পেটের মধ্যে আছে আশ্চর্য একটা দামী জিনিস। লোকটার কাছ থেকে আমরা সেটা বাগিয়ে নেব। ওর চেয়ে আমাদের সেটা বেশি কাজে লাগবে। জিনিসটা একটা পাখির হৃৎপিণ্ড। প্রতি সকালেই, সেটার জন্যে, লোকটা তার বালিশের নীচে পায় একটা করে সোনার মোহর।"

শিকারীর কাছ থেকে কী করে সেটা চুরি করবে আর তার জন্য মেয়েটিকে কী কী করতে হবে, সে কথা মেয়েটিকে সে বলল। তার

পর কটমট করে তাকিয়ে জানিয়ে দিল—তার কথামত কাজ না করলে মেয়েটির ভীষণ বিপদ হবে।

কেল্লার কাছে পৌঁছে জানলায় মেয়েটিকে দেখে শিকারী মনে-মনে বলল, 'অনেক পথ হেঁটেছি। বিশ্রামের জন্যে এই সুন্দর কেল্লায় আশ্রয় চাওয়া যাক। খুব ভালো সাজানো-গোজানো ঘরের ভাড়া দেবার মতো প্রচুর টাকাকড়ি তো আমার কাছেই আছে।' আসলে কিন্তু মেয়েটির রূপ দেখেই সেখানে যেতে তার ইচ্ছে হয়েছিল।'

বাড়িটার মধ্যে যেতে তাকে জানানো হল সাদর অভ্যর্থনা। দেওয়া হল ভালো-ভালো খাবার-দাবার।

তার পর বুড়ি বলল, "এইবার পাখির সেই হৃৎপিণ্ড বাগিয়ে নিতে হবে। শিকারী টেরও পাবে না।"

এই-না বলে বুড়ি খানিকটা সরবত ফুটিয়ে একটা গেলাসে ঢেলে মেয়েটিকে বলল সেটা শিকারীকে খাইয়ে দিতে।

শিকারীর কাছে গিয়ে মেয়েটি বলল, "বন্ধু, আমার স্বাস্থ্য কামনা করে এটা খেয়ে নাও।"

গেলাস নিয়ে গরম সরবতটা চক্‌চক্‌ করে খেয়ে নিল শিকারী। আর সেটার তলানিতে পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীর থেকে বেরিয়ে গেল পাখির হৃৎপিণ্ডটা। মেয়েটি সেটা চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে গিলে ফেলল। তার পর থেকে শিকারী তার বালিশের তলায় আর মোহর পায় না। মোহর থাকে মেয়েটির বালিশের নীচে। বুড়ি ডাইনি এইভাবে জমালো রাশিরাশি মোহর। মেয়েটিকে শিকারী খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই অন্য কোনো দিকে তার নজর ছিল না। তার সঙ্গেই কাটত শিকারীর সব সময়।

তার পর বুড়ি বলল, "পাখির হৃৎপিণ্ডটা পাওয়া গেছে। এবার বাগাতে হবে জাদুর ওড়নাটা।"

মেয়েটি বলল, "না। শিকারী তার সব চেয়ে দামী জিনিসটা হারিয়েছে। তাই ওড়নাটা তার কাছেই থাকুক।"

মেয়েটির কথা শুনে ভীষণ রেগে বুড়ি বলল, "ওড়নাটাও খুব দামী জিনিস। সেটা আমার চাই-ই চাই।" এই-না বলে মেয়েটিকে বেদম মেরে বুড়ি বলল—তার কথা না শুনলে তাকে ভীষণ অনুশোচনা করতে হবে।

বুড়ির কথামতো কাজ করতে মেয়েটি তাই বাধ্য হল। জানলায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে সে বাইরে তাকিয়ে রইল যেন তার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে।

শিকারী প্রশ্ন করল, "অমন মনমরা হয়ে ওখানে কেন দাঁড়িয়ে ?"

মেয়েটি বলল, "অনেক দূরে আছে গ্র্যানিট্ পাথরের পাহাড়। সেখানে পাওয়া যায় সব চেয়ে দামী-দামী হীরে-পান্না-চুনি। সেই-সব জহরতের আমার খুব সখ। কিন্তু সেগুলো পাওয়া সম্ভব নয় বলে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। উড়তে পারে বলে পাখিরাই শুধু সেখানে যেতে পারে। মানুষ কখনো পারে না।"

শিকারী বলল, "এইজন্যে মন খারাপ ? এসো, তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি।" এই-না বলে মেয়েটিকে তার ওড়নার মধ্যে টেনে এনে মনে-মনে সে কামনা করল গ্র্যানিট্-পাহাড় যাবার। আর পর মুহূর্তে তারা দুজনে পৌঁছে গেল সেখানে। তাদের চার পাশে ঝল্‌মল্ করতে লাগল সব চেয়ে দামী-দামী অসংখ্য জহরত। বেছে-বেছে মেয়েটি অনেক জহরত সংগ্রহ করল। আর তার পর ডাইনি তার জাদুর হাত বাড়িয়ে শিকারীর চোখে নামিয়ে আনল ঘুম। তাই মেয়েটিকে শিকারী বলল, "খানিক বিশ্রাম নেওয়া যাক। ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘুমে ঢলে পড়ব।"

এই-না বলে মেয়েটির কোলে মাথা রেখে শিকারী ঘুমিয়ে পড়ল। শিকারী যখন অঘোরে ঘুমচ্ছে তার কাঁধ থেকে ওড়নাটা খুলে নিজের কাঁধে ফেলে হীরে-চুনি-পান্নাগুলো নিয়ে মেয়েটি কামনা করল বাড়ি ফেরার।

ঘুম ভাঙার পর শিকারী বুঝতে পারল যে-মেয়েকে সে সব চেয়ে ভালোবাসত সে-ই তাকে ঠকিয়েছে সব চেয়ে বেশি। দেখল, সে রয়েছে একলা অচেনা এক পাহাড়ে। আপন মনে সে বলে উঠল, 'হায়! পৃথিবীতে দেখছি প্রতারণা, প্রবঞ্চনার শেষ নেই।' ভীষণ মন খারাপ করে সেখানে সে বসে রইল। ভেবে পেল না—কী করবে।

সেই পাহাড়টা ছিল ভীষণাকার দৈত্যদের। সেখানেই তারা থাকত। খানিক পরে শিকারী তাদের দেখল বড়ো-বড়ো পা ফেলে এগিয়ে আসতে। গভীর ঘুমের ভান করে আবার সে শুয়ে পড়ল।

তার গায়ে হোঁচট খেয়ে প্রথম দৈত্য চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! একটা কুঞ্চিত কেঁচো দেখছি বেরিয়ে এসেছে।"

দ্বিতীয় দৈত্য বলল, "পা দিয়ে পিষে দে।"

কিন্তু তৃতীয় দৈত্য ঘেন্নায় মুখ বেঁকিয়ে বলল, "অত ঝামেলায় দরকার কী? যেখানে পড়ে আছে সেখানেই থাকতে দে। পাহাড়ের চুড়োয় উঠলে মেঘ ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

এই-না বলে সেখান থেকে তারা চলে গেল। দৈত্যদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনেছিল শিকারী। তাই তারা চোখের আড়াল হতে সে উঠল গিয়ে পাহাড়ের চুড়োয়। সেখানে কয়েক মিনিট বসার পর একটা মেঘ ভেসে এল তার কাছে। সেটাকে ধরতে আকাশে খানিক সে ভেসে চলল। তার পর মেঘ তাকে ফেলে দিল ওষধি লতাপাতার এক বাগানে। বাগানটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ধীরে-ধীরে সে নামল বাঁধাকপি আর ফুলকপির মধ্যে।

চার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠল শিকারী, 'হালে বিশেষ কিছুই পেটে পড়ে নি। ভারি খিদে পেয়েছে। কিন্তু এখানে আপেল, নাশপাতি বা অন্য কোনো ফল তো দেখছি না। থাকার মধ্যে রয়েছে শুধু তরি-তরকারি আর লতাপাতা।' কিন্তু খিদের জ্বালায় শেষটায় একটা রসাল লেটুস্-পাতা সে খেল আর খাবার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল তার সর্বাঙ্গ। তার পর সে বুঝল সমস্ত শরীর তার বদলে যাচ্ছে। দেখতে-দেখতে তার গজিয়ে উঠল চারটে পা, মাথাটা হয়ে গেল প্রকাণ্ড আর কানদুটো বেজায় লম্বা। আঁতকে উঠে দেখল সে একটা গাধা হয়ে গেছে। কিন্তু খিদে তার মিটল না। চেহারাটা বদলাতে সে দেখল লতাপাতা তার খুবই সুস্বাদু লাগছে। তাই সেগুলো সে খেতে লাগল গোগ্রাসে। তার পর চরতে-চরতে সে পৌঁছল আর-একটা তরি-তরকারির ক্ষেতে। সেখানে আর-একটা পাতা খেয়ে সে দেখল আবার তার চেহারা হয়ে উঠেছে মানুষের মতো। তার পর ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে দুরকম পাতার নমুনা সংগ্রহ করে মনে মনে সে বলল, 'এগুলোর সাহায্যে আমার সম্পত্তি উদ্ধার করব আর শাস্তি দেব বিশ্বাসঘাতককে।' এই-না বলে পাতাগুলো পকেটে ভরে পাঁচিল টপ্‌কে সে বেরিয়ে পড়ল কেল্লাটার খোঁজে, যেখানে সেই মেয়েটি থাকে। দুদিন ধরে হাঁটার পর কেল্লাটাকে সে খুঁজে পেল। চট্‌পট্ তখন সে রঙ মেখে নিজের মুখটা এমন বাদামী করে ফেলল যে, দেখলে তার

মা-ও তাকে চিনতে পারতেন না। তার পর কেল্লায় গিয়ে সে বলল, "আমি ভারি ক্লান্ত। আর এক পা-ও হাঁটতে পারছি না।"

ডাইনি প্রশ্ন করল, "ভালোমানুষের পো! কিসের তোমার ব্যবসা? কে তুমি?"

শিকারী বলল, "রাজার আমি গুপ্তচর। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দামী স্যাল্যাড্-এর খোঁজে রাজা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সেটা খুঁজে পেয়েছি, আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু রোদটা ভারি কড়া। ভয় হচ্ছে কোমল পাতাগুলো শুকিয়ে যাবে। বেশি দূর নিয়ে যেতে পারব না।"

খুব ভালো স্যাল্যাড্-এর নামেই বুড়ি ডাইনির নোলা সক্‌সক্ করে উঠল। সে বলল, "ভালোমানুষের পো! আশ্চর্য স্যাল্যাড্টা আমায় একটু চেখে দেখতে দাও।"

শিকারী বলল, "নিশ্চয়ই! এতে আর কথা কী? দু গোছা আমি এনেছি। অনায়াসেই একটা গোছা তোমায় দিতে পারি।" এই-না বলে বিপজ্জনক গোছাটা বুড়ি ডাইনির হাতে সে দিল।

কোনোরকম সন্দেহ না করে নিজে হাতে স্যাল্যাড্ বানাবার জন্যে সে গেল রান্নাঘরে। স্যাল্যাড্ তৈরি হতে খাবার টেবিলে নিয়ে যাবার তর সইল না ডাইনির—দুয়েকটা পাতা সে ফেলল মুখে। আর যেই-না সেগুলো মুখে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের চেহারা তার বদলে গেল। মেয়ে-গাধা হয়ে সে ছুটে চলল উঠোনের মধ্যে দিয়ে।

তার পর দাসী গেল রান্নাঘরে। স্যালাড্ তৈরি দেখে সেটা সে নিয়ে চলল উপরতলায়। কিন্তু চিরকেলে বদ-অভ্যেসটা যাবে কোথায়। যেতে-যেতে সে চাখলো স্যাল্যাড্টা। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেও মেয়ে-গাধা হয়ে উঠোনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল ডাইনির পিছন-পিছন।

স্যাল্যাড্-এর জন্য রূপসী মেয়েটির সঙ্গে বসে তখন অপেক্ষা করছিল শিকারী। সেটা কেউ না আনায় মেয়েটি বলল, "স্যাল্যাড্টার কী হল কে জানে।"

শিকারী ভাবল, 'পাতাগুলোর কাজ এতক্ষণে নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে।' তাই মেয়েটিকে বলল, "রান্নাঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসছি।"

নীচে নেমে সে দেখে উঠোনের মধ্যে দুটো মেয়ে-গাধা হুটোপুটি করছে আর স্যাল্যাড্টা পড়ে রয়েছে মেঝেয়।

শিকারী বলে উঠল, "ঠিক হয়েছে। এবার তৃতীয়জনের পালা।"

এই-না বলে বাদবাকি পাতাগুলো ডিশে তুলে মেয়েটির কাছে এনে সে বলল, "যাতে তোমায় অপেক্ষা করতে না হয় তাই নিজেই তোমার জন্যে আনলাম আশ্চর্য স্যাল্যাড্‌টা।"

খানিকটা স্যাল্যাড্‌ খেতেই অন্যদের মতো মেয়ে-গাধা হয়ে মেয়েটিও ছুটে গেল উঠোনে।

শিকারী তার মুখ ধুলে যাতে মেয়ে-গাধারা তাকে চিনতে পারে। তার পর উঠোনে গিয়ে সে বলল, "প্রতারণার মাশুল এবার তোমাদের দিতে হবে।" এই-না বলে একটা দড়ি দিয়ে তাদের তিনজনকে একসঙ্গে বেঁধে তাড়িয়ে তাদের নিয়ে এল একটা জাঁতাকলে। জানলার

শার্সিতে শিকারী টোকা দিতেই জাঁতাওয়ালা মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করল, "কী চাই?"

সে বলল, "আমার তিনটে ভারি একগুঁয়ে গাধা আছে। তাদের আর রাখতে পারছি না। এদের খেতে আর থাকতে দিলে তোমায় আমি মোটা টাকা দেব।"

জাঁতাওয়ালা বলল, "বেশ কথা, রাখব। কিন্তু এদের দিয়ে কী কাজ করাতে হবে?"

শিকারী বলল, সব চেয়ে বুড়ি গাধাটাকে (যেটা ডাইনি) দিনে তিনবার পেটাতে আর একবার খাবার দিতে; দ্বিতীয় গাধাটাকে (যেটা দাসী) দিনে একবার পেটাতে আর তিনবার খাবার দিতে; আর সব চেয়ে ছোটো গাধাটাকে (যে-মেয়েকে আগে সে ভালোবাসত, দিনে তিনবার

খাবার দিতে আর না পেটাতে। মেয়েটিকে পেটাবার কথা বলার মতো নিষ্ঠুর সে হতে পারল না। তার পর কেল্লায় ফিরে মনের আনন্দে সে রইল।

দিন কয়েক পরে জাঁতাওয়ালা তার কাছে এসে বলল, "যে-বুড়ি গাধাটাকে দিনে তিনবার পেটাতে আর একবার খাবার দিতে বলেছিল সেটা মরেছে। অন্য দুটো গাধা এখনো বেঁচে। দিনে তিনবার খেতেও পায়। কিন্তু তারা এমন মনমরা হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় না বেশি দিন বাঁচবে।"

তার কথা শুনে শিকারীর রাগ পড়ে গেল। জাঁতাওয়ালাকে বলল গাধা দুটোকে ফিরিয়ে আনতে। আর তারা ফিরতে তাদের অন্য পাতা খাইয়ে সে আবার মানুষ করে তুলল।

তখন রূপসী মেয়েটি তার পায়ে পড়ে বলল, "মা আমাকে জোর করে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেটা করেছিলাম বলে ক্ষমা কর। তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। তোমার ওড়নাটা একটা আলমারিতে ঝুলছে। আর পাখির হৃৎপিণ্ড— তার জন্যে আমি জোলাপ নেব।"

মেয়েটির কথা শুনে শিকারীর রাগ পড়ে গেল। তাকে বলল, "ও-দুটো জিনিসই তোমার কাছে থাক। কারণ তোমাকে আমার বউ করতে চাই।"

আর তার পর তাদের বিয়ে হল আর আজীবন তারা রইল সুখে শান্তিতে।

সাহসী রাজপুত্র

এক সময় ছিল এক রাজপুত্র। ভয়-ডর কাকে বলে সে জানত না। বাড়িতে বসে-বসে তার বিরক্ত ধরে গিয়েছিল। তাই সে ভাবল, 'এখান থেকে বেরিয়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই। তা হলে অনেক এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান পাব, নানা আশ্চর্য জিনিস দেখব। এখানে থাকার মতো একঘেয়ে আর লাগবে না।' এই-না ভেবে বাবা-মা'র কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কোথাও না থেমে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হেঁটে চলল।

সন্ধেয় সে পৌঁছল এক দৈত্যের বাড়িতে। ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল বলে দোর-গোড়ায় বসে সে বিশ্রাম করতে লাগল। সেখানকার আঙিনায় তার নজরে পড়ল দৈত্যের খেলনাগুলো—এক জোড়া প্রকাণ্ড কামানের গোলা আর মানুষের সমান একটা লক্ষ্যস্থানের কেন্দ্র। খানিক বিশ্রাম নেবার পর তার ইচ্ছে হল কামানের গোলাগুলো নিয়ে খেলতে। সেগুলো ছোঁড়বার পর লক্ষ্যস্থানের কেন্দ্রে গিয়ে লাগতে আহ্লাদে সে চেঁচিয়ে উঠল। রাজপুত্রের চীৎকার শুনে দৈত্য তার

জানলা দিয়ে দেখে, সাধারণ চেহারার একটা মানুষ তার খেলার জিনিসগুলো নিয়ে খেলছে।

হুঙ্কার ছেড়ে দৈত্য তখন চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে পিঁপড়ে! আমার কামান-গোলা ছোঁড়বার শক্তি কোথায় পেলি?"

দৈত্যের দিকে তাকিয়ে রাজপুত্র বলল, "ওরে মুখ্যু! তুই কি ভাবিস পৃথিবীতে শুধু তোর হাতদুটোই শক্তিশালী? যেকোনো জিনিস আমি তুলতে পারি।"

ভীষণ অবাক হয়ে উপর থেকে নেমে এসে দৈত্য বলল, "ওরে মানুষের বাচ্ছা! তোর গায়ে যদি অতই শক্তি তা হলে জীবনগাছ থেকে আমার জন্যে একটা আপেল নিয়ে আয়।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "সেটা তোর কিসের দরকার?"

দৈত্য বলল, "আমার জন্যে চাইছি না। যে মেয়েকে ভালোবাসি সেটা সে চায়। আমি বহুবার পৃথিবী-ভ্রমণ করেছি। কিন্তু গাছটা কখনো চোখে পড়ে নি।"

রাজপুত্র বলল, "গাছটা খুঁজে বার করে নিশ্চয়ই আপেলটা পাড়তে পারব।"

দৈত্য বলল, "ভাবছিস কাজটা খুব সহজ। যে-বাগানে সেই গাছটা আছে লোহার গরাদ দিয়ে সেটা ঘেরা। গরাদের বাইরে আছে হিংস্র নানা জন্তু। কাউকে তারা ভেতরে যেতে দেয় না।"

রাজপুত্র বলল, "বাজি ধরে বলতে পারি—তারা আমায় ভেতরে যেতে দেবে।"

"ভেতরে গিয়ে গাছটা খুঁজে পেলেও—তার পর আছে আরো নানা বিপদ। আপেলটার সামনে একটা লোহার বেড় ঝুলছে। সেটার মধ্যে হাত গলিয়ে আপেলটা ছুঁতে হয়। এ-পর্যন্ত সেটা কেউ পারে নি।"

রাজপুত্র তাকে ভরসা দিয়ে বলল, "কিন্তু আমি নিশ্চয়ই পারব।"

এই-না বলে দৈত্যর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নানা পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা আর বন পেরিয়ে শেষটায় রাজপুত্র পৌঁছল সেই মায়াময় বাগানে। তার চার দিকে ছিল হিংস্র জন্তুর দল। কিন্তু থাবার উপর মাথা রেখে তখন তারা ঘুমচ্ছিল। রাজপুত্র কাছে আসতেও তাদের ঘুম ভাঙল না। তাই সে গরাদ বেয়ে উঠে নিরাপদে পৌঁছল বাগানটার মধ্যে। বাগানের মাঝখানে ছিল জীবনগাছ আর তার

ডালে-ডালে ফলেছিল টুকটুকে আপেল। গাছটার গুঁড়ি বেয়ে উঠে একটা আপেল পাড়বার জন্য হাত বাড়াতেই সে দেখতে পেল আপেলটার সামনে লোহার একটা বেড় ঝুলছে। কিন্তু সেই বেড়ের মধ্যে হাত গলিয়ে অনায়াসে সে পেড়ে নিল আপেলটা। সঙ্গে-সঙ্গে তার কব্জিতে শক্ত হয়ে এঁটে গেল বেড়টা আর রাজপুত্র অনুভব করল তার শিরায়-শিরায় যেন বয়ে গেল অদ্ভুত তীব্র একটা শক্তি। আপেল নিয়ে গাছ থেকে নেমে লোহার গরাদ বেয়ে সে উঠল না। বিরাট সিংহদ্বারটা হাত দিয়ে সে ঝাঁকাল আর সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দে সেটা গেল হাট হয়ে খুলে। সিংহদ্বারের সামনেই শুয়েছিল একটা সিংহ। রাজপুত্র বেরুতেই সেটা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তাকে আক্রমণ না করে পোষা জন্তুর মতো মাথা নিচু করে সিংহটা চলল রাজপুত্রের পিছন-পিছন।

আপেলটা দৈত্যের কাছে নিয়ে এসে রাজপুত্র বলল, "এই নে। অনায়াসে এটা জোগাড় করেছি।"

এত চট্‌পট্‌ আপেলটা পেয়ে দৈত্যের আনন্দ আর ধরে না। যে মেয়েকে সে ভালোবাসত এক দৌড়ে তার কাছে গিয়ে আপেলটা তাকে সে দিল।

মেয়েটি ছিল যেমন রূপসী তেমনি বুদ্ধিমতী। দৈত্যের কব্জিতে লোহার বেড়টা না দেখে সে বলল, "তোমার কব্জিতে লোহার বেড়টা না-দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করব না—আপেলটা তুমি পেড়েছ।"

দৈত্য বলল, "বাড়ি থেকে সেটা নিয়ে আসছি।" সে ভেবেছিল দুর্বল, ছোটো মানুষটার কাছ থেকে সেটা আনা মোটেই শক্ত হবে না। তাই রাজপুত্রকে সে বলল, লোহার বেড়টা তাকে দিয়ে দিতে। কিন্তু দৈত্যকে সেটা সে দিল না।

সেটা দেবার জন্য জুলুম করে রাজপুত্রকে দৈত্য বলল, "লোহার বেড় আর আপেলটা একসঙ্গে থাকার কথা। তাই সেটা চুপচাপ দিয়ে না দিলে জোর করে কেড়ে নেব।"

তার পর দৈত্যের সঙ্গে রাজপুত্রের বহুক্ষণ মল্লযুদ্ধ হল। কিন্তু কিছুতেই রাজপুত্রকে সে কাবু করতে পারল না। কারণ লোহার বেড়টার জাদুর প্রভাবে রাজপুত্রের শরীরে এসেছিল অস্বাভাবিক শক্তি। দৈত্য তখন ভাবল চালাকি করে বেড়টা সে হাতিয়ে নেবে। তাই বলল, মল্লযুদ্ধ করে দুজনেই তারা ঘেমে উঠেছে—নদীতে স্নান করে শরীর জুড়নো যাক। তার কুমতলব সন্দেহ না করে পোশাকের সঙ্গে লোহার

বেড়টা খুলে রেখে নদীতে ঝাঁপ দিল রাজপুত্র। আর সঙ্গে-সঙ্গে লোহার বেড়টা নিয়ে ছুট দিল দৈত্য। কিন্তু সেই সিংহ সেটা চুরি করতে দেখে দৈত্যের হাত থেকে বেড়টা ছিনিয়ে এনে দিল তার প্রভুর কাছে। দৈত্য তখন একটা ওক্‌গাছের পিছনে গিয়ে লুকাল আর রাজপুত্র যখন পোশাক পরছে তখন ছুটে এসে গেলে দিল তার দুই চোখ। অন্ধ অসহায় হয়ে রাজপুত্র রইল দাঁড়িয়ে। কী করবে ভেবে পেল না। দৈত্য তখন তার হাত ধরে তাকে এক পাহাড়ের চুড়োয় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এল। মনে-মনে ভাবল, এক পা এগুলেই পড়ে মরবে। তখন লোহার বেড়টা পেয়ে যাব। বিশ্বস্ত সিংহ কিন্তু তার প্রভুকে ছেড়ে গেল না। রাজপুত্রের কোট দাঁতে চেপে ধীরে-ধীরে তাকে সে টেনে আনল পাহাড়ের কিনার থেকে। দৈত্য ভেবেছিল রাজপুত্র পাহাড় থেকে পড়ে নিশ্চয়ই মরেছে। তাই খানিক বাদে সে গেল লোহার বেড়টা হাতাতে। কিন্তু গিয়ে দেখে তার সব ছলাকলা ব্যর্থ হয়েছে। ভীষণ রেগে সে ভাবল, 'এরকম পুঁচকে একটা মানুষকে খতম করা অসম্ভব নাকি?' আবার রাজপুত্রকে ধরে নিয়ে গেল সে আর-একটা পাহাড়-চুড়োর কিনারে। কিন্তু তার মতলব বুঝতে পেরে আবার তার প্রভুকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য সিংহ হাজির হল। আর যেই-না দৈত্য রাজপুত্রর হাত ছেড়েছে অমনি এক ধাক্কায় তাকে সিংহ ফেলে দিল অতল গহ্বরের মধ্যে। সেখানে পড়ে দৈত্যের শরীর একেবারে গেল গুঁড়িয়ে। সিংহ তার পর রাজপুত্রকে নিয়ে গেল একটা গাছের কাছে। কাছেই কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছিল স্ফটিক-স্বচ্ছ ছোট্টো একটি স্রোত। রাজপুত্র সেখানে বসে পড়তে তার পাশে শুয়ে থাবা দিয়ে সেই স্রোতের জল সিংহ ছিটতে লাগল তার মুখে। রাজপুত্রের চোখের শূন্য কোটরে কয়েক ফোঁটা জল পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার খুব ঝাপ্‌সা দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সে দেখল পাশের একটা গাছের গুঁড়িতে ছোট্টো একটা পাখিকে ধাক্কা খেতে। পাখিটা তার পর লাফিয়ে-লাফিয়ে স্রোতের মধ্যে নেমে স্নান করে তার থ্যাৎলানো মুখে জল ছিটতে লাগল। রাজপুত্র বুঝল ভগবান তাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কী করতে হবে। তাই সে স্রোতের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে সেখানকার জল দিয়ে ভালো করে নিজের মুখ-চোখ ধুয়ে নিল। আর তার পর দাঁড়িয়ে উঠে দেখল এমন তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল দৃষ্টিশক্তি সে পেয়েছে জীবনে কখনো যেটা তার ছিল না।

অসীম করুণার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিংহের সঙ্গে রাজপুত্র তখন আবার শুরু করল হাঁটতে।

যেতে-যেতে সে পৌঁছল জাদুময় এক কেল্লার কাছে। সেই কেল্লার সিংহদ্বারে দাঁড়িয়েছিল এক তরুণী। ছিপ্‌ছিপে তার শরীর, নিখুঁত তার চোখ-মুখ। কিন্তু গায়ের রঙ কুচ্‌কুচে কালো।

তরুণী তাকে বলল, "জাদুর মায়া থেকে আমাকে তুমি কি মুক্তি দিতে পারবে?"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "কী আমায় করতে হবে?"

তরুণী উত্তর দিল, "জাদুময় কেল্লায় তিন রাত তোমায় কাটাতে হবে। কিন্তু তাতে ভয় পেয়ো না। সব-কিছু মুখ বুজে তুমি সহ্য করতে পারলে আমি মুক্তি পাব আর তুমিও মরবে না।"

রাজপুত্র বলল, "ভয়-ডর বলে আমার কিছু নেই। ভগবানের কৃপায় আমার কোনো বিপদ ঘটবে না।"

এই-না বলে প্রফুল্ল মনে সে গেল কেল্লার মধ্যে আর সন্ধে হতে সামনেকার প্রকাণ্ড হল-ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। মাঝ রাত পর্যন্ত সব-কিছু চুপচাপ। তার পর হঠাৎ ভীষণ হৈচৈ করে সব ফাটল-ফোকর থেকে অসংখ্য ক্ষুদে-ক্ষুদে ভূতপ্রেত নাচতে-নাচতে বেরিয়ে এসে আগুন জ্বালিয়ে সেটার চার পাশে বসে শুরু করে দিল তাস খেলতে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হল তাকে তারা দেখতেই পায় নি।

তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন বলে উঠল, "এখানে এমন কেউ রয়েছে যে আমাদের মতো নয়। তার দোষেই সব-কিছু হারছি।"

আর তার পরেই শুরু হয়ে গেল কানে-তালা-ধরানো ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ চীৎকার। যেখানে বসেছিল সেখানেই চুপচাপ বসে রইল রাজপুত্র। তাদের তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে মোটেও সে ভয় পেল না। কিন্তু ভূত-প্রেতগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। সংখ্যায় তারা ছিল অগুন্‌তি। চুলের মুঠি ধরে মেঝের উপর দিয়ে তাকে তারা নিয়ে চলল হেঁচড়ে। মারতে লাগল কিল-চড়-ঘুঁষি। রাজপুত্রের গলা থেকে কিন্তু টুঁ শব্দও বেরুল না। ভোরের দিকে তারা হল অদৃশ্য। রাজপুত্র তখন বেজায় ক্লান্ত। সর্বাঙ্গ তার আড়ষ্ট। আঙুল নাড়াতেও কষ্ট। কিন্তু দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে সেই কালো মেয়েটি এল তার কাছে। তার এক হাতে ছিল জীবন-জল-ভরা ছোট্টো একটি শিশি। সেই জল তরুণী

তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেই রাজপুত্রের সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হল। তার সর্বাঙ্গে ফিরে এল নতুন জীবনী-শক্তি।

তরুণী বলল, "একটা রাত তুমি খুব ভালো সহ্য করেছ। কিন্তু আরো দুটো রাত কাটাতে হবে।"

এই-না বলে মেয়েটি চলে গেল। আর রাজপুত্র দেখল তার পায়ের পাতাদুটো ফরসা হয়ে উঠেছে।

সে-রাতে ভূতপ্রেতের দল তাকে আরো বেশি কিল-চড়-ঘুঁষি মেরে প্রায় থেঁৎলে ফেলল। কিন্তু রাজপুত্র টুঁ শব্দটি করল না। পরদিন সকালে রাজকন্যে এসে জীবন-জল দিয়ে আবার তাকে সুস্থ করে তুলল। আর সে যাবার সময় সানন্দে রাজপুত্র দেখল তার আঙুলের ডগা পর্যন্ত ফরসা হয়ে উঠছে।

তখন শুধু আর-একটা রাত কাটানো বাকি। কিন্তু সে-রাতের অত্যাচারটাই হল চরম। আবার দলে-দলে ভূতপ্রেত এসে চেঁচিয়ে উঠল, "এখনো রয়েছিস? আজ পিটিয়ে তোর দফা নিকেশ করব।"

এই-না বলে লাথি মারতে-মারতে একবার রাজপুত্রকে তারা নিয়ে যায় সামনে, একবার পিছনে। মারতে থাকে কিল-চড়-ঘুঁষি। হাত-পা এমন জোরে টানে, যেন ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু রাজপুত্রের গলা দিয়ে এবারেও টুঁ শব্দ বেরুলো না। ভোরের দিকে ভূতপ্রেতের দল অদৃশ্য হল। কিন্তু রাজপুত্রের তখন অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থা। জীবন-জল ছিটবার জন্য মেয়েটি যখন এল চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত সে পারল না। তার পর হঠাৎ মিলিয়ে গেল তার সব জ্বালা-যন্ত্রণা। আগের চেয়েও সুস্থ-সবল হয়ে উঠল তার শরীর। জেগে উঠে সে দেখে মেয়েটি তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুধের মতো গায়ের রঙ তার। আর রূপ যেন ফেটে পড়ছে।

মেয়েটি বলল, "দাঁড়িয়ে উঠে সিঁড়ির ওপর তিনবার তোমার তরোয়াল ঘোরাও। তা হলেই জাদুর মায়া কেটে যাবে।"

রাজপুত্র তার তরোয়াল ঘোরাতেই জাদুমুক্ত হয়ে গেল পুরো কেল্লাটা। আর সেই তরুণী হয়ে উঠল রূপসী আর ধনী রাজকন্যে। ভৃত্যের দল ছুটে এসে জানাল ভোজসভার বিরাট হল ঘরে খাবারের টেবিল সাজানো হয়েছে। তাই গিয়ে একসঙ্গে তারা খেতে বসল। আর সেই সন্ধেয় খুব জাঁকজমক করে হয়ে গেল তাদের বিয়ে।

স্বর্গে চাষী

এক গরিব সৎ চাষী মৃত্যুর পর পৌঁছল স্বর্গের সিংহ দ্বারে। তার সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছিল খুব ধনী এক জমিদারের। সে-ও সেখানে হাজির হল। চাবি নিয়ে এসে সেন্ট পিটার সিংহদ্বার খুলে জমিদারকে ঢুকতে দিলেন। কিন্তু চাষীকে নিশ্চয়ই তিনি দেখতে পান নি। কারণ সিংহ-দ্বার তিনি বন্ধ করে দিলেন। চাষী রইল বাইরে দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করতে করতে চাষী শুনতে পেল বাজনা বাজিয়ে আর গান গেয়ে ধনী জমিদারকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। গান-বাজনা থামলে পর সেন্ট পিটার ফিরে এসে গরিব লোকটিকে ঢুকতে দিলেন। চাষী আশা

করেছিল সে ভিতরে আসতে নতুন করে আবার গান-বাজনা শুরু হবে। কিন্তু কিছুই হল না। সব-কিছু রইল চুপচাপ। দেবদূতরা এসে সদয়ভাবে তাকে অভ্যর্থনা করল। কিন্তু গান কেউ গাইল না। তখন সেন্ট পিটারকে সে প্রশ্ন করল, "বড়োলোকের মতো আমি আসতে গান-বাজনা কেন হল না? পৃথিবীর মতো এখানেও কি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়?"

সেন্ট পিটার বললেন, "না। যে-লোকটি এইমাত্র এল তার মতো তুমিও আমাদের প্রিয়। তার মতোই স্বর্গসুখ তুমি উপভোগ করবে। কিন্তু তোমার মতো গরিব চাষী এখানে প্রতিদিন আসে—ধনী লোক আসে একশো বছরে মাত্র একবার!"

ভাগ্যবান জ্যাক্

সাত বছর চাকরি করার পর জ্যাক্ তার প্রভুকে বলল, "প্রভু, এবার আমি বাড়িতে আমার মায়ের কাছে যেতে চাই। আমার বেতন চুকিয়ে দিন।"

তার প্রভু বললেন, "তুমি খুব ভালো করে আমার সেবা যত্ন করেছ। তাই খুব ভালো বেতনই তোমার পাওনা হয়েছে।" এই-না বলে তার মাথার মতো বড়ো এক তাল সোনা জ্যাক্কে তিনি দিলেন।

পকেট থেকে রুমাল বার করে সোনার তালটা তাতে জড়িয়ে সেটা পিঠে ফেলে নিজের বাড়ির দিকে যাত্রা করল জ্যাক্। মনের আনন্দে সে চলেছে, এমন সময় সে দেখল একটা তেজী ঘোড়ায় টগ্‌বগিয়ে চলেছে এক ঘোড়সওয়ার। তাই-না দেখে আপন মনে বলে উঠল জ্যাক্, 'ঘোড়ায় চড়ে যেতে কী আরাম! পায়ে পাথরের ঠোক্কর লাগে না, জুতোর শুকতলা ক্ষয় না—মনে হয় যেন চেয়ারে বসে চলেছি!'

তার কথা শুনে ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়সওয়ার তাকে কাছে ডেকে বলল, "জ্যাক্, কোন দুঃখে হেঁটে চলেছ?"

গ্রিম—২-১৬

সে বলল, "না হেঁটে উপায় কী? বাড়িতে একটা ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। জিনিসটা সোনা বটে, কিন্তু এমন ভারী যে কাঁধ টন্‌টনিয়ে উঠেছে।"

ঘোড়সওয়ার বলল, "তুমি যদি চাও তা হলে আমরা বদলা-বদলি করে নিতে পারি—আমি তোমায় আমার ঘোড়া দেব, তুমি দেবে তোমার সোনার তালটা।"

"জ্যাক্ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি খুব রাজি। কিন্তু আগে থেকে বলে দিলাম—এটা ভীষণ ভারী।"

ঘোড়সওয়ার নেমে সোনার তালটা নিল। তার পর ঘোড়ার পিঠে জ্যাক্‌কে তুলে তার হাতে লাগাম দিয়ে বলল, "খুব জোরে যেতে চাইলে জিভ দিয়ে চক্‌চক্ শব্দ কোরো আর 'হ্যাট্, হ্যাট্' বলে চেঁচিয়ো।"

ঘোড়ার পিঠে চড়ে জ্যাকের ফুর্তি আর ধরে না। মিনিট কয়েক বাদে তার ইচ্ছে হল খানিক জোরে যেতে। তাই জিভ দিয়ে চক্‌চক্ শব্দ করে সে চেঁচাতে লাগল, "হ্যাট্, হ্যাট্।" এই-সব শব্দ শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা হঠাৎ শুরু করল দারুণ জোরে ছুটতে আর কোনো কিছু বোঝবার আগেই জ্যাক্ দেখল ক্ষেত আর পথের মাঝখানের এক খানায় সে পড়ে রয়েছে। এক চাষী তার গোরু চরাতে বেরিয়েছিল। সে ধরে না ফেললে ঘোড়াটা নির্ঘাৎ পালাত। জ্যাকের মন-মেজাজ তখন বিগড়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে চাষীকে সে বলল, "ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া বিশ্রী ব্যাপার। আর-একটু হলেই তো ঘাড় মট্‌কে যেত। ঘোড়াটার পিঠে আর কখনো চড়ছি না। ঘোড়াটার চেয়ে তোমার গোরুর মতো গোরু অনেক ভালো। তার পেছনে ধীরে-সুস্থে হাঁটা যায়। তা ছাড়া দৈনিক দুধ, মাখন, পনীরের ভাবনা থাকে না। একটা গোরুর জন্যে সব-কিছু আমি দিতে পারি।"

চাষী বলল, "তাই যদি তোমার মনে হয়—আমার গোরুটা নাও, তোমার ঘোড়াটা দাও।" সঙ্গে-সঙ্গে খুব খুশি হয়ে জ্যাক্ রাজি হয়ে গেল। চাষী ঘোড়াটায় চড়ে চক্ষের নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল।

মস্ত একটা দাঁও মেরেছে ভেবে মনের আনন্দে জ্যাক্ গোরুটার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল, 'রুটির সঙ্গে কখনো আমার মাখন বা পনীরের অভাব হবে না। আর তেষ্টা পেলে আমার গোরুটা দুয়ে দুধ খাব। কী মজা!'

যেতে যেতে প্রথম যে সরাইখানা পড়ল সেখানে থেমে সঙ্গের সব খাবার-দাবার খেয়ে শেষ-দু-পয়সা দিয়ে জ্যাক্ কিনল এক গেলাস বিয়ার। তার পর গোরু নিয়ে চলল যে গ্রামে তার মা থাকে সেই গ্রামের দিকে। দুপুরের দিকে কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে দারুণ তেষ্টায় তার গলা একেবারে গেল শুকিয়ে। তাই জ্যাক্ ভাবল, 'এইবার গোরু দুয়ে খানিকটা দুধ খাওয়া যাক।'

একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে গোরুটা সে বাঁধল। সঙ্গে বালতি ছিল না বলে নিজের চামড়ার টুপিটা বিছিয়ে সে দুধ দুইবার চেষ্টা করতে করতে একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল। কিন্তু এক ফোঁটা দুধও বেরুল না। শেষে গোরুটা ভীষণ বিরক্ত হয়ে পিছনকার পা দিয়ে তাকে সজোরে এমন এক চাট মারল যে, বেশ খানিক দূরে ছিট্‌কে পড়ল জ্যাক্।

একটা ঠেলা গাড়িতে এক শুয়োর ছানা নিয়ে এক কসাই যাচ্ছিল। জ্যাক্‌কে মাটি থেকে টেনে তুলে সে প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপার?" জ্যাক্ তাকে সব ঘটনার কথা জানাল। কসাই তার আঙুর রসের বোতল জ্যাক্‌কে দিয়ে বলল, "দু ঢোক খাও, তা হলে চাঙ্গা লাগবে। এটা দেখছি বুড়ো গোরু। এ আর দুধ দেবে না। একে দিয়ে হয় এক মাল গাড়ি টানানো যায়, নয়তো এটা কেটে এর মাংস কসাই-এর দোকানে বিক্রি করা যায়।"

মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে জ্যাক্ বলল, "তাই নাকি? এ-রকম জন্তুকে তা হলে মেরে ফেলাই ভালো। অনেক মাংস পাওয়া যাবে। কিন্তু গোরুর মাংস তেমন রসালো নয়, কেমন যেন ছিব্‌ড়ে-ছিব্‌ড়ে। তোমার ঐ শুয়োর-ছানাটা যদি পেতাম। শুয়োরের মাংসের স্বাদই আলাদা। তা ছাড়া শুয়োরের মাংস দিয়ে সসেজ বানানোও যায়।"

কসাই বলল, "জ্যাক্, তোমাকে ভালো লেগেছে বলেই বলছি—তোমার গোরুর সঙ্গে আমার শুয়োর ছানাটা বদলা-বদলি করতে আমি রাজি।"

ভারি খুশি হয়ে জ্যাক্ তার গোরুটা দিল কসাইকে। আর কসাই ঠেলা গাড়ি থেকে শুয়োর ছানাটা নামিয়ে যে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল সেই দড়িটা তুলে দিল জ্যাকের হাতে।

যেতে যেতে জ্যাক্ ভাবতে লাগল তার সৌভাগ্যের কথা। তার মনে হল নানা দুর্ঘটনা ঘটলেও শেষপর্যন্ত তার লাভই হয়েছে। এমন সময় আর-একটা ছেলের সঙ্গে তার দেখা। বগলে একটা হাঁস

নিয়ে সে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে নিজের সৌভাগ্যের কথা জ্যাক্ তাকে বলল। জানার প্রতিবার বদলা-বদলি করে সে কী রকম লাভবান হয়েছে। ছেলেটি বলল এক ভোজসভার জন্য হাঁসটা সে নিয়ে চলেছে। হাঁসটার ডানা ধরে তুলে ছেলেটি তাকে বলল, "এটা ধরে দ্যাখ কী রকম ভারী! নিশ্চয়ই গত আট সপ্তাহ ধরে খাইয়ে-দাইয়ে এটাকে মোটা করা হয়েছে। আমি বলে দিলাম যেই এর মাংস খাক্-না কেন তারই মুখের দু পাশে চর্বি লেগে যাবে।"

হাঁসটা তুলে জ্যাক্ বলল, "তা যা বলেছিস! বেশ ভারীসারি দেখছি। কিন্তু শুয়োর ছানার মাংসও খেতে খারাপ নয়।"

ছেলেটা মাথা নাড়িয়ে সতর্কভাবে চার দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা কথা বোধ হয় জানিস না। আমার মনে হয় শুয়োর ছানাটা নিয়ে ফ্যাসাদে পড়বি। কারণ যে গ্রাম দিয়ে এলাম সেখানকার সেপাই-এর খোঁয়াড় থেকে একটু আগে একটা শুয়োর ছানা চুরি গেছে। আমার মনে হচ্ছে এটাই সেই শুয়োর ছানা। এটার খোঁজে চার দিকে নানা লোক ঘুরছে। তাই বলছিলাম তোর কাছে ওরা শুয়োর ছানাটা দেখলে মহা বিপদে পড়বি। তোকে নির্ঘাৎ ওরা জেলে পুরবে।"

ছেলেটার কথা শুনে ভীষণ ঘাবড়ে জ্যাক্ বলল, "ভাই, এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর। এটা নিয়ে তোর হাঁসটা আমায় দে।"

ছেলেটা বলল, "নিলে আমিও ফ্যাসাদে পড়তে পারি। কিন্তু তোকে আমার বন্ধু বলে মনে করেছি। তাই ঝুঁকিটা নিচ্ছি।" এই-না বলে হাঁসটা জ্যাক্‌কে দিয়ে শুয়োর ছানার দড়ি ধরে চট্‌পট্ সে সরে পড়ল আর মনের আনন্দে হাঁসটা বগলদাবা করে জ্যাক্ চলল তার বাড়ির দিকে। আপন মনে সে বলতে লাগল, 'যাক আমার লাভই হল। বাড়ি গিয়ে এটাকে রোস্ট করে খাওয়া যাবে। যে-চর্বি পাওয়া যাবে সেটায় মাস তিনেক রান্নাবান্না করা যাবে। আর সাদা পালকগুলো দিয়ে সুন্দর একটা মাথার বালিশ বানিয়ে নেব। মা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।'

যে-গ্রামে জ্যাকের বাড়ি সেটার আগের গ্রামে পৌঁছে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক ছুরি শানওয়ালার। তার শান দেবার চাকাটা বন্‌বন্ করে ঘুরছিল। আর সে গুন্‌গুন্ করে গাইছিল :

"ছুরি শানাই, কাঁচি শানাই মনের আনন্দে,
কোনো আমার ভাবনা নেই—সকালে কি সন্ধে।"

জ্যাক্ দাঁড়িয়ে পড়ে শান দেওয়া খানিক দেখল। শেষটায় তাকে বলল, "তোমার তো দেখি ভারি ফুর্তি!"

শানওয়ালা বলল, "তা ফুর্তি হবে না কেন? চাকা ঘোরালেই টাকা! ভালো কথা—ঐ চমৎকার হাঁসটা কোথায় কিনলে?"

"এটা কিনি নি। একটা শুয়োর ছানার বদলে পেয়েছি।"

"আর শুয়োর ছানাটা?"

"সেটা একটা গোরুর বদলে পেয়েছিলাম।"

"আর গোরুটা?"

"সেটা পেয়েছিলাম একটা ঘোড়ার বদলে।"

"আর ঘোড়াটা?"

"সেটা পেয়েছিলাম আমার মাথার মতো এক তাল সোনার বদলে। সোনার তাল পেয়েছিলাম সাত বছর চাকরি করার মাইনে বাবদ।"

শানওয়ালা বলল, "তোমার তো বেজায় বুদ্ধি! বদলা-বদলি করে খুব লাভ করেছ! এখন তোমার পকেটে টাকা ঝন্‌ঝন্ করলে আর ভাবনা থাকে না।"

জ্যাক্ প্রশ্ন করল, "কিন্তু টাকা বানাই কেমন করে?"

লোকটা বলল, "সে আর এমন শক্ত কী? আমার মতো শানওয়ালা হয়ে যাও। শান-পাথর ঘোরালেই টাকা! তোমার হাঁসটা দিলে আর শান-পাথরটা তোমায় দিতে পারি। কী, রাজি?"

জ্যাক্ খুশি হয়ে বলল, "খুব রাজি। চাকা ঘোরালেই তো পকেটে টাকা ঝন্‌ঝন্ করবে! আমার আর ভাবনা-চিন্তা থাকবে না!"

এই-না বলে শান-পাথরের বদলে সে দিয়ে দিল তার হাঁসটা।

মাটি থেকে একটা সাধারণ পাথর কুড়িয়ে জ্যাক্‌কে দিয়ে শানওয়ালা বলল, "ফাউ হিসেবে এই বিখ্যাত পাথরটা তোমাকে দিলাম। এর ওপর রেখে বাঁকা পেরেক পিটিয়ে সোজা করতে পারবে। সাবধানে রেখো।"

পাথরটা নিয়ে যেতে যেতে আনন্দে জ্যাকের চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল, 'কী কপাল নিয়েই-না জন্মেছিলাম! যাতেই হাত দি তাতেই লাভ!'

কিন্তু ভোর থেকে হাঁটছিল বলে সে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খিদেয় পেট লাগল চুঁইচুঁই করতে। কারণ তার সঙ্গে আর খাবার ছিল

না—গোরুটা পেয়ে মনের আনন্দে সব খাবার সে শেষ করেছিল। তা ছাড়া পাথরগুলোও ক্রমশ যেন হয়ে উঠতে লাগল বেজায় ভারী। যেতে যেতে পথের পাশে এক পুকুরপাড়ে সে থামল জল খেয়ে খানিক বিশ্রাম নেবার জন্য। পাথরদুটো খুব সাবধানে নামিয়ে জল খাবার জন্য সে যখন ঝুঁকেছে তার হাতের ধাক্কা লেগে সেগুলো ঝপাং করে পড়ে গেল জলের মধ্যে। আর পাথরের বোঝা হালকা হতে মনের আনন্দে নেচে জ্যাক্ বলে উঠল, "পৃথিবীতে আমার মতো সুখী আর কেউ নেই!"

তার পর দৌড়তে দৌড়তে সে ফিরে গেল তার মায়ের কাছে।

বনের বাড়ি

গরিব এক কাঠুরে তিন মেয়ে আর বউকে নিয়ে একটা কুঁড়েঘরে থাকত। এক সকালে কাজে বেরুবার আগে বউকে সে বলল, "বড়ো মেয়েকে দিয়ে বনে আমার জন্যে খাবার পাঠিয়ো। যাবার সময় পথে ভুট্টা-দানা ছড়িয়ে যাব। সেগুলো দেখে পথ চিনতে তার অসুবিধে হবে না।"

সূর্য তখন প্রায় মাঝ-আকাশে। বড়ো মেয়ে বেরুল তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে। ততক্ষণে কিন্তু বন-পায়রা, কাঠ-ঠোকরা, কোকিল, বাবুই আর চড়ুই-এর দল ভুট্টা-দানাগুলো খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছিল। আন্দাজে পথ খুঁজে চলল মেয়েটি। আর যেতে যেতে সূর্য ডুবল, রাত নামল, অন্ধকারে গাছগুলো মর্মর শব্দ করতে লাগল আর পেঁচার দল শুরু করল ডাকতে। মেয়েটি তাই ভয় পেয়ে গেল।

তার পর গাছের ফাঁক দিয়ে কিছু দূরে একটা আলো দেখে মেয়েটি ভাবল, 'নিশ্চয়ই ওখানে লোকজন আছে। রাতে তারা হয়তো আমায় থাকতে দেবে।' আলোর কাছে গিয়ে সে দেখে ছোটো একটা বাড়ি। আলোটা আসছিল বাড়িটার ছোটো জানলা দিয়ে। মেয়েটি দরজায় টোকা দিল।

কে একজন বলে উঠল, "ভেতরে এসো।"

মেয়েটি ভিতরে গিয়ে বৈঠকখানার দরজায় আবার টোকা দিল।

আবার সেই স্বর বলে উঠল, "ভেতরে এসো।"

ভিতরে গিয়ে মেয়েটি দেখে টেবিলের সামনে সাদা চুল বুড়ো এক

বামন তার পাকা দাড়ির মধ্যে হাত ডুবিয়ে বসে আছে। তার লম্বা দাড়ি লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়। উনুনের পাশে শুয়ে রয়েছে তিনটে জন্তু—একটা মুরগি, একটা মোরগ আর একটা সাদা-কালো ছিট্ ধরা গোরু। বুড়ো বামনকে মেয়েটি বলল, "বাবার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে এখানে রাত কাটাতে দাও।"

বুড়ো বামন বলল :

"সুন্দর মোরগ
সুন্দরী মুরগি

ছিট্‌ছিটে গাই—

—বলে দে তোরাই।"

জন্তুগুলো সমস্বরে ডেকে উঠল। নিশ্চয়ই সেই ডাকের মানে, "আমাদের আপত্তি নেই।" কারণ বুড়ো বামন সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "এসো বাছা, এসো। এখানে কোনো জিনিসের অভাব নেই। উনুনে রাতের রান্না চড়াও গে।"

রান্না ঘরে গিয়ে মেয়েটি দেখে বাস্তবিকই কোনো জিনিসের অভাব নেই। তাই সে খুব ভালো করে রান্নাবান্না করল। কিন্তু জন্তুদের খাবারের কথা একেবারেই তার মনে ছিল না। ডিশে করে খাবার-

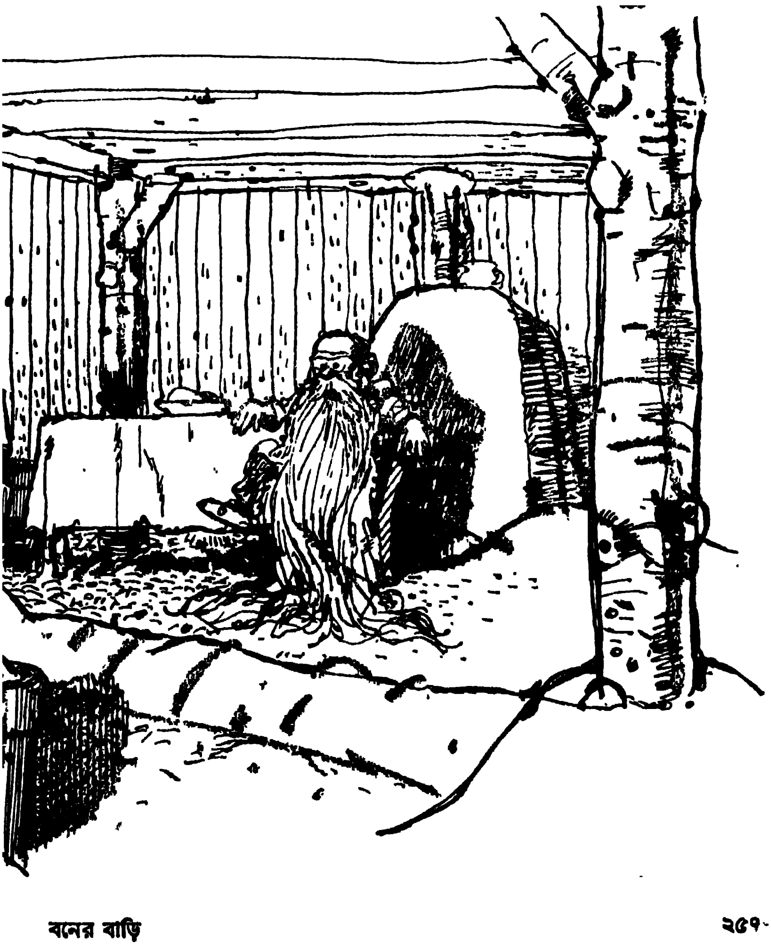

দাবার টেবিলে এনে বুড়ো বামনের সঙ্গে বসে সে ভর পেট খেল। তার পর বলল, "আমি বেজায় ক্লান্ত। কোন বিছানায় ঘুমোব— দেখিয়ে দাও।"

তার কথা শুনে জন্তুরা বলে উঠল :

"আমাদের কথা ভুলে
বুড়োর সঙ্গে খেয়েছ,
রাত কাটাবে কেমন করে
সে কথাটা ভেবেছ ?"

বুড়ো বামন তাকে বলল, "ওপরতলায় গিয়ে দেখবে একটা ঘরে দুটো খাট। সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে চাদর পেত। আমিও শুতে আসছি।'

মেয়েটি উপরতলায় গিয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। বুড়ো বামনের কথা তার মনেই রইল না।

খানিক পরে বুড়ো বামন সেখানে গিয়ে মেয়েটির মুখের সামনে মোমবাতি ধরে দেখল। তার পর নাড়ল তার মাথা। যখন দেখে মেয়েটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন সে একটা চোরা দরজা খুলে তাকে নামিয়ে দিল মাটির তলার ঘরে।

কাঠুরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে বউকে বকাবকি করতে লাগল। কারণ সমস্ত দিন তার কেটেছে উপোস করে।

তার বউ বলল, "আমাকে মিছিমিছি কেন বকাবকি করছ ? তোমার খাবার দিয়ে ঠিক সময়েই তো মেয়েকে পাঠিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে পথ হারিয়েছে। কাল সকালেই ফিরবে।"

পরদিন রাত থাকতে-থাকতে উঠে বনে যাবার আগে কাঠুরে তার বউকে বলল, "খাবার দিয়ে আজ মেজো মেয়েকে পাঠিয়ো। আমি আজ মসুর ডাল ছড়িয়ে যাব। সেগুলো দেখে পথ চিনতে তার কোনো অসুবিধে হবে না।"

মেজো মেয়ে দুপুরে বেরুল তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে। কিন্তু মসুর ডালগুলো বন-মোরগ আর বন-পায়রার দল খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল।

পথ হারিয়ে বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মেজো মেয়েও সন্ধেবেলায় পৌঁছল সেই বুড়ো বামনের বাড়িতে। রাতের জন্য সে আশ্রয় চাইতে বুড়ো বামন আবার তার জন্তুদের বলল,

"সুন্দর মোরগ
সুন্দরী মুরগি
ছিট্‌ছিটে গাই
—বলে দে তোরাই।"

আগের দিনের মতোই জন্তুগুলো সমস্বরে ডেকে উঠল আর আগের দিনের মতোই ঘটল সব-কিছু।

মেজো মেয়ে ভালো করে রেঁধেবেড়ে বুড়ো বামনের সঙ্গে পেট ভরে খেল। কিন্তু জন্তুদের কথা তারও মনে পড়ে নি। তাই শোবার জায়গার কথা জিগেস করতে জন্তুরা বলে উঠল :

"আমাদের কথা ভুলে
বুড়োর সঙ্গে খেয়েছ,
রাত কাটাবে কেমন করে
সে কথাটা ভেবেছ?"

মেজো মেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বুড়ো বামন তার মুখের সামনে মোমবাতি ধরে দেখে মাথা নাড়াল। তার পর একটা চোরা দরজা খুলে তাকেও নামিয়ে দিল মাটির তলার ঘরে।

তৃতীয় দিন সকালে কাঠুরে তার বউকে বলল, "খাবার দিয়ে আজ ছোটো মেয়েকে পাঠিয়ো। আমাদের এ মেয়ে অনেক ভালো আর লক্ষ্মী। দিদিদের মতো এদিক-সেদিক ঘুরে সে পথ হারাবে না।"

কাঠুরের বউ কিন্তু আপত্তি করে বলল, "তুমি কি চাও কোলের মেয়েটাকেও হারাই?"

কাঠুরে বলল, "না গো না—ভয় পেয়ো না। এ মেয়ের বুদ্ধি অনেক বেশি। আজ এমন বেশি মটর দানা ছড়াব যে, কিছুতেই পথ সে হারাবে না।"

কিন্তু ছোটো মেয়ে বনে পৌঁছবার অনেক আগেই বন-পায়রার ঝাঁক মটর দানাগুলো খেয়ে শেষ করেছিল। তাই সে বুঝতে পারল না কোন পথে যাবে। মায়ের দুর্ভাবনা আর বাবা খেতে পাবে না ভেবে মন তার খুব খারাপ হয়ে গেল। সন্ধেয় আলো দেখে তার বোনদের মতো সেও পৌঁছল সেই বুড়ো বামনের বাড়িতে। রাতের জন্য আশ্রয় চাইতে লম্বা দাড়ি বুড়ো বামন যথারীতি তার জন্তুদের বলল :

"সুন্দর মোরগ
সুন্দরী মুরগি
ছিট্‌ছিটে গাই
—বলে দে তোরাই।"

আর আগের মতোই জন্তুগুলো সমস্বরে ডেকে উঠল, যার মানে—তাদের আপত্তি নেই।

উনুনের সামনে জন্তুরা শুয়ে ছিল। কাঠুরের ছোটো মেয়ে 'সুন্দর মোরগ' আর 'সুন্দরী মুরগি'র পালকে হাত বুলিয়ে আদর করল। 'ছিট্‌ছিটে' গোরুর শিঙ দুটোর মাঝখান দিল চুলকে। তার পর ভালো করে রান্নাবান্না করে খাবার টেবিলে ডিশ্‌গুলো সাজিয়ে বুড়ো বামনকে বলল, "এই নিরীহ জন্তুদের খেতে না দিয়ে আমি খাই কী করে? রান্নাঘরে অনেক জাবনা আছে। জন্তুদের আগে খেতে দিয়ে আমি খেতে বসব।" এই-না বলে মোরগ আর মুরগির জন্য মটরদানা আর গোরুর জন্য খড় এনে মিষ্টি গলায় তাদের সে বলল, "এই নে, পেট ভরে খা।" তাদের খাওয়া-দাওয়া হলে সে নিয়ে এল এক বালতি জল। জন্তুরা তৃপ্তি করে সেই জল খেলে পর কাঠুরের ছোটো মেয়ে বুড়ো বামনের সঙ্গে খেতে বসল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাঠুরের ছোটো মেয়ে বলল :

"সুন্দর মোরগ
সুন্দরী মুরগি
ছিট্‌ছিটে গাই
—এবার ঘুমাই?"

জন্তুরা উত্তর দিল :

"আমাদের সঙ্গে
খাওয়া দাওয়া সেরেছ,
আমাদের ভালোবেসেছ।
ফুট্‌ফুটে মেয়ে, তাই—
শুভরাত জানাই।

কাঠুরের ছোটো মেয়ে তার পর উপরতলায় গিয়ে ভালো করে বিছানাটা

খুপেতে ঠাকুর নাম করে শুয়ে পড়ল। পাকা লম্বা দাড়ি বামন শুলো পাশের বিছানায়।

মাঝ-রাত পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমোবার পর ভীষণ হৈচৈতে কাঠুরের ছোটো মেয়ে জেগে উঠল। ঘরের চার কোণে তখন ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ। দড়াম্-দড়াম্ করে দরজার পাল্লাগুলো দেয়ালে আছড়াচ্ছে। মনে হল কড়ি-বরগাগুলো বুঝি খসে পড়বে। মনে হল সিঁড়িটা হুড়্মুড়িয়ে পড়ল আর সারা বাড়িটা চুরমার হতে চলেছে। কিন্তু খানিক পর চার দিক শান্ত হয়ে পড়লে আবার সে ঘুমে তলিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে রোদ এসে মুখে পড়তে জেগে উঠে অবাক হয়ে কাঠুরের ছোটো মেয়ে দেখে—সে শুয়ে আছে রাজা-রাজড়াদের শোবার ঘরের মতো প্রকাণ্ড একটা জমকালো শোবার ঘরে। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে রেশমের সবুজ পর্দা। সেগুলোয় সোনালী সুতোয় নানা ফুলের নক্‌শা। তার খাটটা হয়ে গেছে হাতির দাঁতের পালঙ্ক। পাশের একটা চেয়ারে মুক্ত-বসানো এক জোড়া চটি।

কাঠুরের ছোটো মেয়ের মনে হল সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। এমন সময় দামী চাপরাস্‌পরা তিনজন ভৃত্য এসে কুর্নিশ করে প্রশ্ন করল— "কী হুকুম?" মেয়েটি বলল, "তোমরা যাও। আমি উঠে বুড়ো বামনের জলখাবার বানাব। তার পর খেতে দেব সুন্দর মোরগ, সুন্দরী মুরগি আর ছিট্‌ছিটে গোরুকে।" সে ভেবেছিল বুড়ো বামন বুঝি তার আগেই উঠে পড়েছে। কিন্তু পাশের খাটের দিকে তাকাতে সে দেখে বুড়ো বামনের বদলে শুয়ে রয়েছে সুপুরুষ এক তরুণ।

জেগে উঠে সেই তরুণ তাকে বলল, "আমি আসলে রাজপুত্তুর। এক ডাইনি তুক্‌তাক্ করে আমাকে বুড়ো বামন করে দিয়েছিল। গতকাল সেই বামনকেই দেখেছিলে। বনের মধ্যে জোর করে আমাকে সেই ডাইনি রাখে। তিন ভৃত্য ছাড়া আর কাউকে আমার সঙ্গে সে থাকতে দেয় নি। তারাই সেই মোরগ, মুরগি আর ছিট্‌ছিটে গোরু। কোনো কুমারী এসে শুধু আমার প্রতি নয় সেই জন্তুদের প্রতিও সদয় ব্যবহার করলে তবেই আমার জাদুমুক্ত হবার কথা। তুমিই সেই মেয়ে। গতকাল মাঝরাতে জাদুর মায়া কেটে গেছে। বনের বাড়িটা আবার হয়ে উঠেছে রাজপ্রাসাদ।"

তার পর রাজপুত্র তার তিন ভৃত্যকে বলল সেই কাঠুরে আর তার

বউকে নিয়ে আসতে।

"কিন্তু আমার বড়ো বোনরা কোথায়?" মেয়েটি প্রশ্ন করল।

রাজপুত্র বলল, "মাটির তলার ঘরে তাদের বন্দী করে রেখেছি। কাল তারা এক কয়লাখনির মালিকের কাছে গিয়ে তার দাসী হয়ে থাকবে—যতদিন-না তাদের স্বভাব বদলায়, যতদিন-না জন্তু-জানোয়ারদের প্রতি তারা সদয় ব্যবহার করতে শেখে।"

কুয়ো পাড়ের হাঁস-চরানো মেয়ে

এক সময় ছিল এক বুড়ি। পাহাড়গুলোর মতোই প্রায় তার বয়েস। দুই পাহাড়ের মাঝে জনমানবহীন এক প্রান্তরে ছোট্টো একটা কুঁড়েঘরে সে থাকত একপাল হাঁস নিয়ে। সেই নির্জন প্রান্তর ঘিরে ছিল গহন এক বন। রোজ ভোরে বুড়ি তার ক্রাচ্-জোড়ায় ভর দিয়ে বনে যেত। সেখানে সে অনেক কাজ করত, যেগুলো তার বয়সী বুড়ির পক্ষে করা সম্ভব বলে কল্পনা করা যায় না। তার হাঁসের পালের জন্য সে ঘাস জোগাড় করত, যতদূর হাত পৌঁছয় ততদূর হাত বাড়িয়ে সে তুলত বুনো বেরি ফল। তার পর সেগুলো পিঠে করে সে বাড়ি ফিরত। দেখে মনে হত ভারী বোঝার চাপে তার শরীরটা মাটির উপর দুমড়ে পড়ল বলে। কিন্তু নিরাপদেই রোজ সে ফিরত বাড়ি। কারুর সঙ্গে দেখা হলে বন্ধুর মতো হেসে সে বলত, "সুপ্রভাত, বন্ধু। আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার। আমার ঘাসের বোঝা দেখে তুমি হয়তো অবাক হচ্ছ। কিন্তু সবাইকেই তো একটা-না-একটা বোঝা বইতে হবেই।" তার মিষ্টি কথা সত্ত্বেও লোকে কিন্তু চাইত না, তার সঙ্গে দেখা হয়। তাকে এড়াবার জন্য লোকে ঘুরপথ দিয়ে যেত। ছেলেদের নিয়ে যেতে-যেতে এই বুড়ির সঙ্গে কোনো বাবার দেখা হলে ফিস্‌ফিস্ করে সে বলত, "সাবধান! বুড়িটা ডাইনি।"

এক সকালে সুপুরুষ এক তরুণ হেঁটে চলেছিল বনের মধ্যে দিয়ে। সূর্য তখন ঝল্‌মল্ করছে, পাখিরা গান গাইছে আর মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাসে দুলছে গাছের ডালপালা। হালকা খুশি মনে হাঁটছিল তরুণ। এ-পর্যন্ত

কারুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। হঠাৎ সে দেখে মাটির উপর নতজানু হয়ে বসে সেই বুড়িকে কাস্তে দিয়ে ঘাস কাটতে। বুড়ির ঝোলায় ছিল দুটো বড়োসড়ো পুঁটলি আর পাশের দুটো ঝুড়িতে ছিল বুনো নাশপাতি আর আপেল।

তরুণ বলল, "খুড়িমা, এত সব জিনিস তুমি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

বুড়ি বলল, "বাছা, আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ধনীদের ছেলেমেয়ের এ-সব জিনিসের দরকার নেই। কিন্তু গরিব চাষীদের মধ্যে একটা চলতি কথা আছে: টুকিটাকি জিনিসকে হেলাফেলা করতে নেই।" আমায় তুমি সাহায্য করতে চাও? তোমার পিঠ খাড়া, পাদুটো মজবুত। তোমার পক্ষে এগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ। আমার বাড়িটাও বেশি দূর নয়। পাহাড়টার ওপরেই। চক্ষের নিমেষে সেখানে পৌঁছে যাবে।"

বুড়ির কথা শুনে তার জন্য তরুণের দুঃখ হল। সে বলল, "আমি চাষী নই। আমার বাবা ধনী-জমিদার। কিন্তু চাষী ছাড়াও অন্য লোকে যে ভারী বোঝা বইতে পারে সেটা প্রমাণ করার জন্যেই তোমার পুঁটলিটা আমি বয়ে নিয়ে যাব।"

বুড়ি বলল, "তুমি নিয়ে গেলে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ থাকব। ঘণ্টা খানেক হাঁটলেই আমার বাড়ি। তোমাকে কিন্তু নাশপাতি আর আপেলের ঝুড়িটাও নিয়ে যেতে হবে।"

দূরত্বের কথা শুনে তরুণ বেশ খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বুড়ি কিন্তু তাকে ছাড়ল না। ঘাসের পুঁটলিটা তার পিঠে বেঁধে নাশপাতি আর আপেলের ঝুড়ি দুটো সে ঝুলিয়ে দিল তরুণের দুই হাতে।

তার পর বলল, "দেখছ তো এগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া কী রকম সহজ!"

তরুণ বলল, "না-না, মোটেই সহজ নয়।" ব্যথায় কুঁচকে উঠল তার মুখ। তার পর খানিক থেমে সে বলে চলল, "মনে হচ্ছে ঘাসের পুঁটলিতে পাথর ভরা। আর নাশপাতি আর আপেলের ঝুড়িদুটোয় মনে হচ্ছে যেন সীসে রয়েছে। নিশ্বেস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

ঠাট্টার সুরে বুড়ি বলে উঠল, "শোনো কথা! বুড়ি একশো বার যে-বোঝা বয়ে নিয়ে গেছে, তরুণ ভদ্রলোক সেটা বইতে পারে না! বড়ো-বড়ো কথা বলা খুব সোজা, কিন্তু কাজের বেলায় আলাদা—

তাই-না? চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেবো না, পুঁটলি আর ঝুড়িদুটো কেউ নামিয়ে নেবে।"

পথ যতক্ষণ সমতল ছিল ততক্ষণ বোঝাগুলো কোনোরকমে সে বয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু পাহাড়ে ওঠার সময়, পায়ের তলাকার পাথরের টুকরোগুলো যখন জীবন্ত প্রাণীর মতো সরে-সরে যেতে লাগল—তার দম প্রায় ফুরিয়ে এল, তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল, কাঁপতে লাগল সমস্ত শরীর।

সে তখন বলে উঠল, "খুড়িমা, আর যেতে পারছি না। আমাকে খানিক বিশ্রাম নিতেই হবে।"

খ্যান্‌খেনে গলায় ডাইনি বলে উঠল, "এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম নয়। বাড়ি পৌঁছে বিশ্রাম নেবে, তার আগে নয়। এগিয়ে চল। এই পরিশ্রমে তোমার খুব উপকার হবে।"

ভীষণ রেগে তরুণ চেঁচিয়ে উঠল, "বুড়ি, তোর লজ্জা করছে না?" এই-না বলে বোঝাগুলো সে নামাতে গেল। কিন্তু কাঁধের সঙ্গে এমন শক্ত করে বুড়ি সেগুলো বেঁধে দিয়েছিল যে, কিছুতেই সে নামাতে পারল না।

তাকে বোঝাগুলো নামাবার চেষ্টা করতে দেখে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে ক্রাচ্-এ ভর দিয়ে তাকে ঘিরে ডাইনি বুড়ি খানিক নাচল। তার পর বলল, "মানিক আমার, চোটো না। মুখখানা যে জবাফুলের মতো টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। চুপচাপ বোঝাগুলো নিয়ে চলো। বাড়ি পৌঁছলে পুরস্কার পাবে।"

কী আর সে করে। বাধ্য হয়ে মোট বয়ে সে চলল। বোঝার ভারে যত সে ঝুঁকে পড়ে। বুড়ি ততই হাঁটতে থাকে খর্‌খর্ করে। হঠাৎ এক লাফে বুড়ি উঠে পড়ল পুঁটলিটার উপর। তাকে দেখতে শুকনো ঝাঁটার মতো হলে হবে কি, দেখা গেল তার ওজন সব চেয়ে মোটাসোটা চাষী মেয়ের চেয়েও বেশি। তরুণের হাঁটু কাঁপতে লাগল। কিন্তু ডাইনি তাকে চালিয়ে নিয়ে চলল কখনো ছপ্‌টি, কখনো লাথি মেরে। শেষটায় বুড়ির বাড়িতে যখন সে পৌঁছল তখন তার প্রায় খাবি খাবার অবস্থা।

বুড়িকে দেখে হাঁসগুলো ডানা মেলে, ঘাড় বাড়িয়ে 'প্যাক্‌প্যাক্' করতে-করতে তার দিকে এল উড়ে। তাদের পিছন-পিছন হাতে ছড়ি নিয়ে এল লম্বা আর মজবুত চেহারার হতকুচ্ছিত একটা মেয়ে।

বুড়িকে সে বলল, "মামণি। এত দেরি হল কেন? কিছু ঘটেছে?"

বুড়ি বলল, "না বাছা, কিছুই ঘটে নি। এই দয়ালু ভদ্রলোক আমার হয়ে মোট বয়ে এনেছে। শুধু কি তাই, খানিকটা পথ আমাকেও এনেছে পিঠে করে—সেটা তো দেখতেই পাচ্ছিস। আসবার সময় নানা গল্প করতে-করতে এসেছি। তাই দেখতে-দেখতে সময় কেটে গেছে।"

এই-না বলে তরুণের পিঠ থেকে নেমে বুড়ি তার পুঁটলি আর ঝুড়িদুটো নামিয়ে নিল। তার পর তার দিকে স্নেহ-ভরা চোখে তাকিয়ে মধুর গলায় বলল, "এই বেঞ্চিটায় বোসো। তোমার জন্যে খাবার-দাবার আর তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার এখনি পাবে।" তার পর হাঁস-চরানো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাছা, বাড়ির মধ্যে যা।

এরকম তরুণ, সুপুরুষ ভদ্রলোকের সঙ্গে একলা থাকিস না। সে তোকে ভালোবেসে ফেলতে পারে।"

বুড়ির কথা শুনে হাসবে না কাঁদবে—তরুণ স্থির করতে পারল না। এই হতকুচ্ছিত মেয়েটাকে ভালোবাসার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

বুড়ি তার হাঁসগুলোর পিঠে এমনভাবে হাত বোলাতে লাগল যেন তারা শিশুর দল। তার পর মেয়ের সঙ্গে সে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

আপেলগাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চির উপর তরুণ শুয়ে পড়ল। মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তার চার দিকে সবুজ একটা মাঠ। সেখানে হাজার ধরনের ফুল ফুটে আছে। কুল্‌কুল্‌ করে বয়ে চলেছে

স্ফটিক-স্বচ্ছ একটি স্রোত। তার উপর রোদ ঝল্‌মল্‌ করছে। সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা-সাদা হাঁস।

তরুণ বিড়্‌বিড়্‌ করে বলল, "জায়গাটা ভারি সুন্দর। কিন্তু এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে চোখ মেলে থাকতে পারছি না। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। পাদুটো যেন লোহার মতো ভারী হয়ে উঠেছে।"

অল্পক্ষণ ঘুমবার পর বুড়ি এসে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে বলল, "উঠে পড়ো। এখানে থেকো না। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি সত্যি, কিন্তু তাতে তুমি জীবন খোয়াও নি। এই নাও তোমার পুরস্কার। টাকাকড়ি বা জমিজমার তোমার দরকার নেই। তাই এটা দিলাম।" নানারকম নক্‌শা-আঁকা পান্নার ছোট্টো একটা বাক্স বুড়ি তাকে দিয়ে বলল, "এটা যত্ন করে রেখো। এটা থাকলে জীবনে অনেক আনন্দ পাবে।"

তরুণ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে টের পেল তার সব ক্লান্তি কেটে গেছে। আগের মতোই তার শরীরের শক্তি ফিরে এসেছে। পুরস্কারের জন্য বুড়িকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার "রূপসী কন্যাকে" আর-এক বার দেখার জন্য ঘাড় না ফিরিয়ে তরুণ সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূর যাবার পরেও হাঁসদের প্যাক্‌প্যাক্‌ ডাক তার কানে এল। তিনদিন হাঁটার পর সেই জনমানবহীন প্রান্তর থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পেল তরুণ। তার পর সে পৌঁছল বড়ো একটা শহরে। কেউ তাকে চিনত না। তাই তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজপ্রাসাদে। সেখানে সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা আর রানী। তরুণ নতজানু হয়ে বসে পান্নার বাক্সটা বার করে রাখল। রানীর পায়ের কাছে।

রানী তাকে বললেন উঠে দাঁড়িয়ে পান্নার বাক্সটা তাঁর হাতে দিতে। তরুণ তাই দিল। বাক্সটা খুলে ভিতরে তাকাবার সঙ্গে-সঙ্গে রানী জ্ঞান হারালেন।

তক্ষুনি তরুণকে বন্দী করে হাজতে পাঠানো হল।

খানিক পরে চোখ মেলে তাকিয়ে রানী বললেন, "তরুণকে এখানে নিয়ে এসো।" তরুণকে নিয়ে আসার পর রানী বললেন সেখান থেকে সবাইকে চলে যেতে।

ঘরে যখন আর কেউ রইল না কাঁদতে-কাঁদতে রানী তাকে বলে চললেন, " জাঁকজমক আর ধনরত্ন নিয়ে কী করব? রোজ সকালে ঘুম ভাঙলেই শোকে-দুঃখে বুক আমার ফেটে যায়। আমার

তিন মেয়ে ছিল। ছোটোটির রূপের তুলনা নেই। তুষারের মতো সে ছিল ফরসা, আপেল ফুলের মতো গোলাপী ছিল তার মুখ আর মাথার চুল ছিল সূর্যের ছটার মতো। কাঁদলে তার চোখ দিয়ে ঝরত হীরে-পান্না-মুক্তো। তার যখন পনেরো বছর বয়েস, তিন মেয়েকে রাজা বললেন সিংহাসনের সামনে আসতে। ছোটো মেয়ে যখন আসে সভাসদদের প্রশংসায় উজ্জ্বল চাউনি যদি দেখতে! মনে হল যেন সূর্যোদয় হচ্ছে! মেয়েদের রাজা বললেন, "আমার জীবন কবে শেষ হবে জানি না। কিন্তু আজ স্থির করব আমার মৃত্যুর পর তোমরা কে কী পাবে। জানি তোমরা সবাই আমায় ভালোবাস। কিন্তু আমায় সব চেয়ে বেশি যে ভালোবাসে সেই পাবে সব চেয়ে বেশি সম্পত্তি।" প্রত্যেক মেয়েই বলে—সে-ই ভালোবাসে সব চেয়ে বেশি। রাজা তখন প্রশ্ন করলেন, "কে কতটা ভালোবাস সেটা কি জানাতে পার না ? বড়ো মেয়ে বলল, "মিষ্টি মধুর চেয়েও বাবাকে আমি ভালোবাসি।" মেজো মেয়ে বলল, "আমার সব চেয়ে সুন্দর ফ্রকটার চেয়েও বাবাকে আমি ভালো-বাসি।" কিন্তু ছোটো মেয়ে কোনো কথা বলল না। রাজা প্রশ্ন করলেন, "বাছা, আমাকে তুমি কতটা ভালোবাস ?" ছোটো মেয়ে বলল, "জানি না, আমার ভালোবাসার সঙ্গে কোনো জিনিসের তুলনা করতে পারছি না।" কিন্তু রাজা তবু ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন কোনো একটা জিনিসের নাম করার জন্যে। তাই শেষটা ছোটো মেয়ে বলল, "নুন না দিলে সব চেয়ে ভালো খাবারও বিস্বাদ লাগে। নুন যতটা ভালোবাসি বাবাকেও ততটা ভালোবাসি।" তার উত্তর শুনে ভীষণ রেগে রাজা বললেন, "নুনের মতো আমায় যদি ভালোবাস তা হলে নুনই তুমি পাবে।" এই-না বলে রাজা তাঁর রাজত্ব বড়ো দুই মেয়েকে ভাগাভাগি করে দিলেন। ছোটো মেয়ের পিঠে এক বস্তা নুন বেঁধে দুজন ভৃত্যকে বললেন তাকে গহনতম বনে ছেড়ে দিয়ে আসতে। রাজাকে সবাই আমরা অনেক কাকুতি-মিনতি অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁর রাগ পড়ল না, তাঁর মত পালটাল না। আমাদের কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যাবার সময় কী কান্নাই না কেঁদেছিল মেয়েটা! যে পথ দিয়ে সে গিয়েছিল তার সবটাই ছেয়ে গিয়েছিল রাশিরাশি মুক্তোয়। কিছুদিন পরেই কিন্তু নিজের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার জন্যে রাজার মন অনুশোচনায় ভরে যায়। ছোটো মেয়ের

খোঁজে বনের মধ্যে তিনি বহু লোককে পাঠান। কিন্তু কোথাও তার খোঁজ মেলে না।—যখন মনে হয় বুনো জন্তু-জানোয়ার তাকে খেয়ে ফেলেছে তখন আমার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। মাঝে মাঝে এই ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিই—হয়তো সে কোনো গুহায় লুকিয়ে আছে, নয়তো দয়ালু কোনো লোক তাকে আশ্রয় দিয়েছে। তাই, এই পান্নার বাক্স খুলে হুবহু তার চোখের জলের ফোঁটার মতো একটা মুক্তো দেখে আমার মন যে কী রকম উতলা হয়ে উঠেছিল—আশাকরি সহজেই সে কথা অনুমান করতে পারবে। দয়া করে বলো—কী করে এটা পেলে।"

রানীকে তরুণ বলল, বনের সেই বুড়ি কী ভাবে সেটা তাকে দিয়েছিল। বলল, তার ধারণা বুড়িটি ডাইনি। জানাল, রানীর হারিয়ে-যাওয়া মেয়েকে সে দেখে নি, তার কথাও শোনে নি।

রাজা আর রানী তখন স্থির করলেন সেই বুড়ির কাছে খোঁজ-খবর নেবেন। কারণ স্বভাবতই তাদের ধারণা হল—মুক্তোটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে তাঁদের মেয়ের খবরও পাওয়া যেতে পারে।

নির্জন প্রান্তরে নিজের কুঁড়েঘরে বসে বুড়ি তার চরকায় সুতো কাটছিল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরের উনুনে গাছের যে গুঁড়িটা ধিক্-ধিক্ করে জ্বলছিল। সেটা থেকে সামান্যই আলো ছড়াচ্ছিল। বাইরে হঠাৎ শোনা গেল ডানার ঝট্‌পট আর প্যাঁক্‌প্যাঁক্ শব্দ—তার মেয়ে মাঠ থেকে হাঁস চরিয়ে ফিরছিল। মিনিট কয়েক পরে বুড়ির মেয়ে এল ঘরের মধ্যে। বুড়ি তাকে প্রায় লক্ষ্যই করল না, শুধু ঢক্‌ঢক্ করে নাড়াল তার বেতো মাথাটা। তার মেয়েও নিজের চরকা নিয়ে সুতো কাটতে বসল। এইভাবে ঘণ্টা দুয়েক তারা বসে রইল। কেউই কোনো কথা কইল না।

শেষটায় জানলায় খট্‌খট্ শব্দ শোনা গেল আর শার্সির কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল ভাঁটার মতো দুটো চোখ। চোখদুটো একটা বুড়ো প্যাঁচার। তার ডাক শুনে মুখ তুলে মেয়েকে বুড়ি বলল, "বাছা, এবার বেরিয়ে তোর কাজে যাবার সময় হয়েছে।"

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, তার পর গেল বাড়ির বাইরে। কিন্তু কোথায় গেল সে?—মাঠ দিয়ে যেতে-যেতে সেই উপত্যকায় পৌঁছে মেয়েটি দাঁড়াল একটা কুয়োর ধারে। সেটার পাশে ছিল তিনটে ওক্‌গাছ।

রুপোর প্রকাণ্ড একটা বনের মতো পাহাড়ের উপর তখন চাঁদ উঠেছে। এমন ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না যে, তার আলোয় ছোট্টো একটা আলপিনও চোখে পড়ে। মেয়েটি তার মুখ থেকে একটা মুখোশ খুলে কুয়োর জলে স্নান করতে শুরু করল। স্নান সারা হলে জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘাসের উপর মেয়েটি শুয়ে পড়ল গা শুকোবার জন্য। তার চেহারা তখন এমন পালটে গেছে যে, বিশ্বাস করাই যায় না। রুক্ষ ধুলোটে বিনুনির বদলে সূর্যের ছটার মতো ঝল্‌মলে এলো চুল তখন আঙরাখার মতো ঢেকে দিয়েছে তার সর্বাঙ্গ। আকাশের তারার মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল তার চোখদুটি। তার গালের রঙ হয়ে উঠল আপেল-ফুলের মতো গোলাপী। কিন্তু এই রূপসী কুমারীর মুখটি তখন বিষণ্ণ। উঠে বসে অঝোরে সে কাঁদতে শুরু করল। চুলের মধ্যে দিয়ে তার চোখের জল মাটিতে লাগল ঝরতে। তার পিছনকার ঝোপঝাড়গুলো খস্‌খস্‌ খড়্‌মড়্‌ করে না উঠলে মেয়েটি সেখানে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকত। শিকারীর গুলির শব্দে হরিণীর মতো সে উঠল লাফিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ল আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই পুরনো কালো চামড়াটা মাটি থেকে তুলে আবার পরে নিয়ে চক্ষের নিমেষে মেয়েটি হয়ে গেল অদৃশ্য।

বেতস পাতার মতো থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ির বাড়িতে মেয়েটি দৌড়ে ঢুকল। বুড়ি দাঁড়িয়েছিল দোরগোড়ায়। সব ঘটনার কথা তাকে বলতে যেতে খিল্‌খিল করে হেসে উঠে মেয়েটিকে ডাইনি বলল—বলার দরকার নেই, সব-কিছু সে জানে। তার পর ঘরের মধ্যে গিয়ে গাছের আর-একটা গুঁড়ি আগুনে গুঁজে দিল বুড়ি। কিন্তু চরকার সামনে আবার না বসে একটা ঝাঁটা এনে ঝাঁট দিতে দিতে মেয়েটিকে সে বলল :

"সব-কিছু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখা দরকার।"

মেয়েটি প্রশ্ন করল, "কিন্তু এত রাতে কাজ শুরু করলে কেন, মা?"

বুড়ি পালটা প্রশ্ন করল. "এখন রাত কটা, জানিস না?"

মেয়েটি উত্তর দিল, "এখনো মাঝ-রাত হয় নি। সবে এগারোটা বেজেছে।"

বুড়ি বলল, "তোর কি মনে পড়েছে না, আমার কাছে যেদিন এসেছিলি তার পর থেকে আজ তিন বছর পূর্ণ হল? তোর সময় পার

হয়েছে। আর আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না।"

আঁতকে উঠে মেয়েটি বলল, "মামণি, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। কোথায় আমি যাব? আমার না আছে কোনো বন্ধু, না আছে কোনো বাড়ি। তুমি যখন যা বলেছে তাই করেছি। আমার কাজে সব সময়েই তুমি খুশি হয়েছ। আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না।"

মেয়েটির ভাগ্যে কী আছে সে কথা জানাতে বুড়ি চাইল না। শুধু বলল, "এখানে বেশিক্ষণ আর থাকতে পারব না। কিন্তু যাবার আগে বাড়িটাকে ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে। তাই আমার কাজে বাধা দিস নি। তোর ভয় পাবার কারণ নেই। যাই ঘটুক-না কেন, থাকবার জায়গার অভাব তোর হবে না। আর যে পুরস্কার দেব, তাতে কোনোদিন অভাবে পড়বি না।"

উৎকণ্ঠিত হয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করল, "দোহাই তোমার! কী ঘটতে চলেছে, বলো।"

বুড়ি বলল, "আবার বলছি, আমার কাজে বাধা দিস না। আর একটা কথা নয়।—নিজের ঘরে গিয়ে জলে ধুয়ে তোর কালো চামড়াটা খুলে ফেল। তার পর এখানে আসার দিন যে পোশাকটা পরেছিলি সেটা পরে যতক্ষণ না ডাকি ততক্ষণ অপেক্ষা করিস।"

এবার কিন্তু সেই রাজা আর রানীর কাছে ফিরে যাওয়া যাক। তরুণের সঙ্গে নির্জন প্রান্তরে তাঁরা এসেছিলেন বুড়ির খোঁজে। বনের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে তরুণের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তাই তরুণকে যেতে হচ্ছিল একা। পরদিন তার মনে হল আসল পথটা সে ধরেছে। সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রাত হয়ে গেলে ঘুমবার জন্য একটা গাছে সে চড়ল। তার ভয় হয়েছিল অন্ধকারে হাঁটলে পথ হারাবে।

চাঁদ ওঠার পর জ্যোৎস্নায় চার দিক ভেসে যেতে সে দেখে পাহাড় থেকে কে একজন নামছে। হাতে লাঠি না থাকলেও হাঁস-চরানো মেয়েকে সে চিনতে পারল যাকে দেখেছিল বুড়ির বাগানে। তাকে দেখে সে বলে উঠল, "খুব ভালো, খুব ভালো! একটা ডাইনির যখন দেখা পেয়েছি, অন্যটারও দেখা নিশ্চয় পাব।" কিন্তু মেয়েটিকে কুয়োর পাশে গিয়ে চামড়াটা খুলে স্নান করে সুন্দর সোনালী চুল এলিয়ে দিতে দেখে সে এমন অবাক হয়ে গেল যে, তার মুখ দিয়ে আর রা সরলো না। ওরকম রূপসী মেয়ে জীবনে সে দেখে নি। নিশ্বেস ফেলতে তার ভয়

হল। মেয়েটিকে দেখার জন্য ডালপালার মধ্যে থেকে যতটা পারল সে ঝুঁকে পড়ল। হয়তো একটু বেশিই সে ঝুঁকেছিল। কারণ যে ডালে সে বসেছিল সশব্দে সেটা গেল ভেঙে। আর সঙ্গে-সঙ্গে রূপসী মেয়েটি আবার তার পুরনো চামড়াটা পরে দৌড় দিল হরিণীর মতো। আর সেই মুহূর্তে মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। ফলে মেয়েটিকে আর সে দেখতে পেল না।

মেয়েটি অদৃশ্য হবার পরমুহূর্তে গাছ থেকে নেমে যেদিকে সে গিয়েছিল সেদিকে চলল তরুণ। কিছুদূর যেতেই সে দেখে মাঠ পেরিয়ে দুজন লোক চলেছে। তাঁরা—রাজা আর রানী। বুড়ির বাড়ির জানলার আলো দেখতে পেয়ে তাঁরা চলেছিলেন বাড়িটার দিকে। কুয়োর ধারে মেয়েটির চেহারার আশ্চর্য পরিবর্তন দেখার কথা তরুণ তাঁদের জানাল। রাজা আর রানীর তখন কোনো সন্দেহ রইল না যে—সেই তাঁদের হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে।

মহা ফূর্তিতে একসঙ্গে যেতে যেতে অল্পক্ষণের মধ্যে তরুণের সঙ্গে রাজা-রানী পৌঁছলেন বুড়ির ছোট্টো কুঁড়েঘরে। ডানার মধ্যে মুখ গুঁজে হাঁসগুলো বসেছিল বাড়িটা ঘিরে। তাদের একটাও নড়ল না। জানলার মধ্যে দিয়ে সবাই তাকিয়ে দেখে চরকার সামনে বুড়ি বসে আছে। চক্-চক্ করে মাথাটা সে নাড়ছিল, কোনো দিকে তাকাচ্ছিল না। বসার ছোট্টো ঘরটা এমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে যে, দেখে মনে হয় ছোটো-ছোটো পরীরা সেখানে থাকে, এক কণা ধুলোও যারা বরদাস্ত করতে পারে না। ঘরটার মধ্যে রাজা-রানী তাঁদের মেয়েকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু সাহস করে জানলার শার্সিতে তাঁরা টোকা দিলেন।

মনে হল বুড়ি যেন তাঁদের অপেক্ষাতেই ছিল। দাঁড়িয়ে উঠে মিষ্টি গলায় সে বলল, "ভেতরে এসো। আমি জানি তোমরা কে?"

তরুণের সঙ্গে বসার ঘরে রাজা-রানী আসতে বুড়ি বলল, "তিন বছর আগে তোমাদের ছোটো মেয়েকে অন্যায়ভাবে তাড়িয়ে না দিলে এতদূর কষ্ট করে তোমাদের আসতে হত না। মেয়েটি যেমন রূপের, তেমনি গুণের। কিন্তু আসলে তার তোমরা কোনো ক্ষতি কর নি। তিন বছর ধরে আমার হাঁসগুলো সে চরিয়েছে। সেই সময়ের মধ্যে তার নিষ্পাপ হৃদয়ে কোনোরকম মলিনতার ছাপ পড়ে নি। কিন্তু তার জন্যে তোমরা যে দুর্ভাবনায় ভুগেছ তাতেই তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।"

তার পর শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বুড়ি তাকে ডাক দিয়ে বলল, "আয় বাছা, বেরিয়ে আয়।"

দরজা খুলে রেশমের পোশাক পরে রাজকন্যে বেরিয়ে এল। জ্বল্‌জ্বলে তার চোখদুটি, এক মাথা সোনালী চুল আর আপেল-ফুলের মতো গায়ের রঙ। দেখে মনে হয় সে যেন স্বর্গের দেবদূত। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে বাবা আর মাকে সে চুমু খেল। আনন্দে সবাইকার চোখে তখন জল।

তরুণ জমিদারপুত্র পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চোখ পড়তেই কেন যে তার মুখ লজ্জায় টুক্‌টুকে হয়ে উঠল রাজকন্যে সেটা বুঝল না।

রাজা তখন বললেন, "বাছা, আমার রাজত্ব তো অন্য দুই মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি। তোকে এখন কী দিই?"

বাধা দিয়ে বুড়ি বলে উঠল, "কোনো কিছুর দরকার ওর নেই। তোমাদের জন্যে ও যে চোখের জল ফেলেছিল সেগুলো ওকে দেব। সেই মুক্তোগুলো অমূল্য, সমুদ্রে যে মুক্তো পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক সুন্দর। তাদের দাম একশোটা রাজত্বের চেয়েও বেশি। আর আমার কাছে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার হিসেবে ওকে উপহার দেব আমার এই ছোট্টো বাড়িটা।"

তার কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির দেয়ালগুলোর সামান্য মড়্‌মড়্ শব্দ শোনা গেল আর তাদের চোখের সামনে মিলিয়ে গেল বুড়ি। চার দিকে তাকিয়ে তারা দেখে ছোট্টো কুঁড়েঘরটা হয়ে উঠেছে বিরাট এক প্রাসাদ, তাদের সামনে থরে থরে খাবার সাজানো লম্বা একটা টেবিল আর চাপরাস্ পরা ভৃত্যের দল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

গল্পটার আরো অনেকটা আছে। কিন্তু আমার ঠাকুমা, যিনি এটা আমায় বলেছিলেন, তাঁর স্মরণশক্তি খুব ভালো ছিল না। তাই বাদবাকিটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা—জমিদারপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রূপসী রাজকন্যার আর তারা মনের আনন্দে ছিল সেই রূপকথার প্রাসাদে।

ছোট্টো কুঁড়েঘরটার পাশের মাঠে যে-সাদা হাঁসগুলোকে খাওয়ানো হত তারা কুমারী মেয়ের দল কি না, বুড়ি তাদের নানা সময়ে নিজের বাড়িতে এনেছিল কি না, আর এখন আবার তারা মানুষের রূপ ফিরে পেয়ে

তরুণী রানীর সহচরী হয়েছে কি না—সে কথা বলতে পারি না। তবে মনে হয় সেটাই সম্ভব। কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—বুড়ি ডাইনি মোটেই পাজি ছিল না। সে ছিল জ্ঞানী স্ত্রীলোক, লোকের মঙ্গল করত। খুব সম্ভব জন্মাবার সময় ছোটো রাজকন্যেকে সে-ই দিয়েছিল চোখের জলের বদলে মুক্তো ঝরাবার ক্ষমতা।

এখন আর ও-ধরনের ঘটনা ঘটে না। যদি ঘটত তা হলে কেউই আর গরিব থাকত না।

জোয়ান হান্‌স্‌

এক সময় একটি লোক তার বউ আর একমাত্র ছেলে হান্‌স্‌কে নিয়ে নির্জন এক উপত্যকায় থাকত। উপত্যকার কাছেই ছিল একটা বন। হান্‌স্‌-এর যখন দু বছর বয়েস মা তাকে নিয়ে গেল বনে বেড়াতে। তার মায়ের ইচ্ছে ছিল বই থেকে গল্প পড়ে তাকে শোনাবার। কিন্তু তখন বসন্তকাল, দিনটা ঝল্‌মল্‌ করছে, চার দিকে ফুটে রয়েছে নানা রঙের ফুল। তাই দেখে মনের আনন্দে হান্‌স্‌ শুরু করে দিল ছুটো-পাটি। যেতে যেতে তারা চলে এল বনের গভীরে। দুজন ডাকাত একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিল। হঠাৎ তারা লাফিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের ধরে নিয়ে গেল বনের মাঝখানে। সেখানে বছরের পর বছর কেউ কখনো আসত না। হান্‌স্‌-এর মা ক্রমাগত কাকুতি-মিনতি করে ডাকাতদের বলতে লাগল তাদের ছেড়ে দিতে। কিন্তু নিষ্ঠুর ডাকাতরা তার কথা কানেই তুলল না, জোর করে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলল। ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর তারা পৌঁছল একটা পাথরের সামনে। সেটার সামনে ছিল একটা দরজা। দরজায় ডাকাতরা টোকা দিতেই সেটা খুলে গেল। ভিতরে দেখা গেল লম্বা অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ। সেটার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তারা পৌঁছল প্রকাণ্ড একটা গুহায়। সেখানে একটা চুল্লিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। সেই আগুনের আলোয় গুহার দেয়ালে-দেয়ালে ঝুলন্ত তরোয়াল, ছোরা এবং আরো নানা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ঝক্‌ঝক্‌ করছিল। গুহার মাঝখানে ছিল কালো একটা টেবিল। টেবিলটার চার পাশে বসে আরো চারজন ডাকাত তাস খেলছিল।

হান্‌স্ আর তার মা পৌঁছতে ডাকাতদের সর্দার হান্‌স্-এর মার কাছে এসে বলল, "ভয় পেয়ো না। তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। এখানকার কাজকর্ম ভালো করে করলে তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।" খাবার-দাবার দিয়ে তাকে তারা একটা বিছানা দেখিয়ে বলল—সেখানে সে আর তার ছেলে ঘুমোতে পারে।

অনেক বছর সেখানে তারা বন্দী হয়ে রইল। ক্রমশ হান্‌স্ হয়ে উঠল লম্বা-চওড়া আর জোয়ান। নিজের যেটুকু বিদ্যে-বুদ্ধি ছিল তাই দিয়ে হান্‌স্‌কে শিক্ষা দিয়েছিল তার মা। গুহায় একটা বই ছিল। সেটাও পড়ে পড়ে শোনাত সে হান্‌স্‌কে।

হান্‌স্-এর যখন ন বছর বয়েস তখন জ্বালানী কাঠের গুঁড়ি থেকে একটা মুগুর বানিয়ে লুকিয়ে রেখে মায়ের কাছে গিয়ে সে বলল, "মামণি, আমাকে জানতেই হবে কে আমার বাবা।"

তার মা হান্‌স্-এর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। কারণ সে জানত কথাটা শুনলে হান্‌স উত্তেজিত হয়ে উঠবে। এ কথাও সে জানত—ডাকাতরা কিছুতেই হান্‌স্‌কে যেতে দেবে না। কিন্তু নিজের বাবাকে কোনোদিন হান্‌স্ দেখতে পাবে না ভেবে ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠল।

রাতে ডাকাতরা ডাকাতি করে ফেরার পর মুগুরটা নিয়ে ডাকাতদের সর্দারের কাছে গিয়ে হান্‌স্ বলল, "আমি জানতে চাই—কে আমার বাবা। না বললে মুগুরের বাড়ি দিয়ে তোমায় পেড়ে ফেলব।"

তার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে ডাকাতদের সর্দার এমন কষে তার কান মলে দিল যে, হান্‌স্ ছিট্‌কে পড়ল টেবিলের নীচে। কিন্তু কোনো কথা না বলে সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে হান্‌স্ ভাবল, 'আর এক বছর অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করব। পরের বার হয়তো কপাল ফিরবে।'

পরের বছর হান্‌স্ তার মুগুরটা বার করে ঝেড়েমুছে রাতে ডাকাতদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা ফিরে ভুরিভোজ করে ঘুমিয়ে পড়ল। হান্‌স্ তখন মুগুরটা নিয়ে ডাকাত সর্দারের কাছে গিয়ে আবার জানতে চাইল—কোথায় তার বাবা আছে। কিন্তু তার কথার জবাব না দিয়ে ডাকাত-সর্দার আবার তাকে ঘুঁষি মেরে ছিট্‌কে ফেলল। হান্‌স্ কিন্তু হার মানল না। সঙ্গে-সঙ্গে মাটি থেকে উঠে

তার সেই শক্ত মুগুরটা দিয়ে ডাকাতদলের সবাইকে সহজেই ঘায়েল করে ফেলল। কারণ ডাকাতরা মদ-টদ খেয়ে তখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

তার মা এক কোণে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে হান্‌স্‌-এর শক্তি ও সাহস দেখছিল। ডাকাতদল ঘায়েল হবার পর মায়ের কাছে গিয়ে সে বলল, "এইবার আমাকে আমার বাবার কথা বল।"

তার মা বলল, "হান্‌স্‌ চল, তাকে খুঁজে বার করি।"

তার মা যখন সর্দারের পকেট থেকে দরজার চাবি নিচ্ছিল হান্‌স্‌ তখন একটা ময়দার ছালা এনে সোনা, রুপো আর দামী-দামী জিনিস দিয়ে সেটা ভরল। তার পর ছালাটা কাঁধে ফেলে মায়ের সঙ্গে গুহা ছেড়ে সে বেরুল। অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় এসে গাছপালা-ফুল-লতাপাতা আকাশ আর সূর্য দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল সে। খানিক খোঁজাখুঁজি করে তার মা পথ খুঁজে পেল। তার পর ঘণ্টা কয়েক হেঁটে তারা সেই নির্জন উপত্যকায় পৌঁছল, যেখানে তাদের ছোট্টো কুঁড়ে-ঘরটা ছিল।

দোরগোড়ায় বসেছিল হান্‌স্‌-এর বাবা। তাদের দেখে আনন্দে তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল ঝরতে লাগল। কারণ সে ভেবেছিল তারা আর বেঁচে নেই। বয়স কম হলেও হান্‌স্‌ তখন তার বাবার চেয়ে এক-মাথা লম্বা হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে ঢুকে হান্‌স্‌ তার প্রকাণ্ড ছালাটা বেঞ্চির উপর রাখতে মড়্‌মড়্‌ করে সেটা ভেঙে গেল, তার পর বাড়ির মেঝে ভেদ করে সেটা গিয়ে পড়ল মাটির তলার ঘরে।

তার বাবা বলল, "কী কাণ্ড! বাড়িটাকে যে ভেঙে ফেললি!"

হান্‌স্‌ বলল, "দুর্ভাবনা কোরো না বাবা। ছালাটার মধ্যে এত সোনা-দানা আছে যা দিয়ে অনায়াসে নতুন একটা বাড়ি বানানো যাবে।"

পরের বসন্তকালে তার বাবাকে হান্‌স্‌ বলল, "এই-সব সোনা-দানা রেখে দাও। আমি একটা শক্ত মুগুর বানিয়ে দেশ দেখতে বেরুব।"

মুগুরটা বানিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল আর হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল গহন এক বনে। সেটার মধ্যে ঢুকতে তার কানে এল মড়্‌মড়্‌ শব্দ। চার দিকে তাকিয়ে সে দেখে একটা ফারগাছ আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত দড়ির মতো পাকিয়ে গেছে। চোখ তুলে তাকিয়ে সে দেখে, প্রকাণ্ড একটা লোক সেটাকে এমন ভাবে ঘোরাচ্ছে যেন গাছটা একটা অপলকা ডাল।

হান্‌স্‌ বলল, "ওখানে কী করছ ?"

লোকটা বলল, "গতকাল কিছু কাঠকুটো জোগাড় করেছিলাম। সেগুলো বাঁধার জন্যে আমার একটা দড়ি দরকার।"

হান্‌স্‌ ভাবল, লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান। একে দিয়েই আমার কাজ হবে। তাই তাকে বলল, "গাছ থেকে নেমে আমার সঙ্গে চলো।"

গাছ থেকে নামতে দেখা গেল হান্‌স্‌-এর চেয়েও সে এক-মাথা লম্বা, যদিও হান্‌স্‌ মোটেই বেঁটে ছিল না।

হান্‌স্‌ বলল, "ভবিষ্যতে তোমার নাম হবে 'ফার্‌-পাকিয়ে'।"

খানিক যাবার পর তাদের কানে এল ভয়ঙ্কর একটা গুম্‌গুম্‌ শব্দ। সারা জায়গাটা থর্‌থর্‌ করে উঠছিল। শব্দটার দিকে এগিয়ে তারা দেখে, এক দানব প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাবড়া কিলিয়ে ভাঙছে।

ওরকম করছে কেন হান্‌স্‌ প্রশ্ন করতে দানব বলল, "রাতে ঘুমবার সময় ভালুক, নেকড়ে আর অন্য জন্তু জানোয়ারগুলো ভারি বিরক্ত করে। তাই এমন একটা বাড়ি বানাতে চাই যেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমনো যায়।"

হান্‌স্‌ ভাবল, এ লোকটাও আমার কাজে লাগবে। তাই দানবকে সে বলল, "তোমার বাড়ি বানানো রেখে আমার সঙ্গে চলো। তোমার নাম হবে 'পাথর-ভাঙিয়ে'।"

রাজি হয়ে দানব তাদের সঙ্গে চলল বনের ভিতর দিয়ে। তাদের দেখে আঁতকে উঠে পালাতে লাগল বুনো জন্তু-জানোয়াররা।

সন্ধেয় তারা পৌঁছল পুরনো একটা জনশূন্য কেল্লায়। রাতে তারা ঘুমোল সেই কেল্লার হলঘরে। পরদিন সকালে হান্‌স্‌ গেল সেখানকার পোড়ো বাগানে। নানা আগাছায় সেটা ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বুনো শুয়োর পড়ল তার উপর ঝাঁপিয়ে। কিন্তু চক্ষের নিমেষে মুগুরের এক বাড়িতে হান্‌স্‌ সেটাকে খতম করে দিল। তার পর সেটাকে সেই কেল্লার মধ্যে এনে কেটেকুটে আগুনে ঝলসে তিনজনে মিলে পরম তৃপ্তি করে খেল।

তার পর স্থির হল পালা করে দুজন বেরুবে শিকার করতে আর একজন কেল্লায় থেকে রাঁধবে প্রত্যেকের জন্য পাঁচ সের করে মাংস।

প্রথম দিন ফার্‌-পাকিয়ে রইল বাড়িতে আর হান্‌স্‌ আর পাথর-ভাঙিয়ে বেরুল শিকারের খোঁজে।

ফার্-পাকিয়ে যখন রাঁধছে, শুকনো রোগাটে চেহারার এক বামন হাজির হয়ে মাংস চাইল।

ফার্-পাকিয়ে বলল, "দূর হ, হতভাগা! তোকে আর মাংস খেতে হবে না।" কিন্তু তাকে অবাক করে সেই পুঁচকে চেহারার বামন ছুটে এসে এমন জোরে তাকে ঘুঁষি মারল যে, সে মাটিতে পড়ে খাবি খেতে লাগল। ভীষণ রেগে বামন তাকে আরো ঘা কতক দিয়ে চলে গেল।

অন্য দুজন ফিরতে বামনটার কথা ফার-পাকিয়ে কিছুই বলল না। ভাবল—এদেরও তো বাড়িতে থাকার পালা আসবে; বামনটার হাতে নাজেহাল হয়ে মজাটা টের পাক।

পরদিন রান্নার কাজে পাথর-ভাঙিয়ে রইল বাড়িতে আর মাংস না দেওয়ায় বামনটা তাকেও বেধড়ক পেটাল। বাড়ি ফিরে একবার তাকিয়ে ফার্-পাকিয়ে বুঝল কী ঘটেছে। কিন্তু তারা চেয়েছিল রান্না করতে বাড়িতে থেকে তাদের মতো হান্স্ও যেন খায় উত্তম-মধ্যম। তাই কোনো কথাই হান্স্কে তারা বলল না।

তৃতীয় দিন বাড়িতে থেকে হান্স্ যখন রান্নাবান্না করছে বামনটা যথারীতি হাজির হয়ে মাংস চাইল। হান্স্ ভাবল, বেচারাকে আমার ভাগ থেকে কিছুটা দেওয়া যাক। আমাদের তা হলে কম পড়বে না। তাই তাকে সে দিল এক টুকরো মাংস। সেটা শেষ করে বামন আবার মাংস চাইল। ভালোমানুষ হান্স্ আবার নিজের ভাগ থেকে তাকে দিল আরো খানিকটা মাংস। কিন্তু তৃতীয়বার মাংস চাইতে হান্স্-এর মনে হল বামনটা বেজায় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। তাই তাকে আর দিল না। বামন তখন অন্যদের মতো হান্স্কেও পেটাতে চেষ্টা করল। কিন্তু হান্স্ তাকে দু ঘুঁষিতে ছিট্কে ফেলল কেল্লার সিঁড়িতে। তার পর তার দিকে তেড়ে গিয়ে হান্স্ হুমড়ি খেয়ে পড়ল বামনটার উপর। মাটি থেকে উঠে হান্স্ দেখল দৌড়তে-দৌড়তে বামন প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে। তার পিছন-পিছন ছুটে বনের মধ্যে গিয়ে হান্স্ দেখল বামনটাকে সুড়ুৎ করে একটা গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে। সেই জায়গায় দাগ দিয়ে সে বাড়ি ফিরল।

অন্য দুজন বাড়ি ফিরে হান্স্-এর কিছুই হয় নি দেখে খুব অবাক হল।

বামনটার কথা হান্স্ তাদের বলতে তারাও নিজেদের অভিজ্ঞতার

কথা তাকে বলল। সব শুনে হেসে উঠে হান্‌স্‌ বলল, "স্বার্থপর আর লোভী হবার উচিত শিক্ষা তোমাদের হয়েছে। কিন্তু তোমাদের মতো প্রকাণ্ড চেহারার লোকদের বামনের হাতে মার খাওয়া ভারি লজ্জার কথা।"

তার পর একটা ঝুড়ি আর খানিকটা দড়ি নিয়ে তারা গেল সেই গর্তের কাছে, যার মধ্যে বামনটা অদৃশ্য হয়েছিল। সেই দড়ি আর ঝুড়ির সাহায্যে হান্‌স্‌কে তারা নামিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। নীচে পেঁৗছে সে দেখে, সামনে একটা দরজা। আর দরজাটা ঠেলে খুলতেই সে দেখে, একটা ঘর। সেখানে বসেছিল পরমা সুন্দরী এক মেয়ে। বামনটা বসেছিল তার কাছে। হান্‌স্‌কে দেখে বেড়ালের মতো সে মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

মেয়েটিকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। হান্‌স্‌-এর দিকে মিনতি-ভরা চোখে তাকাতে হান্‌স্‌ স্থির করে ফেলল বামনের হাত থেকে তাকে সে উদ্ধার করবে। তাই সঙ্গে-সঙ্গে বামনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুগুরের এক বাড়িতে তাকে সে শেষ করে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির শেকলের বাঁধন পড়ল খসে। মেয়েটি তখন তাকে বলল, "আমি এক রাজার মেয়ে। এক পাজি জমিদারকে বিয়ে করতে চাই নি বলে

গ্রিম—২-১৮

আমায় বাড়ি থেকে চুরি করে এনে বামনটার পাহারায় এই অন্ধকার গর্তে সে বন্দী করে রেখেছিল। বামনটা আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছে।"

হান্স্ তখন রাজকন্যেকে ঝুড়িতে বসিয়ে সঙ্গীদের বলল তাকে টেনে তুলতে। কিন্তু তাকে তোলবার জন্য ঝুড়িটা তারা নামাতে সেটায় উঠতে হান্স্-এর ভরসা হল না। বামনটার কথা আগে তাকে জানায় নি বলে লোকদুটোর উপর বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলেছিল। তাই ঝুড়ির মধ্যে নিজে না উঠে সেখানে সে রেখে দিল তার মুগুরটা। নিজে না উঠে সে ভালোই করেছিল! কারণ তার বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীরা সেটা মাঝ বরাবর টেনে তুলে দিল দুম্ করে ফেলে। ঝুড়িতে থাকলে নির্ঘাত সে পড়ে মরত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল—সে করে কী? এই গর্তের তলা থেকে বেরুবার কোনো উপায় সে দেখতে পেল না।

ঘুরতে-ঘুরতে আবার সেই ঘরটায় সে গেল, রাজকন্যে যেখানে বন্দিনী ছিল। বামনটার আঙুলে একটা আংটি চক্‌চক্ করতে দেখে সেটা খুলে নিজের আঙুলে পরল সে। তার পর সেটা খোলার জন্য যেই-না সে পাক দিয়েছে, অমনি শুনতে পেল শূন্যে একটা সোঁ-সোঁ শব্দ। উপরে তাকিয়ে সে দেখে, একটা ভূত বাতাসে ভাসছে। ভূত জানাল—সে তার দাস। তার পর জানতে চাইল, সে কী চায়। ভূতকে দেখে প্রথমটায় হান্স্ আঁতকে উঠেছিল। তার পর সামলে নিয়ে হান্স্ আদেশ দিল, তাকে উপরে তুলে আনতে। সঙ্গে-সঙ্গে ভূতটা তাকে গর্তের বাইরে এনে মাটিতে নামিয়ে দিল। বেরিয়ে এসে হান্স্ দেখল কেউ সেখানে নেই। কেল্লার মধ্যেও কারুর দেখা সে পেল না। রূপসী রাজকন্যেকে নিয়ে ফার্-পাকিয়ে আর পাথর-ভাঙিয়ে দিয়েছিল চম্পট।

হান্স্ তখন তার আঙুলের আংটিতে আবার পাক দিতে সঙ্গে-সঙ্গে ভূতটা হাজির হয়ে জানাল রাজকন্যেকে নিয়ে তারা পালাচ্ছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। হান্স্ তখন ছুটতে-ছুটতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে দেখে, অনেক দূরে ছোট্টো একটা নৌকোয় চেপে রাজকন্যেকে নিয়ে পালাচ্ছে তার বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীরা।

তাই-না দেখে ভীষণ রেগে মুগুরটা নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে হান্স্ শুরু করল সাঁতরাতে। কিন্তু মুগুরের ভারে সে ক্রমশ তলিয়ে যেতে

লাগল। কপালগুণে ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল জাদুর আংটিটার কথা। সেটা ঘোরাতে সঙ্গে-সঙ্গে ভূতটা হাজির হয়ে তার আদেশে বিদ্যুৎ-গতিতে হান্স্‌কে পৌঁছে দিল নৌকোয়। হান্স্‌ তখন তার মুগুর দিয়ে বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীদের পিটিয়ে ছাতু করে, ফেলে দিল সমুদ্রে। আতঙ্কে রাজকন্যের প্রায় তখন আধমরা অবস্থা। তাকে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড় টানতে-টানতে সে পৌঁছল তীরে।

আর তার কিছুদিন পরেই হান্স্‌-এর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রাজকন্যের। তার পর আজীবন তারা রইল সুখে শান্তিতে।

গ্রেইফ পাখি

এক সময় এক রাজা ছিলেন। কিন্তু কী তাঁর নাম আর কোথায়ই-বা তিনি রাজত্ব করতেন সে কথা জানি না। তাঁর ছেলে ছিল না। ছিল একটি মাত্র মেয়ে। সব সময়েই সে অসুখে ভুগত। কোনো ডাক্তার তাকে সারাতে পারে নি।

এক জ্যোতিষী তখন বলে, বিশেষ এক ধরনের আপেল খেলে পর রাজকন্যে সেরে উঠবে। তাই রাজা ঘোষণা করলেন—এমন আপেল যে লোক আনতে পারবে যেটা খেলে রাজকন্যের অসুখ সারে, তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন।

এক চাষীর ছিল তিন ছেলে। বড়ো ছেলেকে সে বলল, "বাগানে গিয়ে সব চেয়ে ভালো ভালো আপেল পেড়ে ঝুড়ি করে কেল্লায় নিয়ে যা। সেগুলো খেলে হয়তো রাজকন্যের অসুখ সারবে। তা হলে তাকে বিয়ে করে তুই রাজা হবি।"

চাষীর কথামতো বড়ো ছেলে আপেল পেড়ে চলল কেল্লার দিকে। পথে তার সঙ্গে এক বুড়োর দেখা। সে জানতে চাইল—ঝুড়িতে কী আছে।

বড়ো ছেলের নাম উল্‌রিচ। সে বলল, "ব্যাঙ।"

"তাই যেন হয়," বলে বুড়ো চলে গেল।

কেল্লায় পৌঁছে দ্বাররক্ষীকে উল্‌রিচ বলল তাকে ঢুকতে দিতে। কারণ সে এক ঝুড়ি এমন আপেল এনেছে যেগুলো খেলে রাজকন্যের অসুখ সারবে। কথাটা শুনে খুব খুশি হয়ে রাজা ডেকে পাঠালেন উল্‌রিচকে।

কিন্তু, হায় হায়, ঝুড়ি খুলতে দেখা গেল সেটার মধ্যে রয়েছে শুধুই ব্যাঙ! ভীষণ চটে সঙ্গে-সঙ্গে রাজা আদেশ দিলেন উল্‌রিচকে কেল্লা থেকে দূর করে দিতে। বাড়ি ফিরে উল্‌রিচ চাষীকে সব কথা জানাল।

চাষী তখন পাঠাল তার মেজো ছেলেকে। তার নাম স্যাম্‌। কিন্তু সেও সফল হল না। পথে তার সঙ্গে দেখা হল সেই বুড়োর। সে জানতে চাইল—ঝুড়িতে কী আছে।

স্যাম্‌ বলল, "কাঁকড়া।"

"তাই যেন হয়", বলে বুড়ো চলে গেল।

কেল্লায় পৌঁছে দ্বাররক্ষীকে স্যাম্‌ বলল, এক ঝুড়ি এমন আপেল এনেছে যেগুলো খেলে রাজকন্যের অসুখ সারবে।

দ্বাররক্ষী বলল, একবার তারা ঠকেছে। দ্বিতীয়বার ঠকতে রাজি নয়।

কিন্তু স্যাম্‌ জোর দিয়ে বার বার বলতে লাগল, তার ঝুড়িতে আপেল ছাড়া অন্য কিছু নেই। তাই শেষপর্যন্ত তাকে তারা ঢুকতে দিল। রাজার সামনে ঝুড়িটা খোলা হতে কিন্তু দেখা গেল, সেটার মধ্যে রয়েছে শুধুই কাঁকড়া। ভীষণ রেগে রাজা আদেশ দিলেন চাবুক মেরে স্যাম্‌কে কেল্লা থেকে দূর করে দিতে।

বাড়ি ফিরে স্যাম্‌ চাষীকে জানাল তার হেনস্থার কথা।

চাষীর ছোটো ছেলেকে লোকে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল, "বোকা হান্‌স্‌।" সে তখন তার বাবাকে বলল, এক ঝুড়ি আপেল নিয়ে কেল্লায় যাবে।

চাষী চেঁচিয়ে উঠল, "তাই নাকি! ভাইরা যা পারে নি তোর মতো বোকা সেটা পারবে?"

কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো গোঁ ধরে বার বার হান্‌স্‌ বলতে লাগল তাকে যেতে দিতে।

তার বাবা বলল, "শোন্‌, বোকা! আরো খানিকটা বুদ্ধি গজান পর্যন্ত সবুর কর। এখন আমায় আর জ্বালাস নে।"

কথাগুলো বলে বেজায় বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে চাষী যখন সেখান থেকে চলে যেতে যাবে, তার কোটের পিছন দিক চেপে ধরে মিনতি করে হান্‌স্‌ বলল, "বাবা, যাবার আমার ভারি ইচ্ছে। দয়া করে অনুমতি দাও।"

হাল ছেড়ে দিয়ে চাষী তখন বলল, "বেশ, যা। কিন্তু তোর ভাইদের চেয়ে তোকে ওরা যে অনেক বেশি অপমান করবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

যাবার অনুমতি পেয়ে মনের আনন্দে হান্‌স্ নেচে বেড়াতে লাগল।

তাই দেখে চাষী বলল, "তোকে নেচে বেড়াতে দেখলেই বোঝা যায় কী রকম তুই বোকা। এতটা যে বোকা, ভাবি নি!"

কিন্তু তার বাবার কথা শুনে হান্‌স্ একটুও দমে গেল না। সকালের কথা ভাবতে ভাবতে মনের আনন্দে শুয়ে পড়ল সে। প্রথমটায় তার ঘুম এল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল রূপসী রাজকন্যে, চোখ ধাঁধানো দুর্গ আর সোনা রুপো জহরতের। পরের দিন ভোর ভোর উঠে, আপেল পেড়ে সে যাত্রা করল রাজার কেল্লার উদ্দেশে। যে বুড়োর সঙ্গে তার ভাইদের দেখা হয়েছিল, যেতে যেতে হান্‌স্-এরও দেখা হল তার সঙ্গে। বুড়ো জানতে চাইল তার ঝুড়িতে কী আছে। সঙ্গে-সঙ্গে হান্‌স্ উত্তর দিল, "রাজকন্যের অসুখ সারাবার আপেল।"

বুড়ো আন্তরিকভাবে বলে উঠল, "তাই যেন হয়।"

কেল্লায় পৌঁছতে কেউই অবশ্য তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল না। কারুরই বিশ্বাস হল না তার ঝুড়িতে আপেল আছে। প্রহরীরা বলল, "আগেও দুজন এখানে এসেছিল। কিন্তু রাজার কাছে ঝুড়ি ভর্তি ব্যাঙ আর কাঁকড়া এনে তাঁকে তারা অপমান করেছে।"

হান্‌স্ তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল—রাজাকে অপমান করার কথা স্বপ্নেও সে ভাবে নি, বাস্তবিকই এনেছে তাদের রাজত্বের সব চেয়ে সেরা আপেল। হান্‌স্-এর সরল মুখ দেখে আর কথার আন্তরিক সুর শুনে শেষপর্যন্ত কারুরই মনে হল না যে, সে মিথ্যে কথা বলছে। তাই তাকে তারা নিয়ে গেল রাজার কাছে। আর ঝুড়ি খুলে রাজা দেখলেন বাস্তবিকই সেখানে রয়েছে রসালো আর গোলাপী রঙের অনেক আপেল। খুব খুশি হয়ে কয়েকটা আপেল তক্ষুনি রাজা পাঠালেন রাজকন্যের কাছে। খানিক পরে ভৃত্যরা দৌড়ে এসে জানাল আপেল খাবার পরই রাজকন্যের সব অসুখ সেরে গেছে। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রাজকন্যে নিজে সেখানে হাজির হয়ে বলল, "বাবা, আপেলে একটা কামড় দিতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বিছানা থেকে আমি লাফিয়ে উঠেছি।"

রাজা খুব খুশি হলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে হান্‌স্‌-এর সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে দিতে মন তাঁর সরলো না। তিনি তাকে বললেন, "প্রথমে আমার জন্যে এমন একটা নৌকো বানিয়ে দিতে হবে যেটা জলে-স্থলে পাল তুলে যেতে পারে।"

হান্‌স্‌ বলল, নিশ্চয়ই সেরকম একটা নৌকো সে বানিয়ে দেবে। তার পর বাড়ি ফিরে জানাল সব ঘটনার কথা।

সঙ্গে-সঙ্গে উল্‌রিচকে চাষী বনে পাঠাল নৌকোটা বানাতে। কখনো শিস্‌ দিতে দিতে, কখনো গান গাইতে গাইতে সে শুরু করে দিল কাজ।

দুপুর নাগাদ রোদ যখন সব চেয়ে কড়া সেই বুড়ো সেখানে হাজির হল, কেল্লায় আপেল নিয়ে যাবার সময় যার সঙ্গে তার প্রথম দেখা।

বুড়ো প্রশ্ন করল, "কী বানাচ্ছ?"

উল্‌রিচ জবাব দিল, "কাঠের চামচে।" আর কাজ শেষ হতে সে দেখে সত্যিই বানিয়েছে এক জোড়া কাঠের চামচ।

পরদিন স্যাম্‌ গেল বনে। উল্‌রিচের বেলায় যা ঘটেছিল তার বেলাতেও ঘটল একই ঘটনা।

তৃতীয় দিন বোকা হান্‌স্‌ গেল বনে। খুশি মনে খুব পরিশ্রম করে সে কাজ করে চলল। দুপুর নাগাদ রোদ যখন সব চেয়ে কড়া, সেই বুড়ো সেখানে হাজির হয়ে প্রশ্ন করল, কী সে বানাচ্ছে।

"এমন নৌকো বানাচ্ছি জলে-স্থলে পাল তুলে যেটা যেতে পারে। সেটা বানাতে পারলে রাজকন্যের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে আর শেষপর্যন্ত হয়তো রাজা হব।"

"তাই যেন হয়," বলে বুড়ো লোকটি চলে গেল।

আর সন্ধে নাগাদ শেষ হল সেই নৌকো আর সেটার আনুষঙ্গিক সব-কিছু। সেটায় পাল তুলে হান্‌স্‌ চলল শহরে।

রাজা দেখলেন তাকে আসতে। কিন্তু তখনো রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে দিতে মন তাঁর সরলো না।

হান্‌স্‌কে রাজা বললেন, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একশোটা খরগোশ তাকে পাহারা দিতে হবে। একটা খরগোশ পালালেও রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে তিনি দেবেন না।

সঙ্গে-সঙ্গে খরগোশগুলো নিয়ে হান্‌স্‌ বেরিয়ে পড়ল। এত সাবধানে সে পাহারা দিতে লাগল যে, একটা খরগোশও পালাতে পারল না। তাই

দেখে একটা খরগোশ চেয়ে আনার জন্য রাজা পাঠালেন তাঁর এক ভৃত্যকে। ভৃত্য এসে বলল, হঠাৎ অনেক অতিথি এসে পড়েছে। তাই ডিনারের জন্য একটা খরগোশ দরকার।

কিন্তু হান্‌স্ বুঝল কথাটা সত্যি নয়। তাই ভৃত্যকে সে বলল, "রাজাকে বল গে, আজ খরগোশের মাংস রান্না না করিয়ে, কাল করাতে।"

ভৃত্য কিন্তু খরগোশ না নিয়ে যেতে কিছুতেই রাজি হল না। শেষটায় হান্‌স্ বলল, "রাজকন্যে নিজে এলে তাকে একটা খরগোশ দেব।"

ভৃত্য চলে গেলে সেই বুড়ো হাজির হয়ে প্রশ্ন করল, কী সে করছে।

হান্‌স্ বলল, "একশোটা খরগোশ পাহারা দিচ্ছি। কোনো খরগোশ পালালে রাজকন্যের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না।"

বুড়ো বলল, "এই বাঁশিটা নাও। কোনো খরগোশ পালালে বাঁশি বাজিয়ো। সঙ্গে-সঙ্গে সেটা ফিরে আসবে।

রাজকন্যে আসতে রুমালে একটা খরগোশ জড়িয়ে হান্‌স্ তাকে দিল। সেটা নিয়ে একশো গজও রাজকন্যে যায় নি, এমন সময় হান্‌স্ বাজাল তার বাঁশি। আর সঙ্গে-সঙ্গে কিল্‌বিল্ করে রুমাল থেকে বেরিয়ে হান্‌স্-এর কাছে দৌড়ে ফিরে এল খরগোশটা।

রাত হবার আগে বাঁশি বাজিয়ে হান্‌স্ দেখে নিল সব খরগোশ আছে কি না। তার পর তাদের তাড়িয়ে সে নিয়ে এল কেল্লায়।

একটা খরগোশও না হারিয়ে একশোটা খরগোশ হান্‌স্ পাহারা দিতে পেরেছে দেখে রাজা খুবই অবাক হলেন। তবু আর-একটা কাজ না করতে পারা পর্যন্ত রাজকন্যের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে তিনি রাজি হলেন না। তিনি তাকে বললেন, গ্রেইফ নামে একটা পাখির লেজের একটা পালক নিয়ে আসতে।

পাখির পালকটা আনার জন্য হান্‌স্ বেরিয়ে পড়ল। রাতে আশ্রয়ের জন্য সে গেল একটা কেল্লায়, কারণ তখনকার দিনে সরাইখানা ছিল না।

কেল্লার মালিকের সঙ্গে দেখা করে রাতের জন্য সে আশ্রয় চাইল। মালিক জানতে চাইল কোথায় সে চলেছে। হান্‌স্ বলল, "গ্রেইফ পাখির খোঁজে।"

কেল্লার মালিক বলল, "তাই নাকি, গ্রেইফ পাখির খোঁজে চলেছ? শুনেছি পাখিটা সব-কিছু জানে। সিন্দুকের চাবিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে তাকে জিগেস করবে—চাবিটা কোথায়?"

হান্স্ বলল, "নিশ্চয়।"

পরদিন ভোরে সে আবার যাত্রা করল আর সে রাতে আশ্রয় নিল আর-একটা কেল্লায়। সেখানকার লোকরা যখন শুনল সে চলেছে গ্রেইফ পাখির খোঁজে, তাদের একজন বলল তার মেয়ে অসুস্থ, কিছুতেই তাকে সারাতে পারছে না। দয়া করে গ্রেইফ পাখিকে সে কি জিগেস করবে, কী করলে তার মেয়ে আবার ভালো হয়ে উঠবে?

নিশ্চয় জিগেস করবে বলে কথা দিয়ে হান্স্ আবার বেরিয়ে পড়ল। যেতে-যেতে সে পৌঁছল প্রকাণ্ড একটা হ্রদের সামনে। সেখানে খেয়া-তরীর বদলে লম্বা-চওড়া জোয়ান একটা লোক কাঁধে করে লোকজনদের পারাপারের কাজ করছিল। লোকটা হান্স্‌কে প্রশ্ন করল—কোথায় সে চলেছে।

হান্স্ উত্তর দিল, "গ্রেইফ পাখির কাছে।"

সে বলল, "তার সঙ্গে দেখা হলে জিগেস কোরো, কেন আমাকে লোকজনদের কাঁধে করে পারাপার করতে হয়।"

হান্স্ বলল, "নিশ্চয় জিগেস করব।"

লোকটা তাকে কাঁধে করে হ্রদের অন্য পারে নিয়ে গেল আর তার খানিক পরেই হান্স্ পৌঁছল গ্রেইফ পাখির কেল্লায়। পাখিটা তখন সেখানে ছিল না। ছিল তার বউ। হান্স্‌কে সে প্রশ্ন করল—কী চায়।

হান্স্ তাকে বলল সব কথা। প্রথমত, সে চায় গ্রেইফ পাখির লেজের একটা পালক; দ্বিতীয়ত, জানতে চায় কোথায় একটা সিন্দুকের হারিয়ে-যাওয়া চাবিটা আছে; তৃতীয়ত, কী করলে সেই কেল্লার অতিথির মেয়ের অসুখ সারে; চতুর্থত, কেন লম্বা-চওড়া জোয়ান লোকটাকে কাঁধে করে লোকজনদের পারাপার করতে হয়।

গ্রেইফ পাখির বউ বলল, "ভাই, গ্রেইফ পাখির কাছ থেকে সোজাসুজি কেউ কোনো কথা বার করতে পারে না। সবাইকে সে গালিগালাজ করে। কিন্তু উত্তরগুলো জানতে চাও তো তার খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ো। অঘোরে সে ঘুমিয়ে পড়লে তার লেজের একটা পালক ছিঁড়ে নিয়ো। অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর আমিই তাকে জিগেস করব।"

রাতে গ্রেইফ পাখি ফিরেই বলল, "বউ, ঘরে একটা মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।"

তার বউ বলল, "ঠিকই বলেছ। একটা লোক এসেছিল। কিন্তু এইমাত্র চলে গেছে।"

পাখিটা আর কোনো কথা বলল না।

মাঝরাতে হান্‌স্‌ শুনল পাখিটাকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে। তাই সাহস করে তার লেজের একটা পালক সে ছিঁড়ে নিল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতে পাখিটা চেঁচিয়ে উঠল, "বউ, একটা মানুষের গন্ধ স্পষ্ট পাচ্ছি। কে যেন আমার ল্যাজ ধরে টানছিল।"

তার বউ বলল, "নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলে। আগেই বলেছি, একটা লোক এসেছিল। কিন্তু সে তো চলে গেছে। লোকটা একটা সিন্দুকের হারিয়ে-যাওয়া চাবির কথা বলছিল। কেউ সেটা খুঁজে পাচ্ছে না।"

গ্রেইফ পাখি চেঁচিয়ে বলল, "মুখ্যুর ঝাড়! চাবিটা আছে কাঠের বাড়ির দরজার পেছনে একটা গাছের গুঁড়ির নীচে।"

"লোকটা আরো বলছিল একটা লোক কিছুতেই তার মেয়ের অসুখ সারাতে পারছে না।"

"মুখ্যুর ঝাড়! সিঁড়ির তলায় মাটির নীচেকার ঘরে মেয়েটার চুল দিয়ে একটা পাখি বাসা বানিয়েছে। চুলগুলো ফেরত পেলে মেয়েটা সেরে উঠবে।"

"লোকটা কোথাকার এক লম্বা-চওড়া জোয়ান লোকের কথা বলছিল। তাকে কাঁধে করে লোকজনদের হ্রদ পারাপার করতে হয়। লোকটা জানতে চেয়েছে, এ-কাজ বাধ্য হয়ে তাকে কেন করতে হচ্ছে।"

"লোকটা গাধা! কোনো একজনকে হ্রদের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই তাকে আর কাউকে কাঁধে করে পারাপার করতে হবে না।"

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে গ্রেইফ পাখি বেরিয়ে গেল। পালকটা আর তার প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে মনের আনন্দে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল হান্‌স্‌।

কিন্তু গ্রেইফ-এর বউ প্রশ্নগুলোর উত্তর তাকে আর-এক বার শুনিয়ে দিল, যাতে সে ভুলে না যায়। তার পর তার কাছ থেকে বিদায় নিল হান্‌স্‌।

প্রথমে সে পৌঁছল হ্রদের তীরে সেই জোয়ান লোকটার কাছে। সে প্রশ্ন করল গ্রেইফ পাখি তার সম্বন্ধে কী বলেছে।

হান্‌স্ বলল, "আমাকে ওপারে নিয়ে চল। তার পর বলছি।'

লোকটা কাঁধে করে অন্য পারে পৌঁছে দিলে হান্‌স্ তাকে বলল কোনো একজনকে হ্রদের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই সে মুক্তি পাবে।

লোকটা খুব খুশি হয়ে বলল, কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে হান্‌স্‌কে কাঁধে করে আবার ওপারে নিয়ে যাবে। হান্‌স্ বলল, "না, ধন্যবাদ। আমি ঠিক পারেই পৌঁচেছি। এপারেই থাকতে চাই।"

তার পর হানস পৌঁছল সেই দুর্গটায়, যেখানকার এক অতিথির মেয়ের অসুখ কিছুতেই সারছিল না।

হান্‌স্ তাকে মাটির নীচের ঘরে পাখির বাসাটা দেখিয়ে দিল আর চুলগুলো ফিরে পাবার সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মেয়েটি লাফিয়ে বেরিয়ে এল বিছানা থেকে। মেয়েটির মা-বাবা হান্‌স্‌কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাল আর দিল রাশি রাশি উপহার।

সেখান থেকে সে যাত্রা করল খুব ধনী হয়ে। তার পর সেই কেল্লাতে সে পৌঁছল যেখানকার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গিয়েছিল। সেই কাঠের বাড়িতে সোজা গিয়ে চাবিটা বার করে আনল হান্‌স্।

কেল্লার মালিক খুব খুশি হয়ে হান্‌স্‌কে দিল রাশি রাশি মোহর।

প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে রাজার কাছে হান্‌স্ পৌঁছতে রাজার খুব হিংসে হল। তিনি জানতে চাইলেন, অত ধনরত্ন কোথায় সে পেয়েছে।

রাজাকে হান্‌স্ বলল—সব-কিছু তাকে দিয়েছে গ্রেইফ পাখি। লোভী রাজা ভাবলেন, গ্রেইফ পাখির সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব পাতাবেন। যাত্রা করে প্রথম পৌঁছলেন তিনি সেই খেয়াঘাটে। কিন্তু হ্রদের মাঝখানে ডুবে তাঁকে মরতে হল।

আর তার পর হান্‌স্ বিয়ে করল রাজকন্যেকে আর নিজেই হল রাজা।

দক্ষ শিকারী

এক সময় এক তরুণ তালা সারাবার কাজ শিখেছিল। একদিন বাবাকে সে বলল নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সে বেরিয়ে পড়বে। তার বাবার আপত্তি হল না। যাত্রার সময় ছেলেকে সে দিল কিছু টাকাকড়ি।

নানা দেশ ঘুরে কাজের খোঁজ সে করে চলল। কিছুকাল পর তার আর তালা সারাবার পেশা ভালো লাগল না। ভাবল শিকারী হবে। একদিন সবুজ পোশাক-পরা এক বনকর্মীর সঙ্গে তার দেখা। বনকর্মী জানতে চাইল—কোথায় তার দেশ আর কী-ই বা সে করতে চায়। তরুণ জানাল, তালা সারানো তার পেশা। কিন্তু কাজটা তার আর ভালো লাগছে না। খোলামেলা জায়গায় সে কাজ করতে চায়। বনকর্মীকে সে প্রশ্ন করল, "আমায় একটা কাজ দেবে?"

বনকর্মী বলল, "নিশ্চয়ই।"

তরুণ তাই তার সঙ্গে রয়ে গেল। আর কয়েক বছরের মধ্যেই শিকারের ব্যাপারে হল রপ্ত। বনকর্মীর কাজে বিদায় নেবার সময় তরুণকে সে দিল এমন একটা বন্দুক যেটার টিপ্ কখনো ফসকায় না।

বিদায় নিয়ে যেতে যেতে তরুণ পৌঁছল গহন এক বনে। দিনের পর দিন সেখানে সে হাঁটে। কিন্তু বনটা আর শেষ হয় না। বুনো জন্তুর নাগালের বাইরে থাকার জন্য রাত কাটায় সে গাছে চড়ে। এক রাতে তার নজরে পড়ল—দূরে একটা আলো চিক্‌চিক্ করছে। পাতার ফাঁক দিয়ে সে উঁকি মেরে ভালো করে দেখে নিল কোথা থেকে আলোটা

আসছে। তার পর গাছ থেকে নেমে সে চলল সেই আলোর দিকে।

যত সে এগোয় ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই আলো। বেশ খানিকটা যাবার পর সে দেখল এক জায়গায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে আর সেই আগুন ঘিরে তিনটে দৈত্য শিকে বিঁধিয়ে ঝলসাচ্ছে একটা ষাঁড়কে।

একটা দৈত্য বলল, "চেখে দেখি মাংসটা ঠিকমতো ঝলসেছে কি না।" এই-না বলে এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে যেই-না সে মুখে তুলতে যাবে, তরুণ শিকারী বন্দুক ছুঁড়ে সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত থেকে সেটা উড়িয়ে দিল। দৈত্য চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, কী কাণ্ড! হাওয়ার এক ঝট্‌কায় মাংসের টুকরোটা যে উড়ে গেল।"

আবার আর-এক টুকরো মাংস সে মুখে তুলল। তার ঠোঁট থেকে সেটাকেও উড়িয়ে দিল শিকারী। পাশের দৈত্যের কান মলে দিয়ে ভীষণ রেগে সে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার মাংসের সব টুকরো টাকরাগুলো নিয়ে-নিয়ে কী ইয়ার্কি হচ্ছে?"

সেই দৈত্য বলল, "আমি নিই নি। এটা এক আশ্চর্য নিশানদারের কাণ্ড।"

প্রথম দৈত্য আবার গেল মাংস খেতে। কিন্তু দৈত্যের হাত থেকে শিকারী সে-টুকরোটাও দিল উড়িয়ে। এই ঘটনার পর দৈত্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে উঠল, "এমন কাণ্ড যে করতে পারে তার হাতের নিশানা নিশ্চয়ই আশ্চর্য ভালো! লোকটাকে আমরা কাজে লাগাব।" এই-না বলে তারা হাঁক ছাড়ল, "ওহে নিশান্‌দার! এখানে এসো। আমাদের আগুনের পাশে বসে খাওয়া-দাওয়া কর। না খেলে জোর করে তোমায় গেলাব।"

শিকারী তখন তাদের কাছে গিয়ে বলল, "আমি দক্ষ শিকারী। আমার টিপ্ কখনো ফসকায় না।" তার কথা শুনে তারা বলল, "আমাদের দলে যোগ দাও। বনের কিনারে একটা হ্রদের পাশে এক দুর্গের মধ্যে রূপসী এক রাজকন্যে আছে। তাকে আমরা চুরি করতে চাই।"

শিকারী বলল, "খুব ভালো কথা। তোমাদের আমি সাহায্য করব।"

তারা বলল, "কিন্তু একটা মুশকিল আছে। দুর্গটার কাছে কেউ গেলেই ছোট্টো একটা কুকুর তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে দেয়। ফলে সেখানকার সবাই জেগে ওঠে। তাই এ-পর্যন্ত আমরা দুর্গের মধ্যে যেতে পারি নি। কুকুরটাকে গুলি করে মারতে পার?"

শিকারী বলল, "নিশ্চয়ই। এটা তো নেহাত ছেলেখেলা।"

এই-না বলে একটা নৌকোয় চেপে হ্রদ পার হয়ে শিকারী তীরে নামতে যাবে, এমন সময় সেই ছোট্টো কুকুরটা তারস্বরে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে এল তেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শিকারী গুলি করে সেটাকে মেরে ফেলল। হ্রদের অন্য পার থেকে ঘটনাটা দেখে খুব খুশি হয়ে দৈত্যরা ভাবল—এবার তারা রাজকন্যেকে চুরি করতে পারবে। কিন্তু শিকারী স্থির করেছিল নিজে আগে গিয়ে সরেজমিনে সব-কিছু দেখবে। তাই দৈত্যদের সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি ইশারা না করা পর্যন্ত তোমরা লুকিয়ে থাকো।"

তার পর সে গেল দুর্গের মধ্যে। দুর্গের ভিতরটা কবরের মতো স্তব্ধ। সবাই সেখানে ঘুমিয়ে। প্রথম ঘরে গিয়ে সে দেখে সেখানকার দেয়ালে

থেকে ঝুলছে রুপোর একটা তরোয়াল। সেটার উপর সোনালী একটা তারা আর রাজার নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা। কাছের একটা টেবিলে ছিল শীলমোহর করা একটা চিঠি। খাম ছিঁড়ে সে দেখল চিঠিতে লেখা আছে: "এই তরোয়াল যার কাছে থাকবে জীবনে যা চাইবে তাই সে পাবে।" তাই দেয়াল থেকে তরোয়ালটা নিয়ে সে নিজের কোমরে আঁটল। তার পর রাজকন্যে যে-ঘরে ঘুমিয়েছিল সেই ঘরে পৌঁছল। ভারী রূপসী এই রাজকন্যে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, 'এরকম নিষ্পাপ রাজকন্যেকে কী করে আমি হিংস্র দৈত্যদের হাতে তুলে দিই?' তার পর এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সে দেখতে পেল খাটের তলায় এক জোড়া চটি রয়েছে—ডান-পাটিতে ছুঁচের কারুকাজ করা রাজার নামের আদ্যক্ষর আর একটা তারা আঁকা; বাঁ-পাটিতে রাজকন্যের নাম আর একটা তারা। রাজকন্যের গলায় জড়ানো রেশমের মস্ত একটা রুমাল। তার ডান দিকে রাজার আর বাঁ দিকে রাজকন্যের নাম সোনার সুতোয় লেখা। একটা কাঁচি নিয়ে শিকারী রুমালটার ডান কোণ কেটে তার ঝুলিতে ভরল। তার পর তার ঝুলিতে ভরল রাজার নামের আদ্যক্ষর লেখা রাজকন্যের ডান-পাটি চটিটা।

সব শেষে সে কেটে নিল রাজকন্যের ঘুমের পোশাকের ছোট্টো একটা অংশ। রাজকন্যে শান্তিতে যেমন ঘুমুচ্ছিল সেইরকম ঘুমোতে লাগল। তার পর পা টিপে-টিপে বেরিয়ে সে দেখে বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে দৈত্যরা। তারা ভেবেছিল রাজকন্যেকে সে সঙ্গে নিয়ে আসবে। ইশারায় দৈত্যদের সে বলল ভিতরে আসতে, জানাল রাজকন্যেকে সে ধরেছে। তার পর এমন ভান করল—যেন ফটকের পাল্লাগুলো সে খুলতে পারছে না। ইশারায় দৈত্যদের সে বলল একটা গর্ত দিয়ে গুঁড়ি মেরে আসতে। প্রথম দৈত্য গর্তে মাথা গলাতেই চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটা টেনে এনে সেই রুপোর তরোয়াল দিয়ে তার মুণ্ডু সে কেটে ফেলল তার পর টেনে আনল তার ধড়টা। অন্য দুজন দৈত্যকেও এইভাবে নিকেশ করে তাদের জিভ কেটে নিজের ঝুলিতে ভরে দুর্গ থেকে সে চলে গেল। দৈত্যদের হাত থেকে রাজকন্যেকে বাঁচাতে পেরেছে বলে মনে তখন তার বেজায় ফুর্তি। সে ভাবল, 'বাড়ি ফিরে বাবাকে এই জিনিস-গুলো আগে দেখাই। তার পর ভাগ্যের খোঁজে আবার বেরুনো যাবে।'

ঘুম ভাঙার পর রাজা দেখলেন তাঁর হলঘরে তিনটে দৈত্য মরে পড়ে আছে। রাজকন্যের শোবার ঘরে গিয়ে তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "জানিস—দৈত্যদের কে মেরেছে?" রাজকন্যে বলল, "না বাবা। আমি অঘোরে ঘুমচ্ছিলাম। কোনো শব্দ শুনি নি।"

তার পর বিছানা থেকে উঠে রাজকন্যে দেখে, তার এক-পাটি চটি নেই। দেখে, তার রেশমী রুমালের ডান কোণ আর ঘুমের পোশাকের একটা অংশ কাটা। রাজসভায় সব সভাসদদের ডেকে রাজা জানতে চাইলেন—দৈত্যদের মেরে কে তার মেয়েকে রক্ষা করেছে।

সেনাপতির মুখটা কুৎসিত। একটা চোখ কানা। সে বলল, দৈত্যদের সে-ই মেরেছে। রাজা বললেন, এই কাজের পুরস্কার হিসেবে রাজকন্যের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। রাজকন্যে কিন্তু জানিয়ে দিল সেনাপতিকে বিয়ে করার চেয়ে দুর্গ ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাবে। রাজা বললেন, সেনাপতিকে বিয়ে না করলে রাজপোশাক খুলে তাকে চাষী-মেয়ের পোশাক পরতে হবে। আর তার পর চিনে-মাটির বাসনের দোকানে গিয়ে হাঁড়ি-কুড়ি বাসন-কোসন ধার করে পথে-পথে হবে ফেরি করে বেড়াতে।

রাজকন্যে তাই তার সুন্দর পোশাক খুলে চাষীমেয়ের পোশাক পরে গেল এক চিনেমাটির বাসনের দোকানে।

সেখান থেকে কিছু বাসন-কোসন ধার করে রাজকন্যে বলল, সেগুলো বিক্রি করে সন্ধেয় দাম চুকিয়ে দেবে। তার পর সেগুলো বিক্রি করার জন্য পথের এক মোড়ে গিয়ে সে বসল।

কিন্তু রাজা এক চাষীকে আদেশ দিলেন তার গোরুর গাড়ি রাজ-কন্যের সওদার উপর দিয়ে চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে। চিনেমাটির বাসন-কোসন গুঁড়িয়ে যেতে হাপুস্ নয়নে কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যে বলতে লাগল, "হায়-হায়! কী করে এখন চিনেমাটির বাসনের দোকানের দাম চুকিয়ে দিই?"

রাজা ভাবলেন, তাঁর মেয়ে এবার সেনাপতিকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেনাপতিকে বিয়ে না করে সেই দোকানে গিয়ে আরো কিছু বাসন-কোসন রাজকন্যে ধার চাইল। দোকানের মালিক বলল, "না, আগে তোমায় অন্য জিনিসগুলোর দাম চুকিয়ে দিতে হবে।"

রাজকন্যে তখন তার বাবার কাছে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বলল,

"বাবা, পৃথিবীর অপর প্রান্তে আমাকে চলে যেতে দাও।"

কিন্তু রাজা বললেন, "তোর জন্যে বনে ছোট্টো একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে দিচ্ছি। সেখানে বাকি জীবন তোকে কাটাতে হবে। যে সেখানে আসবে তাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াবি। কিন্তু তার দরুন টাকাকড়ি নিতে পারবি না।" সেই কুঁড়েঘর বানানো হলে সেখানে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, "আজ ধার, কাল নগদ।"

সেই কুঁড়েঘরে রাজকন্যে কাটাল অনেকদিন। চার দিকে খবর রটে গেল—বনে একটি মেয়ে আছে বিনা পয়সায় সে রেঁধেবেড়ে দেয়। সেই শিকারীর কানে খবরটা পৌঁছতে সে ভাবল, 'ওরকম একটা আস্তানাই আমার দরকার। আমি গরিব, খাবার কেনার নগদ টাকাকড়ি আমার নেই।'

তাই সে তার বন্দুক আর ঝুলিটা নিয়ে সেই কুঁড়েঘরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল যেখানকার সাইনবোর্ডে লেখা: 'আজ ধার, কাল নগদ।' দুর্গ থেকে যে জিনিসগুলো নিয়েছিল তখনো সেগুলো তার ঝুলির মধ্যে।

যে-তরোয়াল দিয়ে তিনটে দৈত্যের মুণ্ডুগুলো কেটেছিল সেটা কোমরে আঁটতেও শিকারী ভুলল না। তার পর সে বিনা-পয়সার সরাইখানার কুঁড়েঘরে পৌঁছে সেখানকার সুন্দরী কর্ত্রীকে দেখে মোহিত হয়ে গিয়ে শিকারী খাবার চাইল। মেয়েটি প্রশ্ন করল, কোথা থেকে সে আসছে, কোথায়ই-বা চলেছে। শিকারী বলল, "দেশে-দেশে আমি ঘুরে বেড়াই।" মেয়েটি তখন জানতে চাইল, তার বাবার নাম-লেখা তরোয়ালটা কোথায় সে পেয়েছে। শিকারী বলল, "এই তরোয়াল দিয়ে তিনটে দৈত্যের মুণ্ডু আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম।" আর তার পর প্রমাণ হিসেবে ঝুলি থেকে বার করে সে দেখাল দৈত্যদের তিনটে জিভ, তার চটি আর রুমাল আর পোশাকের টুকরোগুলো।

মহানন্দে রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল, "তুমিই তা হলে আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে!"

তার পর তারা দুজনে গেল বুড়ো রাজার কাছে। রাজাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে রাজকন্যে বলল, সে-রাতে যখন সে ঘুমিয়েছিল এই শিকারীই মেরে ফেলে দৈত্যদের। প্রমাণগুলো দেখে রাজার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে সাহসী

শিকারীর সঙ্গেই বিয়ে হবে রাজকন্যের। এক বিদেশী ভদ্রলোকের মতো শিকারীকে পোশাক পরানো হল আর তার পর দিকে দিকে পাঠানো হল ভোজসভার আমন্ত্রণ-পত্র।

ভোজের টেবিলে অতিথিরা জমায়েত হবার পর রাজকন্যের বাঁ পাশে বসল সেই কুৎসিত সেনাপতি আর ডান পাশে শিকারী। সেনাপতি ভেবেছিল শিকারী এক বিদেশী, সেখানে এসেছে বেড়াতে। ভোজ শেষ হবার পর সেনাপতিকে বুড়ো রাজা প্রশ্ন করলেন, "যে-দৈত্যদের তুমি মেরেছিলে তাদের জিভগুলো কোথায়?"

সেনাপতি বলল, "মহারাজ, তাদের জিভ ছিল না।"

রাজা বললেন, "তাই নাকি? সব জীবজন্তুদেরই তো জিভ থাকে। আমার কথার যে প্রতিবাদ করবে তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?"

সঙ্গে-সঙ্গে সেনাপতি উত্তর দিল, "মৃত্যুদণ্ড।"

রাজা বললেন, "নিজের শাস্তির কথা নিজেই বলেছ।" তার পর আদেশ দিলেন সঙ্গে-সঙ্গে সেনাপতিকে হাজতে ভরতে।

এর পর রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হল সেই সাহসী শিকারীর। আর বুড়ো রাজার মৃত্যুর পর শিকারীই হল রাজা।

পুকুরের পেতনী

এক সময় এক জাঁতাওয়ালা তার বউয়ের সঙ্গে খুব আনন্দেই দিন কাটাত। তাদের টাকা-পয়সা আর জমিজমার অভাব ছিল না। প্রতি বছর বেড়ে চলত তাদের ধন-সম্পত্তি। কিন্তু কিছুকাল পর তাদের দুর্দিন শুরু হয়। আগে যেমন বছরে-বছরে তাদের ধন-সম্পত্তি বাড়ত, দুর্দশা শুরু হবার পর বছরে বছরে তাদের ধন-সম্পত্তি তেমনি কমতে শুরু করে। শেষটায় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তার জাঁতা-কলটাও যায় যায়। জাঁতাওয়ালা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল। সারাদিন খাটা-খাটুনির পর রাতে শুতে গিয়ে তার ঘুম আসতে চায় না। দুশ্চিন্তা নিয়ে বিছানায় শুধু এপাশ-ওপাশ করে।

একদিন ভোরের আলো ফোটবার আগেই সে বেরিয়ে পড়ল। জাঁতাকলের পাশের ছোটো স্রোতটা পেরুবার সময় সূর্যের প্রথম রশ্মি দেখা দিল আর ঠিক তখনই তার মনে হল মাছ-পুকুরে কে যেন জল ছিটচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে দেখে রূপসী একটি মেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে জল থেকে। মেয়েটির মাথার চুল খুব লম্বা। সেই চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমে তার ফরসা শরীর ঢেকেছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে সে বুঝল—মেয়েটি পুকুরের পেতনী। ভীষণ ভয় পেয়ে সে ভেবে পেল না, যাবে না থাকবে। কিন্তু মিষ্টি গলায় তার নাম ধরে ডেকে পেতনী প্রশ্ন করল তাকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন।

প্রথমে জাঁতাওয়ালার গলা থেকে রা বেরুল না। কিন্তু পেতনীর মিষ্টি স্বর শুনে সাহস করে তাকে সে বলল নিজের দুঃখের কাহিনী।

জানাল, আগে সে ছিল ধনী, দিন কাটত আনন্দে। এখন এমন গরিব হয়ে পড়েছে যে, জানে না কী করবে।

পেতনী বলল, "হতাশ হয়ো না। আগের চেয়েও তোমাকে ধনী আর সুখী করে দেব। কিন্তু এক শর্তে—তোমাকে কথা দিতে হবে এইমাত্র তোমার বাড়িতে যে জন্মেছে তাকে আমায় দেবে।"

জাঁতাওয়ালা ভাবল, 'বেড়াল-কুকুর ছানা ছাড়া কী আর জন্মাতে পারে?' তাই পেতনীকে সে কথা দিল—যেই জন্মাক, তাকে সে দেবে।

পেতনী আবার জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল আর জাঁতাওয়ালা মনের আনন্দে বাড়ির দিকে পা চালাল। কিন্তু সে জাঁতাকলে পৌঁছবার আগেই তার ভৃত্য বাড়ি থেকে ছুটে এসে জানাল—খুব সুখবর, এইমাত্র তার বউয়ের কোলে এসেছে একটি ছেলে।

বজ্রাহতের মতো জাঁতাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝল, ধূর্ত পেতনী আগেই খবরটা জানত, তাকে সে ঠকিয়েছে। মাথা নিচু করে সে গেল তার বউয়ের বিছানার পাশে। বউ যখন প্রশ্ন করল ফুট্‌ফুটে ছেলে জন্মেছে বলে সে আনন্দ করছে না কেন—বউকে তখন সে জানাল সব কথা। তার পর দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে বলল, "আমার একমাত্র ছেলেকেই যদি হারাই তা হলে রাশিরাশি ধন-সম্পত্তি নিয়ে কী করব? কিন্তু উপায় কী?"

আনন্দ করতে যে-সব আত্মীয় এসেছিল তারাও কোনো উপদেশ দিতে পারল না।

দেখতে-দেখতে জাঁতাওয়ালার ভাগ্য ফিরে গেল। সে ধূলিমুঠি ধরলে সোনামুঠি হয়ে ওঠে। মনে হল যেন বাক্স-প্যাঁটরা আপনা থেকেই ভরে উঠছে। সিন্দুকের টাকা-পয়সা রাতারাতি উঠেছে বেড়ে। অল্পদিনের মধ্যে আগের চেয়েও অনেক বেশি ধনী হয়ে উঠল সে। কিন্তু মনে তার সুখ নেই, কিছুই পারে না উপভোগ করতে। পেতনীকে যে কথা দিয়েছিল বার-বার সেটা তার মনে পড়ে যায়। পুকুরের পাশ দিয়ে যখনই যায়, তখনই মনে হয়—এই বুঝি পেতনী জল থেকে উঠে তার ছেলেকে দাবী করবে। ছেলেকে কখনো সে পুকুরপাড়ে যেতে দিত না। বলত, "সাবধান! জলের ধারে গেলেই সেখান থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে তোকে পুকুরতলায় টেনে নিয়ে যাবে!"

কিন্তু বছরের পর বছর কাটে। পেতনীর আর দেখা নেই। তাই

জাঁতাওয়ালার দুশ্চিন্তা ক্রমশ মিলিয়ে এল ।

ছেলেটি যুবক হয়ে উঠতে এক শিকারীর কাছে তাকে শিক্ষানবিস করে দেওয়া হল। শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদ শিকারী হবার পর গ্রামের জমিদার তাকে চাকরিতে বহাল করলেন।

সেই গ্রামে ছিল পরমা সুন্দরী আর ভারি মিষ্টি স্বভাবের কুমারী এক মেয়ে। শিকারী তাকে খুব ভালো বাসত। কথাটা তার মনিব জানতে পেরে শিকারীকে তিনি উপহার দিলেন ছোটো একটা বাড়ি। ফলে সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে পারল। পরস্পরকে তারা খুব ভালোবাসত বলে খুব আনন্দে তাদের দিন কাটতে লাগল।

একদিন শিকারী ছোট্টো একটা হরিণের পিছনে ধাওয়া করছিল। ছুটতে ছুটতে হরিণটা বন থেকে খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়ল। শিকারী তাকে তাড়া করতে করতে শেষটায় তার বুকে একটা ছুরি বিঁধিয়ে মেরে ফেলল। লক্ষ্য করে নি সেই বিপজ্জনক মাছ-পুকুরের কাছে সে চলে এসেছিল। হরিণটাকে কেটেকুটে সে গেল পুকুরের জলে রক্ত মাখা হাত ধুতে। কিন্তু জলে সে হাত ডোবাতে না ডোবাতেই জলের পেতনী ভেসে উঠে মধুর হেসে ভিজে হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চক্ষের নিমেষে টেনে নিয়ে গেল পুকুরের তলায়।

সন্ধেয় শিকারী বাড়ি না ফেরায় তার বউ খুব ভয় পেয়ে শিকারীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। প্রায়ই শিকারী তাকে বলত—পুকুরের পেতনীর ছলাকলা সম্বন্ধে তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে, পুকুরের কাছে যাওয়া তার একেবারে নিষেধ। তাই তার বউ ইতিমধ্যেই অনুমান করেছিল—কী ঘটেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে গিয়ে সে দেখে পুকুরপাড়ে শিকারের থলিটা পড়ে রয়েছে। তাই আসল ব্যাপার সম্বন্ধে তার মনে আর কোনো সন্দেহই রইল না। হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে কাঁদতে কাঁদতে শিকারীর নাম ধরে বার বার সে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোনোই ফল হল না। তখন সে পুকুরের অন্য পারে ছুটে গিয়ে আবার শিকারীর নাম ধরে ডাকতে লাগল আর জলের পেতনীকে করে চলল অনর্গল গালি-গালাজ। কিন্তু কোনো উত্তর এল না। জলের উপরটা এতটুকু কাঁপল না। শুধু আধখানা চাঁদ শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে বেচারা পুকুর পাড় থেকে চলে গেল না। কখনো গলা ছেড়ে, কখনো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্রমাগত সে ছুটে

বেড়াতে লাগল পুকুরের চার পাশে।

শেষটায় আর ছুটোছুটি করতে না পেরে মাটিতে শুয়ে সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। তার পর দেখল একটা স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখল বিরাট-বিরাট পাথরের মধ্যে দিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে সে উপর দিকে চলেছে। কাঁটায় কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে তার পাদুটো, সজোরে তার মুখে ঝরছে বৃষ্টি আর বাতাসে উড়ছে তার দীর্ঘ চুল। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটা দৃশ্য তার চোখে পড়ল—আকাশ নীল, বাতাস বইছে মৃদুমন্দ গতিতে, পথটা ধীরে-ধীরে নেমে গেছে সবুজ এক মাঠে আর তার মাঝখানে রয়েছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছোট্টো একটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরটার কাছে গিয়ে দরজা খুলে সে দেখে ভিতরে বসে এক বুড়ি, একমাথা তার পাকা চুল, সস্নেহে সে তাকে কাছে ডাকছে।

সেই মুহূর্তে তার ঘুম ভেঙে গেল। তখন ভোর হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে স্থির করে ফেলল স্বপ্নে যা-যা দেখেছে তাই করবে। বহু কষ্টে পাহাড়টায় সে উঠতে লাগল আর তার পর স্বপ্নে যা-যা দেখেছিল হুবহু সেগুলো ঘটে গেল।

বুড়ি তাকে সস্নেহে ডেকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার ছোট্টো নিরালা বাড়িটা খুঁজে-খুঁজে বার করেছ বলে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়েছ।"

কাঁদতে-কাঁদতে শিকারীর বউ সব কথা বুড়িকে বলল।

বুড়ি বলল, "কেঁদো না। তোমায় সাহায্য করব। এই নাও সোনার একটা চিরুনি। পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। তার পর। মাছ-পুকুরটার জলের কিনারে বসে এই চিরুনি দিয়ে তোমার লম্বা কালো চুল আঁচড়াতে শুরু কোরো। চুল আঁচড়ানো শেষ হলে পুকুর-পাড়ে এটা রেখো। তার পর দেখবে কী ঘটে।"

শিকারীর বউ ফিরে গেল। অপেক্ষা করতে করতে মনে হল পূর্ণিমার রাত আসতে বড্ডো দেরি করছে। শেষটায় এক সন্ধেয় আকাশে উঠল পূর্ণ গোল চাঁদ। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুকুর-পাড়ে গিয়ে সে বসল আর তার পর সোনার চিরুনি দিয়ে সে আঁচড়াতে শুরু করল তার কালো দীর্ঘ চুল। চুল আঁচড়ানো শেষ হতে চিরুনিটা সে রাখল জলের কিনারে। খানিক পরেই পুকুরের মধ্যে একটা তোলপাড় শুরু হল আর তার পর তীরে এসে একটা ঢেউ ভেঙে ভাসিয়ে

নিয়ে গেল চিরুনিটাকে। চিরুনিটা পুকুরের তলায় ঠেকতেই দুভাগ হয়ে গেল জল আর দেখা গেল শিকারীর মাথা। কিন্তু একটি কথাও সে বলল না, শুধু করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার বউয়ের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় একটা ঢেউ এসে শিকারীর মাথাটা ঢেকে দিল। তার পর সব-কিছু অদৃশ্য হল। আগের মতোই স্থির হয়ে উঠল পুকুরের জল। শুধু পূর্ণ চাঁদের ছায়া জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল তার উপর।

মনের দুঃখে শিকারীর বউ বাড়ি ফিরল। কিন্তু আবার স্বপ্নে দেখল সেই বুড়ির কুটিরটা। তাই পরদিন সকালে আবার সেখানে হাজির হয়ে বুড়িকে সে জানাল তার দুঃখের কাহিনী।

বুড়ি তাকে সোনার একটা বাঁশি দিয়ে বলল, "আবার পূর্ণিমার রাত পর্যন্ত অপেক্ষ কোরো তার পর পুকুরপাড়ে বাঁশিটা নিয়ে গিয়ে খুব সুন্দর একটা সুর বাজিয়ো। বাজানো হলে বাঁশিটা রেখো বালির ওপর। তার পর দেখো কী ঘটে।"

শিকারীর বউ বুড়ির কথামতো সব-কিছু করল। বাঁশিটা বালিতে রাখতে আগের মতোই পুকুরের মধ্যে একটা তোলপাড় শুরু হল আর তার পর একটা ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল বাঁশিটাকে। সঙ্গে-সঙ্গে দু ভাগ হয়ে গেল জল আর এবার শুধু মাথা নয়, দেখা গেল শিকারীর শরীরের অর্ধেকটা। বউয়ের দিকে সে হাত বাড়াল, কিন্তু তক্ষুনি আর একটা ঢেউ এসে তাকে ঢেকে দিয়ে আবার টেনে নিয়ে গেল পুকুরের তলায়।

শিকারীর বউ বলে উঠল, "দেখা পাবার পরই বর যদি অদৃশ্য হয় তা হলে এরকম দেখায় কী লাভ?"

শোকে দুঃখে একেবারে সে ভেঙে পড়ল। কিন্তু আবার স্বপ্ন দেখে তৃতীয়বার সে গেল বুড়ির কুটিরে। এবার বুড়ি তাকে সোনার একটা চরকা দিয়ে বলল, "সব কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। আবার পূর্ণিমার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। তার পর পুকুরপাড়ে চরকাটা নিয়ে গিয়ে সুতো কেটে যেয়ো। টাকুটা ভরে গেলে চরকাটা রেখো জলের কিনারে। তার পর দেখো কী ঘটে।"

শিকারীর বউ বুড়ির কথামতো সব-কিছু করল। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে সোনার চরকা পুকুরপাড়ে নিয়ে গিয়ে সুতো কেটে কেটে টাকুটা সে ফেলল ভরিয়ে। তার পর চরকাটা জলের কিনারে রাখতেই আগের

চেয়ে অনেক বেশি তোলপাড় শুরু হয়ে গেল পুকুরের মধ্যে আর প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেটাকে। সঙ্গে-সঙ্গে জলের তোড়ে শূন্যে ভেসে উঠল শিকারীর গোটা শরীর। তার পর এক লাফে তীরে পৌঁছে বউয়ের হাত ধরে শিকারী ছুটে পালাল সেখান থেকে।

কিন্তু বেশি দূর তারা যাবার আগেই গোটা পুকুরটা ফুঁসে উঠে বিকট গর্জন করতে-করতে দারুণ জোরে ছুটে চলল গ্রামাঞ্চলের দিকে। শিকারী আর তার বউ দেখল অবধারিত মৃত্যু তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সাহায্য করার জন্য সেই বুড়িকে ডাকতে লাগল শিকারীর বউ। সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ি তাদের চেহারা পালটে করে দিল ব্যাঙ। বন্যার জল তাদের প্রাণে মারতে পারল না বটে, কিন্তু তাদের দুজনকে নিয়ে গেল দুদিকে। জল নেমে যেতে তারা দুজন শুকনো ডাঙায় পা দিয়ে আবার ফিরে পেল মানুষের রূপ। কিন্তু কেউই জানল না অন্যজন কোথায়। দুজনেই তারা দেখল বিদেশী লোকদের মধ্যে গিয়ে তারা পড়েছে। বিদেশীরা তাদের স্বদেশের হদিশ দিতে পারল না। শিকারী আর শিকারীর বউয়ের মাঝখানে তখন উঁচু-উঁচু অনেক পাহাড় আর দুস্তর উপত্যকা। বাঁচবার তাগিদে তারা দুজনেই বাধ্য হল ভেড়া চরাবার কাজ নিতে। মনের দুঃখে মাঠে আর বনে ভেড়া চরিয়ে অনেক বছর তারা কাটাল।

তখন বসন্তকাল। তারা দুজনেই বেরুল ভেড়ার পাল নিয়ে। তাদের কপাল ভালো। কারণ তারা দুজনেই যাচ্ছিল একই দিকে। হঠাৎ দূরের এক পাহাড়ে শিকারী দেখে আর এক পাল ভেড়া। নিজের ভেড়ার পাল নিয়ে শিকারী চলল সেদিকে।

এক উপত্যকায় তাদের দুজনের দেখা হল। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারল না। তবু একেবারে নিঃসঙ্গ নয় বলে দুজনেরই আনন্দ হল। আর তার পর থেকে প্রতিদিন ভেড়ার পাল নিয়ে তারা যেতে থাকল একই দিকে। নিজেদের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা তারা কইত না। কিন্তু কাছাকাছি থাকতে পারায় তাদের মনের দুঃখ অনেকটা গেল কমে।

সেদিন সন্ধেয় আকাশে নিটোল চাঁদ ঝল্‌মল্‌ করছে, ভেড়ার পাল পড়েছে ঘুমিয়ে। শিকারী তখন তার কোটের পকেট থেকে সেই সোনার বাঁশিটা বার করে বাজাতে শুরু করল ভারি মিষ্টি অথচ করুণ

এক সুর। বাজানো শেষ হলে শিকারী দেখল মেয়েটি অঝোরে কাঁদছে।

সে প্রশ্ন করল, "কাঁদছ কেন?"

শিকারীর বউ বলল, "শেষবার বাঁশিতে ঐ সুরটা যখন বাজাই আমার বরের মাথা জলের ওপর ভেসে উঠেছিল।"

তার কথা শুনে শিকারী তাকাল মেয়েটির দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হল চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন সরে গেছে। কারণ বউকে তখন সে চিনতে পেরেছিল। মেয়েটিও তাকাল তার দিকে আর পূর্ণ চাঁদের আলোয় শিকারীর মুখ ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠতে নিজের বরকে তক্ষুনি সেও পারল চিনতে। সঙ্গে-সঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরে শিকারীকে সে চুমু খেল আর তার পর তারা যে আনন্দে কী রকম অধীর হয়ে উঠেছিল সে কথা লেখবার আর দরকার নেই।

আসল কনে

এক সময় পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। ছেলেবেলায় নিজের মাকে সে হারায়। সৎ-মা তার উপর দারুণ অত্যাচার করত। সৎ-মা যেকোনো শক্ত কাজ দিলে মেয়েটি সাধ্যমতো সেটা করত। কিন্তু তাতেও পাজি সৎ-মার এক ফোঁটা স্নেহ-মমতা-করুণা সে পেত না। কখনোই তার সৎ-মা খুশি হত না। সব সময়েই খুঁত বার করত তার কাজের। সত্যি বলতে কি, মেয়েটি যত খাটত ততই তার ঘাড়ে কাজ চাপাত তার সৎ-মা।

একদিন সৎ-মা তাকে বলল, ছ সের পালক তোকে বাছতে হবে। সন্ধের মধ্যে কাজ শেষ না হলে এমন মার মারব যে জীবনে ভুলবি না। ভেবেছিস কী—কুঁড়েমি করে সারাটা দিন কাটালেই চলবে?"

মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল। কিন্তু সন্ধের মধ্যে কাজটা শেষ করা যে অসম্ভব সে কথা ভালো করেই সে জানত। তাই তার দু চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল ঝরতে লাগল। কিছু পালক বাছা হলে পর বাতাসে সেগুলো গেল চার দিকে উড়ে। গোড়া থেকে তাই আবার তাকে কাজ শুরু করতে হল। শেষটায় টেবিলের উপর কনুই রেখে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলে উঠল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে কি এমন কেউই নেই আমার ওপর যার এতটুকু করুণা হয়?" সঙ্গে-সঙ্গে সে শুনল মৃদু মিষ্টি গলায় কে যেন তাকে বলছে, "বাছা, কাঁদিস না। আমি তোকে সাহায্য করতে এসেছি।"

মেয়েটি মুখ তুলে দেখে এক বুড়ি তার পাশে দাঁড়িয়ে। সস্নেহে

মেয়েটির হাত দুটি ধরে বুড়ি বলল, "তোর সব দুঃখের কথা আমায় বল।"

বুড়ির মিষ্টি কথাগুলো শুনে মেয়েটি তাকে জানাল, কী ভাবে সৎ-মা কাজের বোঝা অনবরত তার ঘাড়ে চাপায়। বলল, "আজ যে-কাজ দিয়েছে সেটা করা একেবারে অসম্ভব। আজ সন্ধের মধ্যে পালকগুলো বাছতে না পারলে সৎ-মা আমায় মেরে শেষ করবে।" মেয়েটি আবার কাঁদতে শুরু করল।

বুড়ি বলল, "ভাবিস না বাছা। ঘুমোতে যা। তোর কাজটা আমি করে দিচ্ছি।"

মেয়েটি তার বিছানায় শুয়ে সঙ্গে-সঙ্গে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

টেবিলের সামনে বসে বুড়ি শুরু করে দিল পালক বাছতে। সে হাত লাগাতে না লাগাতেই ফর্‌ফর্‌ করে উঠতে লাগল পালকগুলো আর দেখতে-দেখতে ছ সের পালক বাছা শেষ হল।

ঘুম ভাঙতে মেয়েটি দেখে ঘরের এক পাশে তুষার-ধবল পালক স্তূপ করে রাখা হয়েছে, ঘরটা চক্‌চক্‌ করছে, কিন্তু বুড়ি সেখানে নেই। অসীম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে সন্ধে পর্যন্ত মেয়েটি শান্ত হয়ে বসে রইল।

বাড়ি ফিরে কাজ শেষ হয়েছে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে সৎ-মা বলল, "কুঁড়ের ধাড়ি, দেখলি তো পরিশ্রম করলে কতটা কাজ করা যায়! কোলের ওপর হাত গুটিয়ে বসে না থেকে আর কোনো কাজ করতে পারিস নি?" ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মনে মনে সে বলল, 'মেয়েটা দেখছি খুব কাজের। তাকে আরো শক্ত কাজ দিতে হবে।'

পরদিন সকালে মেয়েটিকে ডেকে সৎ-মা বলল, "এই চামচেটা দিয়ে বাগানের ওপাশকার বড়ো পুকুরটা পরিষ্কার করে ছেঁচে ফেল্‌ গে। সন্ধের মধ্যে কাজটা শেষ করতে না পারলে, বরাতে কী আছে সেটা তো ভালো করেই জানিস।"

চামচটা নিয়ে মেয়েটি দেখে সেটা ফুটো। কিন্তু আস্ত হলেও সেটা দিয়ে জল ছেঁচে পুকুরটা খালি করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। যাই হোক, নতজানু হয়ে জলের কিনারে বসে সঙ্গে-সঙ্গে সে কাজ শুরু করে দিল আর পুকুরের মধ্যে ঝরতে লাগল তার চোখের জল।

কিন্তু সেই বুড়ি আবার সেখানে এসে মেয়েটির বিপদের কথা শুনে

বলল, "কাঁদিস না, বাছা। ঝোপের মধ্যে ঘুমো গে। তোর কাজটা আমি করে দিচ্ছি।"

মেয়েটি ঘুমোতে গেলে জলের মধ্যে হাত ডোবাল বুড়ি আর সঙ্গে-সঙ্গে পুকুরের জল বাষ্প হয়ে উঠে মিশে গেল মেঘের সঙ্গে।

সূর্য অস্ত যাবার পর ঘুম ভাঙতে মেয়েটি দেখে, পুকুরে এক ফোঁটা জল নেই, কাদার মধ্যে মাছগুলো ছট্‌ফট্‌ করছে সৎ-মাকে ডেকে এনে মেয়েটি দেখাল কাজটা শেষ হয়েছে।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে সৎ-মা বলল, "অনেক আগেই কাজটা শেষ করা উচিত ছিল।" সঙ্গে-সঙ্গে সে ভাবতে শুরু করল এর পর মেয়েটিকে কোন কাজ দেওয়া যায়।

তৃতীয় দিন সকালে সৎ-মা তাকে বলল, "ঐ সমতল জায়গাটায় আজ সন্ধের মধ্যে আমার জন্যে একটা প্রাসাদ তোকে বানিয়ে দিতে হবে।"

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েটি বলল, "অত বড়ো কাজ কী করে আমি করব?"

খিঁচিয়ে উঠে চীৎকার করে সৎ-মা বলল, "মুখে মুখে চোপা আমি বরদাস্ত করব না। ফুটো চামচে দিয়ে তুই যখন পুকুর ছেঁচতে পেরেছিস, তখন প্রাসাদটাও বানাতে পারবি। আজ সন্ধেয় সেই প্রাসাদে গিয়ে আমি উঠব। যদি দেখি পান থেকে চুণ খসেছে—রান্নাঘর আর মাটির তলার ঘরের কোনো খুঁটিনাটি জিনিস বাদ পড়েছে—তোকে আর আস্ত রাখব না।" এই-না বলে বাড়ি থেকে মেয়েটিকে সে বার করে দিল।

উপত্যকায় পেঁীছে মেয়েটি দেখে পাথরের উপর পাথর ডাঁই করা রয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করে সব চেয়ে ছোটো পাথরটাকেও এতটুকু সে নড়াতে পারল না।

সেখানে বসে পড়ে মেয়েটি আবার কাঁদতে শুরু করল। সেই দয়ালু বুড়িই তখন তার একমাত্র ভরসা। আর বাস্তবিকই বুড়ির জন্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সেখানে হাজির হয়ে বুড়ি বলল, "কাঁদিস না, বাছা। ছায়ায় ঘুমো গে যা। তোর হয়ে প্রাসাদটা আমি বানিয়ে দিচ্ছি। পছন্দ হলে সেখানেই তুই থাকবি।"

মেয়েটি ঘুমোতে গেলে বুড়ি ছুঁল সেই ছাই-রঙা পাথরগুলো। সঙ্গে-

সঙ্গে নড়েচড়ে উঠে সেগুলো পাশাপাশি খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল যেন এক দৈত্য পাঁচিলটা বানিয়ে ফেলেছে। তার পর আপনা থেকে গড়ে উঠতে লাগল প্রাসাদটা। মনে হল যেন অসংখ্য অদৃশ্য হাত পাথরের উপর বসিয়ে চলেছে পাথর। মাটি কাঁপতে লাগল, বড়ো-বড়ো থাম খাড়া হয়ে ঠিক-ঠিক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল, ছাতের উপর নিখুঁতভাবে বসল টালিগুলো আর প্রাসাদটার চূড়ায় সোনালী বায়ু-শকুন (বাতাসের গতি দেখবার জন্য পাখির মূর্তি) লাগল ঘুরতে। সন্ধের আগে প্রাসাদের ভিতরকার সব-কিছুই তৈরি হয়ে গেল। বুড়ি এ-সব পারল কী করে, আমি জানি না। কিন্তু ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে দেখা গেল রেশম আর মখমলের পর্দা ঝুলছে, দামী-দামী গদি-আঁটা চেয়ার রয়েছে ছড়ানো, শ্বেতপাথরের টেবিলের সামনে রয়েছে সুন্দর নক্‌শা কাটা আরাম-কেদারা, স্ফটিকের ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে ছাত থেকে আর পালিশ করা মেঝেয় ঠিকরে পড়ছে তার আলো। দেখা গেল নানা সোনার খাঁচায় সবুজ রঙের তোতাপাখি আর হরেকরকম সুন্দর-সুন্দর গাইয়ে পাখি দোল খাচ্ছে। সেখানকার সব-কিছুই রাজপ্রাসাদের মতো জমকালো।

মেয়েটির যখন ঘুম ভাঙল সূর্য তখন সবে অস্ত যাচ্ছে। হাজার উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল তার চোখ। চট্‌পট্‌ উঠে পড়ে খোলা দরজা দিয়ে সে ছুটে গেল প্রাসাদের মধ্যে। লাল কাপড় দিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো মোড়া, সোনালী রেলিঙের পাশে ফুলে ভরা গাছ। জমকালো ঘরগুলো দেখে ভীষণ অবাক হয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ সৎ-মার কথা মনে না পড়লে কে জানে কতক্ষণ সেভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকত। আপন মনে সে বলে উঠল, 'আশা করি সৎ-মা এবার খুশি হবে। আমাকে আর নিগ্রহ করবে না।' তার পর সৎ-মার কাছে গিয়ে সে জানাল—প্রাসাদ তৈরি।

দাঁড়িয়ে উঠে সৎ-মা বলল, "এক্ষুনি সেখানে থাকতে চললাম।"

প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে হাত দিয়ে সে মুখ ঢাকল—এমনই ঝল্‌সে গিয়েছিল তার চোখদুটো। তার পর মেয়েটিকে সে বলল, "দেখছিস তো, কী রকম সহজে সব-কিছু তুই পারিস ? আরো শক্ত কাজ তোকে দেওয়া উচিত ছিল।" কোথাও কোনো জিনিসের অভাব আছে কি না পরখ করার জন্য ঘরে-ঘরে গিয়ে সব-কিছু সে দেখল খুঁটিয়ে। কিন্তু কোনো খুঁত সে ধরতে পারল না। শেষটায় বিতৃষ্ণাভরা

দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এবার-তুই নীচে যা। রান্নাঘর আর মাটির তলার ঘরগুলো এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। কোনো জিনিস ভুলে গিয়ে থাকলে তোর আর রক্ষে রাখব না।"

কিন্তু দেখা গেল উনুনে আগুন জ্বলছে, নানা পাত্রে রান্না হচ্ছে রাতের খাবার, বেলচে আর চিমটে রয়েছে যথাস্থানে আর তাকের উপর সারি-সারি সাজানো রয়েছে ঝক্‌ঝকে বাসনপত্র। কোথাও কোনো জিনিসেরই অভাব নেই। এমন-কি, কয়লার বাক্স আর জলের বালতিটাও রয়েছে ঠিক-ঠিক জায়গায়।

সৎ-মা খিঁচিয়ে প্রশ্ন করল, "মাটির তলার ঘরে যাবার দরজাটা কোথায়। সেখানে পিপেয় ভরা ভালো-ভালো মদ না থাকলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।" এই-না বলে মেঝের উপরকার চোরা-দরজাটা তুলে যেই-না সে সিঁড়ির দুয়েক ধাপ নেমেছে, অমনি দুম করে সেটা তার মাথায় পড়ে গেল। মেয়েটি তার আর্তনাদ শুনে তাকে সাহায্য করার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে তুলে ধরল চোরা-দরজার পাল্লাটা। কিন্তু পাল্লার আঘাতে নীচের মেঝেয় ছিট্‌কে তখন মরে পড়েছিল তার সৎ-মা।

সুন্দর প্রাসাদের তখন একমাত্র মালিক হয়ে উঠল মেয়েটি। তার এত আনন্দ হল যে, প্রথমটায় ভেবে পেল না কী করবে। পোশাকের নানা আলমারিতে ঠাসা ছিল সুন্দর-সুন্দর পোশাক। নানা ড্রয়ারে ছিল হরেক রকমের সোনা রুপো আর জহরতের গয়না। এক কথায়—কোনো জিনিসের অভাব তার রইল না। কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটির রূপের আর ঐশ্বর্যের খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাকে বিয়ে করার জন্য প্রতিদিন আসতে শুরু করল তরুণের দল। কিন্তু কাউকেই তার মনে ধরল না। শেষটায় রাজপুত্র এসে তার হৃদয় জয় করল আর স্থির হয়ে গেল তাদের বিয়ে হবে।

সেই প্রাসাদের বাগানে একটা বাতাপি লেবুর গাছ ছিল। একদিন তারা দুজন সেই গাছতলায় বসে মনের আনন্দে গল্প করছিল এমন সময় রাজপুত্র তাকে বলল, "বাবার কাছে বিয়ের অনুমতি চাইতে আমায় দেশে যেতে হবে। আমার একান্ত অনুরোধ—এই গাছতলায় বসে আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা কোরো। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ফিরব।"

মেয়েটি তার বাঁ গালে চুমু খেয়ে বলল, "আমাকে ছাড়া অন্য কোনো

মেয়েকে ভালোবেস না। এই গালে অন্য কেউ যেন চুমু না খায়। এই বাতাপি লেবুর গাছের তলায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

সেই বাতাপি-লেবুর গাছের তলায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত মেয়েটি বসে রইল। কিন্তু রাজপুত্র ফিরল না। আরো তিনদিন সেখানে সে অপেক্ষা করে বসে রইল, কিন্তু বৃথাই।

চতুর্থ দিনেও রাজপুত্র না ফিরতে আপন মনে মেয়েটি বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই সে কোনো বিপদে পড়েছে। তার খোঁজে আমি বেরুব। যতদিন না তার দেখা পাই, ফিরব না।' তার সব চেয়ে সুন্দর তিনটে পোশাক সে পুঁটলিতে রাখল—প্রথমটায় ঝক্‌ঝকে তারা, দ্বিতীয়টায় রুপোর চাঁদ আর তৃতীয়টায় সোনার সূর্যের চুম্‌কি-বসানো। তার পর একমুঠো জহরত নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। সর্বত্র গিয়ে রাজপুত্রের খোঁজ সে নিল। কিন্তু কেউই বলল না তাকে দেখেছে কিংবা তার কথা শুনেছে। পৃথিবীর দূর দূরান্তরে মেয়েটি ঘুরল, কিন্তু কোথাও রাজপুত্রের দেখা সে পেল না। শেষটায় এক চাষীর কাছে ভেড়া চরাবার কাজ সে নিল আর বড়ো একটা পাথরের নীচে লুকিয়ে রাখল তার জহরত আর পোশাকগুলো।

রাখাল-মেয়ের মতো সে দিন কাটায়। ভেড়া চরাতে-চরাতে রাজপুত্রের জন্য মন-কেমন করে। তাই খুব বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। তার ছিল ভারি পোষ-মানা ছোট্টো একটা বাছুর। মেয়েটির হাত থেকে সে ঘাস-পাতা খেত। তাকে যখনি সে বলত:

"হাঁটু মুড়ে বোস, ক্ষুদে বাছুর, আমার পাশে,
আরো কাছ ঘেঁষে আয়,
হোস্ নে সেই রাজকুমারের মতো
লেবু তলার কনেকে যে ভুলে যায়।"

তখনি বাছুরটা তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসত আর মেয়েটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত।

এইভাবে একা-একা মনের দুঃখে সে কাটাল অনেকদিন। তার পর খবর রটে গেল সেখানকার রাজকন্যের বিয়ে। মেয়েটি যে-গ্রামে থাকত তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে শহরে যাবার পথ। একদিন মেয়েটি যখন ভেড়া চরাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে গেল রাজকন্যের ভাবী বর। বুক

ফুলিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সে গেল। মেয়েটির দিকে ফিরেও তাকাল না। মেয়েটি কিন্তু দেখেই তার রাজপুত্রকে চিনতে পারল আর তার মনে হল ছুরি দিয়ে কেউ যেন তার হৃৎপিণ্ড ফালা ফালা করে দিয়েছে। তার পর দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে সে বলে উঠল, "ভেবেছিলাম আমাকে সে ভুলবে না। কিন্তু দেখছি একেবারে ভুলে গেছে।"

আর-একদিন আবার রাজপুত্র সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে কাছে আসতেই মেয়েটি তার বাছুরকে বলে উঠল :

"হাঁটু মুড়ে বোস্, ক্ষুদে বাছুর, আমার পাশে,
আরো কাছ ঘেঁষে আয়,
হোস নে সেই রাজকুমারের মতো
লেবু তলার কনেকে যে ভুলে যায়।"

মেয়েটির স্বর শুনে চারি দিকে তাকিয়ে রাশ টেনে সে ঘোড়া থামাল তার পর রাখাল মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে হাত দিয়ে কী যেন মনে করার চেষ্টা করল। তার পর আবার ঘোড়া ছুটিয়ে হয়ে গেল অদৃশ্য।

মেয়েটি কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠল, "হায়-হায়! রাজপুত্তুর আমাকে একেবারে ভুলে গেছে।" তার পর আগের চেয়েও তার মন খারাপ হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর দেশের সবাইকে রাজা নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর রাজসভায় তিনদিনের ভোজ-উৎসবে। মেয়েটি মনে-মনে বলল, 'এইবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।'

সন্ধে হতে সেই পাথরটার তলা থেকে সূর্যের সোনার চুমকি-বসানো পোশাকটা আর জড়োয়া-গয়না বার করে সে পরল। মাথার রুমালটা খুলে ফেলতে থোকা-থোকা কোঁকড়া চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়ল তার পিঠে। তার পর সে গেল শহরে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে কারুরই চোখে সে পড়ল না। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে হলঘরে পৌঁছতে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না সে কে। রাজপুত্র এগিয়ে গেল তার দিকে। কিন্তু তখনো মেয়েটিকে সে চিনতে পারল না। মেয়েটির সঙ্গে সে নাচল আর তার রূপে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়ল যে, অন্য কনের কথা তার মনেই রইল না। উৎসব

শেষে ভীড়ের মধ্যে সে মিলিয়ে গেল আর ভোর হবার আগে আবার মেয়ে-রাখালের বেশে সে ফিরল গ্রামে।

পরের সন্ধ্যেয় সে পরল চাঁদের চুমকি-বসানো পোশাক। মাথায় দিল আধখানা চাঁদের আকারের হীরের মুকুট। রাজসভায় পৌঁছতে সবাই অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতে লাগল আর রাজপুত্র তার কাছে ছুটে এসে সারা সন্ধে নাচল শুধু তারই সঙ্গে—অন্য কারুর দিকে ফিরেও তাকাল না। যাবার আগে মেয়েটির কাছ থেকে সে কথা আদায় করে নিল—পরের সন্ধ্যেয় আবার সে আসবে।

তৃতীয় সন্ধ্যেয় সে যখন পৌঁছল তার পরনে ছিল তারার চুমকি-বসানো পোশাক। প্রতিবার পা ফেলার সময় সেটা ঝল্‌মল্‌ করতে লাগল। তার চুলে আর কোমরের চার পাশে ছিল তারার মতো হীরে-চুনি-পান্নার গয়না।

রাজপুত্র বহুক্ষণ ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভীড় ঠেলে তার কাছে এসে সে বলল, "এখন তোমায় বলতে হবে—তুমি কে। মনে হচ্ছে বহুকাল ধরে তুমি আমার চেনা।"

"তুমি চলে যাবার সময় কী বলেছিলে, মনে নেই?" এই-না বলে রাজপুত্রের দিকে এগিয়ে এসে মেয়েটি চুমু খেল তার বাঁ গালে।

আর সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত্রর মনে হল—তার চোখের উপর থেকে একটা পর্দা যেন খসে পড়ল। আসল কনেকে চিনতে পেরে রাজপুত্র বলল, "আমার সঙ্গে চলো। এখানে আর থাকতে পারব না।" এই-বলে মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে গেল তার জুড়িগাড়ির কাছে।

মনে হল সেই জাদুর প্রাসাদের দিকে ঘোড়াগুলো যেন উড়ে চলেছে। দূর থেকে তারা দেখতে পেল আলো-ঝল্‌মলে জানালাগুলো। বাতাপি-লেবুর গাছটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ডালপালা নাড়িয়ে বাতাসে সেটা সুগন্ধ ছড়াতে লাগল। গাছটার তলায় ছিল অসংখ্য জোনাকি। ফুল দিয়ে সাজানো ছিল সিঁড়ির ধাপ, ঘরে-ঘরে শোনা যাচ্ছিল পাখিদের গান, হল ঘরে জমায়েত হয়েছিল সব সভাসদ আর পুরোহিত অপেক্ষা করছিল রাজপুত্র আর আসল কনের চার হাত এক করে দেবার জন্য।

সীল-মাছ

এক সময় এক রাজকন্যের অনেক উঁচুতে একটা ঘর ছিল। সেই ঘরের বারোটা জানলা দিয়ে পৃথিবীর সব দিকে তাকানো যেত। প্রথম জানলা দিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের চেয়ে স্পষ্ট সে দেখত ; দ্বিতীয় জানলা দিয়ে আরো ভালো করে ; তৃতীয় জানলা দিয়ে তার চেয়েও ভালো। বারো নম্বর জানলায় এলে সে দেখতে পেত পৃথিবীর উপর আর নীচেকার সব-কিছু।

রাজকন্যে ছিল ভয়ঙ্কর। সে চেয়েছিল নিজেই সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে। তাই পণ করেছিল যে-লোক এমন জায়গায় লুকোতে পারবে যাকে তার পক্ষে খুঁজে বার করা অসম্ভব—তাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। আরো সে ঘোষণা করেছিল—যদি কেউ লুকোবার পর তার লুকোবার জায়গা সে খুঁজে বার করতে পারে তা হলে তার মুণ্ডু কেটে শূলে গেঁথে রাখা হবে। ইতিমধ্যেই কেল্লার সামনে শূলে গাঁথা পড়েছিল সত্তর থেকে নব্বুইটা মাথা। তাই কেউ আর ভরসা করে রাজকন্যেকে বিয়ে করার জন্যে লুকোতে আসে নি। তাতে রাজকন্যে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, 'যাক গে, জীবনে স্বাধীন থাকা যাবে। বিয়ে করে কারুর বশ মানতে হবে না।'

তার পর একদিন তিন ভাই এসে জানাল—তারা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চায়। বড়ো ভাই ভেবেছিল খড়ি পাথরের একটা গর্তে নিরাপদে সে লুকোতে পারবে। কিন্তু প্রথম জানলা থেকেই রাজকন্যে তাকে দেখতে পেল। ফলে তার মুণ্ডু খসল।

মেজো ভাই লুকোল কেল্লার মাটির নীচের ঘরে। কিন্তু তাকেও রাজকন্যে দেখতে পেল প্রথম জানলা থেকে। ফলে তার মুণ্ডু গাথা পড়ল নিরেনব্বুই নম্বর শূলে।

তার পর ছোটো ভাই রাজকন্যের কাছে গিয়ে বলল, "ভাববার জন্যে একটা দিন আর তিন বার লুকোবার সুযোগ আমায় দেবে? দুবার ধরা পড়ার পর তৃতীয় বারেও যদি লুকোতে গিয়ে আমাকে খুঁজে বার করতে পার—তা হলে আমার মুণ্ডু কেটো।"

ছোটো ভাই ছিল খুব সুপুরুষ আর তার কথার মধ্যে ছিল এমন একটা অনুরোধের সুর যে, রাজকন্যে রাজি হয়ে গেল কিন্তু তাকে সে সাবধান করে দিয়ে বলল, "লুকোতে চাও তো লুকোও গিয়ে। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর—কিছুতেই তুমি সফল হতে পারবে না।

পরদিন অনেকক্ষণ ধরে ছোটো ভাই ভাবল কোথায় সে লুকোবে। কিন্তু কোনো ভালো জায়গার সন্ধান সে ভেবে পেল না। শেষটায় নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে সে বেরুল শিকারে। একটা দাঁড়কাক দেখে সে তার বন্দুকটা তুলল।

ছোটো ভাই গুলি ছুঁড়তে যাবে এমন সময় দাঁড়কাকটা চেঁচিয়ে বলল, "আমায় গুলি কোরো না, প্রতিদানে তোমার উপকার করব।" বন্দুক নামিয়ে যেতে-যেতে সে পৌঁছল এক হ্রদে। প্রকাণ্ড একটা মাছ জলের উপর তখন ভেসে উঠেছিল।

তার দিকে বন্দুক তুলতে ছোটো ভাইকে মাছটা বলল, "আমায় গুলি কোরো না, প্রতিদানে একদিন তোমার উপকার করব।" মাছটাকে গুলি না করে যেতে-যেতে সে দেখে একটা শেয়াল খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলেছে।

তাকে সে গুলি করল। কিন্তু গুলিটা ফস্‌কে গেল। শেয়াল তখন তাকে কাছে ডেকে বলল, "এখানে এসে দয়া করে আমার পায়ের কাঁটাটা বার করে দাও।"

ছোটো ভাই কাঁটা তুলে দিল। কিন্তু সব সময়েই ভাবছিল শেয়ালকে মেরে তার চামড়াটা নেবার কথা।

শেয়াল বলল, "আমায় মেরো না, প্রতিদানে একদিন তোমার উপকার করব।" শেয়ালটাকে সে মারল না। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। তাই সে বাড়ি ফিরল।

পরদিন তার লুকোবার কথা। কিন্তু অনেক ভেবেও সে স্থির করতে

পারল না—কোথায় লুকোবে।

তাই বনে গিয়ে দাঁড়কাককে সে বলল, "তোমায় আমি প্রাণে মারি নি। তাই এখন বলে দাও কোথায় গিয়ে লুকোলে রাজকন্যে আমাকে দেখতে পাবে না।" দাঁড়কাক মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ভাবল।

তার পর বলে উঠল, "আমি একটা জায়গার কথা ভেবে পেয়েছি।" এই-না বলে বাসা থেকে একটা ডিম এনে সেটা দু টুকরো করে তার মধ্যে ছোটো ভাইকে সে পুরল। তার পর টুকরো দুটো জোড়া দিয়ে সেটার উপর নিজে বসল।

রাজকন্যে তার প্রথম জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছোটো ভাইকে দেখতে পেল না। দ্বিতীয় জানলা দিয়ে তাকিয়েও তাকে দেখতে না পেয়ে সে ভয় পেতে শুরু করল। কিন্তু এগারো নম্বর জানলা থেকে সে দেখতে পেল ছোটো ভাইকে। সে আদেশ দিলে দাঁড়কাককে গুলি করে ডিমটা এনে ভাঙতে। ফলে ছোটো ভাই বাধ্য হল বেরিয়ে আসতে।

রাজকন্যে বলল, "এইবার ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আরো ভালো জায়গায় লুকোতে না পারলে শেষটায় প্রাণ হারাবে।"

পরদিন ছোটো ভাই হ্রদের তীরে গিয়ে মাছটাকে ডেকে বলল, "তোমায় আমি প্রাণে মারি নি। তাই এখন আমায় বলে দাও কোথায় গিয়ে লুকোলে রাজকন্যে আমাকে দেখতে পাবে না।"

খানিক ভেবে মাছ চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক হয়েছে। তোমায় আমি গিলে ফেলব।" এই-না বলে ছোটো ভাইকে গিলে সে ডুব দিল হ্রদের তলায়।

রাজকন্যে তার জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে তাকাতে লাগল। কিন্তু এগারো নম্বর জানলা দিয়েও ছোটো ভাইকে দেখতে না পেয়ে সে ভয়ঙ্কর ঘাবড়ে গেল। কিন্তু বারো নম্বর জানলা দিয়ে তাকিয়ে তার দেখা পেয়ে সে আদেশ দিল মাছটাকে ধরে মারতে। ফলে ছোটো ভাই বাধ্য হল বেরিয়ে আসতে।

ছোটো ভাইয়ের তখনকার মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। রাজকন্যে তাকে বলল, "এই নিয়ে দুবার তোমায় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার একশো নম্বর শূলে তোমার মুণ্ডু শোভা পাবে।"

পরদিন ভারি মনমরা হয়ে মাঠ দিয়ে যেতে-যেতে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সেই শেয়ালের দেখা হয়ে গেল। শেয়ালকে সে বলল, "সবরকম

গোপন গর্ত-টর্তের খোঁজ তোমার জানা। এখন বল দেখি—কোথায় লুকোই ?"

চিন্তিতভাবে শেয়াল বলল, "খুব কঠিন সমস্যায় ফেলেছ।" তার পর অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "ভেবে পেয়েছি। ভেবে পেয়েছি !"

এই-না বলে শেয়াল একটা পুকুরে ডুব দিল। পুকুর থেকে উঠতে দেখা গেল তার চেহারা বাগানের মালি আর জন্তু-জানোয়ার কেনাবেচার সওদাগরের মতো হয়ে উঠেছে। ছোটো ভাইকেও পুকুরটায় ডুব দিতে শেয়াল বলল। পুকুর থেকে ছোটো ভাই যখন উঠল তার চেহারাটা তখন সীল-মাছের মতো হয়ে গেছে।

সওদাগরের ছোট্টো সীল-মাছটাকে দেখার জন্য শহরের লোক ভেঙে পড়ল। ভীড়ের মধ্যে ছিল সেই রাজকন্যে। সীল-মাছটা দেখে খুব খুশি হয়ে চড়া দামে রাজকন্যে সেটাকে কিনল।

সীল-মাছটাকে রাজকন্যের হাতে দেবার আগে সওদাগর-রূপী শেয়াল সীল-মাছ-রূপী ছোটো ভাইকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "রাজকন্যে যখন জানলা দিয়ে তাকাতে যাবে, তুমি তার চুলের বিনুনির মধ্যে লুকিয়ে পড়ো।"

যথা সময়ে রাজকন্যে তাকাল এক নম্বর থেকে এগারো নম্বর জানলার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ছোটো ভাইয়ের চিহ্ন কোথাও সে দেখতে পেল না। বারো নম্বর জানলা দিয়ে তাকিয়েও তাকে দেখতে না পেয়ে রাজকন্যে ভীষণ রেগে এমন জোরে জানলাটা বন্ধ করল যে, অন্য এগারোটা জানলার কাঁচের শার্সিগুলো গেল গুঁড়িয়ে আর কেল্লাটার ভিত পর্যন্ত উঠল থর্‌থরিয়ে। তার পর চেয়ারে গিয়ে বসতে রাজকন্যে টের পেল সীল-মাছটা তার বিনুনির মধ্যে কিল্‌বিল্ করছে। দারুণ বিরক্ত হয়ে সীল-মাছটার ঘাড় ধরে মেঝেয় আছড়ে চীৎকার করে সে বলল, "আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।"

সীল-মাছ তখন ছুটে গেল সওদাগরের কাছে। তার পর তারা দুজনে পুকুরটায় ডুব দিয়ে পেল তাদের আগেকার শরীর।

শেয়ালকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোটো ভাই বলল, "দাঁড়কাক আর মাছটা তোমার নখের জুগ্যি নয়।"

এই-না বলে ছোটো ভাই সোজা ফিরে গেল কেল্লাতে। রাজকন্যে

তার অপেক্ষায় ছিল। নিয়তির কাছে সে মাথা নত করল।

খুব ধুম্‌ধাম্‌ করে তাদের বিয়ে হবার পর ছোটো ভাই হল সে-দেশের রাজা। রাজকন্যেকে কখনো সে বলে নি—কোথায় লুকিয়েছিল আর কে তাকে সাহায্য করেছিল। তাই রাজকন্যে ধরে নিল, নিজের মাথা খাটিয়ে কাজটা সে হাসিল করেছে। তাই আজীবন তাকে খুব সমীহ করে সে চলত আর ভাবত—তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে সেই ছোটো ভাই, যে তার স্বামী, প্রভু আর সব চেয়ে ভালোবাসার মানুষ।

সর্দার-চোর

সারা দিনের খাটা-খাটুনির পর এক সন্ধেয় বউয়ের সঙ্গে নিজেদের ছন্নছাড়া কুঁড়েঘরের দোর-গোড়ায় বসেছিল এক বুড়ো। এমন সময় চার-ঘোড়ার জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে এক সুপুরুষ তরুণ সেখানে এসে গাড়ি থেকে নামল। পরনে তার জমকালো দামী পোশাক। দাঁড়িয়ে উঠে তার কাছে গিয়ে চাষী প্রশ্ন করল—কী সে চায় আর তার কোনো কাজে সে লাগতে পারে কি না।

চাষীর হাত ঝাঁকিয়ে তরুণ বলল, "আমার একমাত্র ইচ্ছে তোমাদের গাঁয়ের খাবার পেট ভরে খাওয়ার। তোমাদের মতো করে আলুর একটা তরকারি বানাও। তোমাদের সঙ্গে বসে এক টেবিলে আমি সেটা গপ্-গপিয়ে খাব।"

মৃদু হেসে চাষী বলল, "দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজা-বাদশা গোছের লোক। কিন্তু আমার জানা আছে—বড়োলোকরা মাঝে মাঝে গরিবিয়ানা করে মজা পায়। তোমার জন্যে এক্ষুনি আলুর তরকারি চড়াতে বলছি।"

রান্নাঘরে গিয়ে আলু ধুয়ে, খোসা ছাড়িয়ে চাষীর বউ পিঠে বানাল। বউ যখন রান্নাবান্না করছে তরুণকে চাষী বলল, "আমার সঙ্গে বাগানে চলো। সেখানে একটা কাজ বাকি আছে।"

বাগানে সে নানা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল। গর্তগুলোয় চাষী গাছ পুঁততে লাগল।

তরুণ প্রশ্ন করল, "তোমার কোনো ছেলেপুলে নেই?"

চাষী বলল, "না। একটা ছেলে ছিল বটে। কিন্তু অনেক বছর

হল সে ঘর-ছাড়া। ছেলেটা ভারি একগুঁয়ে হলেও চালাক ছিল। কোনো-কিছু শেখা-টেখার ধার ধারত না। কেবল ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াত। শেষটায় বাড়ি থেকে পালায়। আর তার কোনো খোঁজ-খবর নেই।"

একটা গাছ পুঁতে সেটাকে খাড়া রাখার জন্য একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল চাষী।

তরুণ প্রশ্ন করল, কোণের দিকে যে-গাছটা মাটিতে ঝুঁকে পড়েছে সেটাকে খাড়া করে বাঁধছ না কেন? বাঁধলে সিধে হয়ে বড়ো হবার সুযোগ সেটা পাবে।

মৃদু হেসে বুড়ো চাষী বলল, "তোমার কথা শুনেই বোঝা যায় গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে কিছুই জানো না। ঐ গাছটা বুড়িয়ে গেছে। কেউই ওটাকে সিধে করতে পারবে না। শুধু কচি অবস্থাতেই গাছদের খাড়া করা যায়।"

তরুণ বলল, "মনে হচ্ছে তোমার ছেলের বেলাতেও কথাটা খাটে। ছেলেবেলায় তাকে শেখালে-পড়ালে হয় তো সে বাড়ি থেকে পালাত না। এত দিনে সেও বুড়িয়ে উঠেছে। তাকে আর বাঁকানো-চোরানো যাবে না।"

চাষী বলল, "তা যা বলেছ। অনেক বছর হল বাড়ি থেকে সে পালিয়েছে এত দিনে তার চেহারা নিশ্চয়ই একেবারে পালটে গেছে।"

তরুণ প্রশ্ন করল, "এখন তাকে দেখলে চিনতে পারবে?"

চাষী বলল, "মনে হয় না তার মুখটা চিনতে পারব। কিন্তু তার কাঁধে মটরদানার মতো একটা জড়ুল আছে। সেটা দেখলেই চিনব।"

সঙ্গে-সঙ্গে তরুণ তার কোট-শার্ট খুলে জড়ুলটা চাষীকে দেখাল।

জড়ুলটা দেখে চমকে উঠে চাষী বলল, "হায় ভগবান! তুই তা হলে আমার সেই পালিয়ে-যাওয়া ছেলে! বাছা বল, কী করে এমন বড়োলোক হলি? এত ধন-দৌলত জোগাড় করলি কী করে?"

চাষীর ছেলে বলল, "বাবা, মনে পড়ছে সেই কচি গাছটার কথা? সেটাকে কোনো খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয় নি। বেঁকে-চুরে সেটা গজিয়ে ওঠে। এখন সেটা এতই বেড়ে উঠেছে—সেটাকে আর সিধে করা যাবে না। জানতে চাও, কী করে এত ধন-দৌলত জোগাড় করেছি? তা হলে বলি, শোনো—চুরি বিদ্যেয় হাত পাকিয়েছি। কথাটা শুনে চমকে উঠো না। আমি এখন পাকা চোর। তালা-চাবির তোয়াক্কা

করি না। ছুঁলেই খোলে। যখন যা চাই, সঙ্গে-সঙ্গে পাই। ভেবো না-ছিঁচকে চোরদের মতো চুরি করি। চুরি করি শুধু বড়োলোকদের বাড়িতে, টাকাকড়ি নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে। গরিব-বাড়িতে চুরি করি না। চুরি করে যা পাই, গরিবদের বিলিয়ে দিই। আমার চুরির মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সূক্ষ্ম কারুকাজের চিহ্ন থাকে। এক পয়সাও নিই না।"

চাষী আবার বলে উঠল, "হায় ভগবান!" তার পর ছেলেকে বলল, "চোর হয়ে দিন কাটাস শুনে ভারি কষ্ট পেলাম। যত ভালো কাজই করিস-না কেন, চুরি বিদ্যেয় যতই তুখোড় হোস-না কেন—চোর তো চোর! জানি, একদিন-না একদিন ফ্যাসাদে পড়বি।"

ছেলেকে চাষী নিয়ে গেল তার বউয়ের কাছে। ভদ্রলোকের মতো ছেলের পোশাক-আশাক দেখে চাষী-বউয়ের চোখে জল এল। কিন্তু ছেলে চোর শুনে তার চোখের জল বাঁধ মানল না। ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল, "চোরই হোক আর যাই হোক—আমার ছেলে তো। তাই তোকে দেখে কী খুশি যে হয়েছি, বলতে পারি না।"

তার পর বাবা-মার সঙ্গে সে বসল খেতে। চাষীদের নিতান্ত সাদা-সিধে খাবার অমন তৃপ্তি করে বহুকাল সে খায় নি। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে চাষী তাকে বলল, "ঐ যে রাজবাড়ি দেখছিস—তুই চোর জানলে খাতির-টাতির না করে জমিদার তোকে ফাঁসিতে লটকাত।"

চাষীর ছেলে বলল, "বাবা, ভেবো না। কিচ্ছুটি সে টের পাবে না। আমার কাজ খুব ভালোই জানা আছে। আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করছি।"

রাত বাড়লে পর তুখোড়-চোর ঘোড়ায় চড়ে রাজবাড়িতে গেল। তার পোশাক-আশাক দেখে সবাই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। কে সে জানাতে কিন্তু জমিদারের মুখ হয়ে উঠল ফ্যাকাশে। অনেকক্ষণ কোনো কথাবার্তা সে কইল না। শেষটায় বলল, "তুই আমার ধর্ম-পুত্তুর। তাই বিচার না করে তোকে ক্ষমা করছি। তুই বলছিস—তুই পাকা চোর। সেটা পরখ করে দেখব। কাজটা হাসিল করতে না পারলে যে লোকটা দড়ি পাকায়, তার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। বিয়ের গান তখন কাকের দল কা-কা করে গাইবে।"

চোর-সর্দার বলল, 'কর্তা, সব চেয়ে কঠিন তিনটে কাজ দিন। না

পারলে হাসি-মুখে ফাঁসির দড়ি পরব।"

মিনিট কয়েক ভেবে জমিদার বলল, "এক নম্বর—যে ঘোড়ায় রোজ রোজ চড়ি, আস্তাবল থেকে সেটা চুরি করতে হবে। দু নম্বর—বউয়ের সঙ্গে ঘুমোবার সময় বিছানার চাদর আর বউয়ের আঙটিটা তার আঙুল থেকে খুলে নিতে হবে। তিন নম্বর—গির্জে থেকে চুরি করে আমার কাছে আনতে হবে যাজক আর তার কর্মচারীকে। যা-যা করতে বললাম মনে-মনে আর একবার আউড়ে নে। ভুল করলেই ফাঁসি-কাঠে ঝুলবি।"

চোর-সর্দার গেল পাশের শহরে। এক বুড়ি চাষী-মেয়ের পোশাক-আশাক কিনে সে পরল। তার পর মুখে এমনভাবে তামাটে রঙ মাখল যাতে কেউ না তাকে চিনতে পারে। সব শেষে সঙ্গে নিল ঘুমের ওষুধ-মেশানো এক পিপে হাঙ্গারি দেশের সব চেয়ে কড়া মদ। পিপেটা ঝোলায় ভরে, ঝোলাটা পিঠে ফেলে ইচ্ছে করে টলতে-টলতে সে হাজির হল রাজবাড়িতে।

তখন বেশ রাত। হেঁপো-বুড়ির মতো হাঁপাতে হাঁপাতে কাশতে-কাশতে আঙিনায় বসে এমনভাবে সে হাত কচলাতে লাগল, যেন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। আস্তাবলের সামনে আগুন জ্বালিয়ে সৈনিকরা শুয়েছিল। বুড়িকে দেখে তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল, "খুড়িমা, কাছে এসে আগুন পুইয়ে নাও। মনে হচ্ছে রাত কাটাবার কোনো চুলো তোমার নেই। এখানেই থাকো।

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তাদের কাছে গিয়ে পিঠ থেকে ঝোলা নামিয়ে উবু হয়ে বুড়ি বসল আগুনের পাশে।

এক সৈনিক প্রশ্ন করল, "পিপেটায় কী আছে?"

বুড়ি বলল, "খুব কড়া মদ। এটা বেচেই সংসার চালাই। আমার সঙ্গে মিষ্টি ক'রে কথা বললে আর সামান্য কিছু পয়সাকড়ি দিলে তোমাদের এক গেলাস করে খেতে দেব।"

সৈনিক বলল, "চেখে দেখি।" এক গেলাস শেষ করে আর এক গেলাস সে চাইল। তার দেখাদেখি অন্য সৈনিকরাও খেতে শুরু করল সেই মদ।

সৈনিক তার পর আস্তাবলের মধ্যেকার একজনকে হাঁক দিয়ে বলল, "ওরে, শুনছিস? এখানে আয়। এক বুড়ি ঠান্‌দি এসেছে। তার পিপের

মদটার বয়েস তারই সমান। এখানকার আগুনের চেয়েও ভালো করে সেটা তোকে চাঙ্গা করে তুলবে।”

মদের পিপে নিয়ে বুড়ি তখন ঢুকল আস্তাবলে। জমিদারের ঘোড়ার পিঠে বসেছিল এক সইস্, আর একজন ধরেছিল সেটার লাগাম আর তৃতীয় এক সইস্ তার মুঠোর মধ্যে রেখেছিল ঘোড়ার লেজ। গেলাস ভর্তি করে করে বুড়ি তাদের তিনজনকেই ভর পেট মদ গেলাল।

মিনিট কয়েক পরে এক সইস্-এর হাত থেকে লাগাম খসে পড়ল। দ্বিতীয় যে সইস্ শক্ত করে ধরেছিল ঘোড়াটার লেজ, তার মুঠি হল শিথিল তৃতীয় সইস্ ঢুলতে-ঢুলতে ঘোড়ার পিঠে রাখল তার মাথা। আর তার পর তিনজনেরই ভীষণ জোরে-জোরে নাক ডাকতে শুরু করল।

বাইরের সৈনিকরা আগেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেখে মনে হয় তাদের দেহগুলো যেন পাথরের মূর্তি।

যে-সইস্ লাগাম ধরেছিল চোর সর্দার তখন তার হাতে দিল একটা দড়ি। যে-সইস্ ঘোড়ার লেজ ধরে ছিল তাকে সে ধরিয়ে দিল এক গোছা খড়। কিন্তু ঘোড়ার জিনে যে বসেছিল তাকে নিয়ে কী সে করে? টেনে নামালে সে হয়তো হাউমাউ করে উঠবে, আর তার চীৎকারে সবাই উঠবে জেগে।

হঠাৎ তার মাথায় দারুণ একটা ফন্দি খেলল। জিনের দড়ি-দড়া খুলে দেয়ালের আংটার সঙ্গে সেগুলো সে বাঁধল তার পর ধীরে ধীরে জিন সমেত ঘুমন্ত সইস্‌কে নামাল মেঝেতে।

তার পর ঘোড়ার বাঁধন খোলা তার পক্ষে শক্ত হল না। কিন্তু উঠোনে তার ক্ষুরের শব্দে রাজবাড়ির সবাইকার ঘুম ভাঙতে পারে। তাই ক্ষুরগুলো ছেঁড়া কাপড়ে জড়িয়ে, সন্তর্পণে ঘোড়াটাকে আস্তাবলের বাইরে এনে তার পিঠে চড়ে টগ্‌বগিয়ে সে চলে গেল।

ভোর হতে সর্দার চোর চোরাই ঘোড়ায় চ'ড়ে কদমচালে গেল রাজপুরীতে। ঘুম থেকে উঠে জমিদার তখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল।

সর্দার-চোর চেঁচিয়ে বলল, “সুপ্রভাত, কর্তা! তাকিয়ে দেখুন কেমন আরাম করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আপনার সৈনিকরা নাক ডাকিয়ে পাহারা দিচ্ছে!”

তার কথা শুনে জমিদার হাসি চাপতে পারল না। সে বলল,

"প্রথম দফায় তুমি জিতেছ। কিন্তু দ্বিতীয়বার অমন সহজে জিততে পারবে বলে আমার সন্দেহ আছে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি— আবার এরকম দুঃসাহস দেখাবার চেষ্টা করলে ভীষণ ফ্যাসাদে পড়বে।"

রাতে জমিদার আর জমিদার-গিন্নি গেল শোবার ঘরে। জমিদার তার গিন্নির আঙটিটা শক্ত করে পরিয়ে বলল, "সব দরজাগুলো ভালো করে হুড়কো এঁটেছি। জানলা দিয়ে চোর আসতে চেষ্টা করলে তাকে গুলি করে মারব।"

সর্দার-চোর গেল ফাঁসির মঞ্চে। সেখানে এক আসামী ফাঁসি-কাঠে লটকাচ্ছিল। তার মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে এল সে রাজবাড়িতে। জমিদার আর জমিদার-গিন্নি যে-ঘরে ঘুমোচ্ছিল সেটার জানলার নীচে একটা মই খাড়া করে মড়া কাঁধে নিয়ে সে উপরে উঠল। মড়ার মাথা জানলা দিয়ে দেখা যেতেই বিছানা থেকে পিস্তল চালাল জমিদার। সঙ্গে-সঙ্গে মড়াকে ধপ্ করে ফেলে দিয়ে মই থেকে এক লাফে ঘরে ঢুকে সর্দার-চোর লুকিয়ে পড়ল এক কোণে।

ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় সে স্পষ্ট দেখল মই বেয়ে জমিদারকে বাগানে নামতে। ফাঁসিতে লটকানো লোকটার মৃতদেহ একটা গর্তে এনে জমিদার পুঁতল।

চোর ভাবল, 'এই হচ্ছে কাজ ফতে করার সুযোগ।'

তার পর ডিঙি মেরে জমিদার-গিন্নির শোবার ঘরে গিয়ে জমিদারের গলা নকল করে সে বলল, "গিন্নি, চোরটা আমার ধর্মপুত্তুর। লোকটা পাজি হলেও আসলে কিন্তু শয়তান নয়। লোকটার বাপ-মাকে আমি খুব স্নেহ করতাম। তাই চাই না তাদের মৃত ছেলেটাকে দেখে লোকে ছিছিক্কার করে। ভোরের আগে নিজে হাতে বাগানে তাকে গোর দেব, তা হলে কেউই তার কথা জানতে পারবে না। বিছানার চাদরটা দাও। সেটা দিয়ে জড়িয়ে তাকে পুঁতব।"

জমিদার-গিন্নি বিছানার চাদরটা তাকে দিল।

সর্দার-চোর বলে চলল, "আর-একটা কথা। ছেলেটার ওপর বাস্তবিকই আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই খালি হাতে তাকে গোর দিতে মন সরছে না। আমি চাই—যে আঙটির জন্যে সে প্রাণ দিল সেই আঙটিও তার সঙ্গে গোরে যায়।"

আঙটিটা দেবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না জমিদার-গিন্নির। কিন্তু

বরকে সে চটাতে চাইল না। তাই আঙুল থেকে আঙটিটা খুলে তাকে দিল।

বাগানে সেই লোকটাকে কবর দেবার অনেক আগেই জিনিস দুটো নিয়ে সর্দার চোর নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছল।

পরদিন সকালে বিছানার চাদর আর আঙটি নিয়ে সে যখন হাজির হল জমিদারের মুখটা তখন দেখার মতো!

জমিদার বলল, "তুমি জাদুকর নাকি, হে? তোমাকে তো নিজে হাতে গোর দিয়েছিলাম! কে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলল?"

সর্দার-চোর জবাব দিল, "আমাকে গোর দেন নি, কর্তা দিয়েছিলেন এক ফাঁসির আসামীকে।" এই-না বলে আগের রাতের সব ঘটনার কথা জানাল সে জমিদারকে।

জমিদারকে তখন স্বীকার করতে হল তার মতো তুখোড় চোর দুনিয়ায় দুটি নেই। তার পর তাকে সে বলল, "এখনো সব শেষ হয় নি। তৃতীয় কাজটা বাকি আছে।"

সর্দার চোর মৃদু হাসল। কোনো জবাব দিল না।

রাত হতে এক হাতে একটা থলি, অন্য হাতে একটা লণ্ঠন আর পিঠে একটা পুঁটলি নিয়ে সে গেল গ্রামের গির্জেয়। থলিতে ছিল কাঁকড়া, পুঁটলিতে মোমবাতি।

গির্জের আঙিনায় বসে থলি থেকে কাঁকড়াগুলো বার করে একে একে তাদের পিঠে জ্বলন্ত মোমবাতি বসিয়ে সে ছেড়ে দিল। তার পর কালো আর লম্বা একটা আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে থুঁতনিতে সেঁটে নিল ছাই রঙা দাড়ি।

এইভাবে ছদ্মবেশ ধরে যে-থলিতে কাঁকড়া ছিল সেটা নিয়ে গির্জেয় ঢুকে চড়ল ধর্ম-উপদেশ দেবার মঞ্চে। গির্জের ঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত বারোটা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ সরু গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, "পাপীরা, সবাই শোনো! প্রলয় এসে গেছে। শেষদিন আসছে। স্বর্গে যারা যেতে চাও আমার থলিতে তারা চট্‌পট্ সেঁধিয়ে পড়। আমি স্বর্গের দ্বাররক্ষী পিটার। গির্জের আঙিনায় তাকিয়ে দেখো মৃতেরা তাদের হাড় সংগ্রহ করছে। চলে এসো, চলে এসো। পৃথিবী ফেটে চৌচির হল বলে!"

সারা গ্রামে তার চীৎকার শোনা গেল। যাজক আর কর্মচারী

থাকত গির্জের সব চেয়ে কাছে। গির্জের আঙিনায় বাতিগুলোকে ঘুরে বেড়াতে তারা দেখেছিল। তারাই প্রথম হাজির হল গির্জেতে।

সর্দার চোরের গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শুনে কর্মচারীর পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা মেরে যাজক বলল :

"শেষ দিনটা আসার আগে এইভাবে আরামে স্বর্গে যাবার প্রস্তাব আমার মনে ধরেছে।"

কর্মচারী জবাব দিল, "আমারও। চলুন আমার পেছন-পেছন।"

এই-না বলে বক্তৃতার মঞ্চে সে উঠতে সর্দার-চোর থলির মুখটা খুলে ধরল। যাজক সম্মানিত লোক। তাই কর্মচারী সসম্ভ্রমে প্রথম তাকে সেঁধুতে দিল থলির মধ্যে।

থলির মধ্যে তারা দুজন সেঁধুবার সঙ্গে-সঙ্গে সর্দার চোর চট্‌পট্ সেটার মুখ বেঁধে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে থলিটা নামাতে লাগল বক্তৃতা-মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে। দুই বোকার মাথা যখনই ঠোকাঠুকি হয় সর্দার-চোর চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "আমরা এখন পাহাড়ে চড়ছি।"

তার পর গ্রামের মধ্যে দিয়ে টানতে-টানতে তাদের পুকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে সে বলল, "এইখানে ভিজে ভিজে মেঘগুলো রয়েছে।" রাজবাড়ির সিঁড়িতে পৌঁছে সে জানাল, "স্বর্গের সিঁড়িতে পৌঁছলাম।"

তার পর পায়রা-ঘরের মধ্যে তাদের সে ঠেলে ঢোকাতে পায়রাগুলো ডানা ঝট্‌পট্ করতে লাগল। সে তখন বলল, "শোনো, দেবদূতরা ডানা ঝাপ্‌টে তোমাদের সাদর-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। তার পর দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে সে চলে গেল।

পরদিন সকালে জমিদারের কাছে হাজির হয়ে সে বলল, "কর্তা, তৃতীয় কাজটা শেষ হয়েছে। গির্জে থেকে যাজক আর তার কর্মচারীকে চুরি করে এনেছি।"

জমিদার প্রশ্ন করল, "তারা কোথায় ?"

"পায়রা ঘরে বস্তা-বন্দী হয়ে তারা বিশ্রাম করছে। তাদের ধারণা স্বর্গে পৌঁছে গেছে।"

সর্দার-চোর সত্যি কথা বলছে কি না নিজের চোখে দেখার জন্য জমিদার সেখানে গেল। যাজক আর তার কর্মচারীকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে সর্দার-চোরকে সে বলল, "তুমি যে চোরদের চূড়ামণি তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। তুমি জিতেছ। তাই পার পেয়ে

গেলে। কিন্তু বাপু হে, চট্‌পট্‌ কেটে পড়। এ-তল্লাট আর মাড়াবে না। ফের যদি আস তোমাকে ফাঁসিকাঠে লটকাব।"

তাই সর্দার চোর সেখান থেকে গিয়ে, বাবা মার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার পর থেকেই আর তার দেখা পায় নি বা তার কথা কেউ শোনে নি।